জুন ২০২০, সংখ্যা ১২

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

জুন ২০২০, সংখ্যা ১২

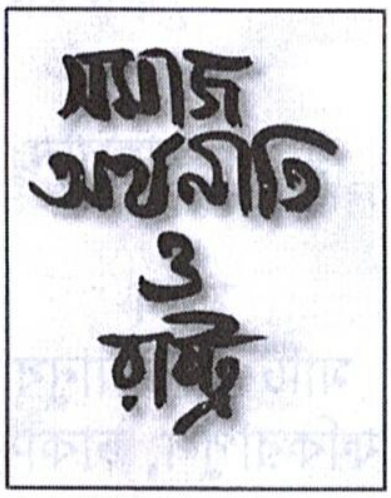

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র
জুন ২০২০, সংখ্যা ১২
সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সম্পাদক
মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
দিলওয়ার হোসেন

কপিরাইট@
সমাজ গবেষণা কেন্দ্র
কক্ষ নম্বর ৪০৫৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
রবীন আহসান

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য
১৫০ টাকা

এই সংখ্যা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ
দিলওয়ার হোসেন
মোবাইল : ০১৮১৯১৪৪০৯৯

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যোগাযোগ
ড. মোস্তাফিজুর রহমান
ই-মেইল : mustafiz223@gmail.com
এম. এম. আকাশ
মোবাইল : ০১৭১১৮৪৭৬৫০, ই-মেইল : akashmokaddem@gmail.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ০৫

নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে আনুপাতিক নির্বাচনের ভূমিকা ০৯

এম. এম. আকাশ
গণতন্ত্র: "সোনার হরিণ"? ৪১

বিনায়ক সেন
প্রায়-সর্বত্র গণতন্ত্র কেন পিছু হটছে: সাম্প্রতিকের তর্ক ও বাংলাদেশ ৭৬

গৌতম রায়
পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগ ১২৮

হায়দার আলী খান
প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়ন এবং শিক্ষার হেরফের ১৬৬

পুস্তক পর্যালোচনা

অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাথ
'আমি মার্কসবাদী নই'– কার্ল মার্কস ১৭৮

মাহবুবউল্লাহ
আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাবনা ও সমস্যা ১৯৩

মহসিন সিদ্দিকী
'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ' ১৯৯

শামীমা আক্তার সুমা
অসাম্যের মাঝে সাম্যবাদের আশাবাদ ২০৬

জাহেদ ইকবাল
চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রেক্ষাপটে আইনী ভাবনা ২১২

মুখবন্ধ

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-এর দ্বাদশ সংখ্যাটি কিছুটা বিলম্বে প্রকাশিত হচ্ছে, সম্পাদক হিসেবে সে দায়ভার আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। লেখকদের মধ্যে যারা তাদের প্রবন্ধ বেশ আগেই পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে, কিছুটা দোষক্ষালন হয়তো হবে এ কথা মনে রাখলে যে, যেসব প্রবন্ধের জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সেগুলি এ সংখ্যাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছে ও সমৃদ্ধতর করেছে। তাই অনুমান করি এ অপেক্ষা যথাযথ ছিল। আশা করি উৎসাহী পাঠকের প্রাপ্তির নিরীখে প্রকাশনার দীর্ঘসুত্রিতার এ বিলম্ব ও বিড়ম্বনা কিছুটা হলেও পুষিয়ে যাবে। এ সংখ্যায় আছে ধারণা হিসেবে গণতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাস, আমাদের সময়ে দেশে দেশে চলমান গণতন্ত্র চর্চার বিশ্লেষণ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক চর্চার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পথ অনুসন্ধান, মার্কসবাদ ও গণতন্ত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সমকালীণ সমাজতন্ত্র নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির আদিপর্বের ইতিহাস। বামধারার চিন্তা, প্রগতিশীল রাজনীতি, গণতন্ত্রের তত্ত্বগত দিক, প্রায়োগিক গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে যেসব পাঠক উৎসাহী এ সংখ্যাটি তারা আগ্রহ নিয়ে পড়বেন এ আমাদের প্রত্যাশা।

গৌতম রায় 'পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগ' প্রবন্ধে ভারত বিভাগের পরবর্তীতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সে ইতিহাস এবং লেখকের বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে পাঠক জানতে পারবেন সমাজতন্ত্র নিয়ে সে সময়ের আদর্শিক তর্ক-বিতর্ক, পাকিস্তানের তদানিন্তন রাজনীতি, ভাষা-আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট গঠনসহ বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা, পার্টির নেতাদের জীবনাচরণ থেকে শিক্ষণীয়, ও কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনের কথা।

'আমি মার্কসবাদী নই' কার্ল মার্কস- প্রবন্ধে লেখক অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাথ এ যুক্তি প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদ ডগ্‌মা হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পেলেও মার্কস নিজে ছিলেন যে কোন ধরণের ডগ্‌মার বিরুদ্ধে। মার্কসের তত্ত্ব এবং সে তত্ত্বের প্রায়োগিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিরীখে তার মতামত উপস্থাপন করতে যেয়ে লেখক আলোচনাকে সাজিয়েছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আজিজুর রহমানের জানুয়ারি ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'আমার সমাজতন্ত্র; সমাজতন্ত্রের উত্থান, পতন ও ভবিষ্যত' শীর্ষক গ্রন্থে উপস্থাপিত যুক্তি ও মন্তব্যকে

ঘিরে, সে গ্রন্থের মূল মূল ইস্যু-সমূহের বিশ্লেষণে, অধ্যাপক আজিজুর রহমানের মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায়। অধ্যাপক রহমানের বইটি পড়লে পাঠক প্রবন্ধের লেখকের মতামতের যৌক্তিকতা যাচাই করতে পারবেন ও নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন।

গণতন্ত্র: "সোনার হরিণ"? শিরোনামে অধ্যাপক এম. এম. আকাশের প্রবন্ধে লেখক প্রথমে গণতন্ত্রের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতে এলিটরা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র (formal democracy)-এর বাতাবরণে তাদের আধিপত্য, শাসন ও শোষণকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রলম্বিত করে থাকে। লেখক একবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যমান গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ পর্যালোচনা করেছেন, এবং পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সূচক নিয়ে তীর্যক আলোচনা করেছেন। লেখক দেখাতে চেয়েছেন 'জনগণতন্ত্র' তথা 'গভীর' গণতন্ত্রের উপাদানসমূহ কি হতে পারে যে গণতন্ত্র সমাজকে নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের পথে।

'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে আনুপাতিক নির্বাচনের ভূমিকা' প্রবন্ধে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম চলমান নির্বাচন পদ্ধতির বিপরীতে তার প্রস্তাবিত আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে যুক্তি দেখিয়েছেন কেন বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবিদার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আনুপাতিক নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা করে ও সেগুলির তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করে লেখক বাংলাদেশের বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছেন। প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্রম-প্রকাশমান দূর্বলতা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে ভোটদাতাদের ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহের প্রেক্ষাপটে লেখকের সুপারিশ বৃহত্তর পরিসরে আরো আলোচিত হবে, এ আশা রইল। প্রবন্ধটির উপর অধ্যাপক মাহবুবুল্লাহ্‌র সুচিন্তিত মতামত প্রবন্ধের যুক্তি ও লেখকের প্রস্তাবের যথার্থতা নিয়ে ভাবতে সাহায্য করবে।

ড. বিনায়ক সেন "প্রায় - সর্বত্র গণতন্ত্র কেন পিছু হটছে: সাম্প্রতিকের তর্ক ও বাংলাদেশ" প্রবন্ধে সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের পিছু হটার কার্যকারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন এবং একটি বৃহৎ ক্যানভাসকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 'গণতন্ত্র' ধারণাটির বিকাশ ও বিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক সমকালীন বিশ্বে গণতন্ত্র চর্চার সংকট পর্যালোচনা করেছেন এবং illiberal democracy (অনুদার গণতন্ত্র) ও competitive authoritarianism (প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ)-এর দ্বৈত বাস্তবতার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এবং চলমান বাস্তবতার নীরিখে সরীবফ democracy (মিশ্র গণতন্ত্র)ই বাংলাদেশের আসন্ন 'ভবিষৎ' বলে মত প্রকাশ করেছেন। ঝুঁকি হ্রাস করে ও দূর্বলতার দিকগুলোকে সামাল দিয়ে একটি 'দক্ষ মিশ্র গণতন্ত্র' কিভাবে বাংলাদেশে কার্যকর করা যেতে পারে তার কিছু নির্মাণ-উপাদান (building blocks) লেখক তাঁর প্রবন্ধে

উপস্থাপন করেছেন, তবে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে বিকল্প ও উন্নতর গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আলোচনাকে তিনি এ প্রবন্ধের বাইরে রেখেছেন।

'প্রতিবেশ বান্ধব গভীরায়ন ও শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে অধ্যাপক হায়দার আলী খান প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্র বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং এ ধরণের গণতন্ত্রের গভীরায়নের প্রাথমিক শর্তাবলী কি হতে পারে সে বিষয়ে লিখেছেন। প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রায়নের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা বলতে যেয়ে লেখক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে শাসক শ্রেণি আদর্শগত প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে তার বিশ্লেষণ করেছেন এবং একই সাথে পুঁজিবাদী সমাজে বিপরীতমুখী বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অবদমিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাসমূহকে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রগতিশীল আন্দোলনের কাজে লাগানো যায় সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। লেখকের প্রস্তাবসমূহ পাঠককে এসব বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহী করবে বলে আশা করি।

গ্রন্থ সমালোচনা অংশে অধ্যাপক নজরুল ইসলামের 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও সাম্যবাদের ভবিষৎ' গ্রন্থটির উপর মূল্যবান আলোচনা করেছেন প্রকৌশলী মহসিন সিদ্দিক, অধ্যাপক হায়দার আলী খান, এমফিল শিক্ষার্থী শামীমা আক্তার সুমা এবং আইনজীবী ড. কাজী জাহেদ ইকবাল। অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিবর্তন, প্রকৃত সমাজতন্ত্রের (Real Socialism) উত্থান-পতন, প্রগতিশীল রাজনীতি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত, ও আগামীর সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যারা গভীরভাবে জানতে ও বুঝতে উৎসাহী এ আলোচনা তাদেরকে গ্রন্থটি পাঠে আগ্রহী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দেশীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা অতিক্রম করছি। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিকাশ, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে গুণমান সম্পন্ন লেখা এ সময়ে খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশে আমরা যদি একটি প্রগতিশীল সমাজ গড়তে চাই এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে গণতন্ত্রের তত্ত্বগত দিক ও প্রায়োগিক চর্চা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তিসমূহ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক, বন্টণের ন্যায্যতা, পরিবেশ-প্রতিবেশ– এসব বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন গভীর বিচার-বিশ্লেষণ, এসব নিয়ে বাংলা ভাষায় যুক্তি-নির্ভর লেখা। আশা করব বর্তমান সংখ্যার ধারাবাহিকতায় আগামীতেও আমরা পাব যুক্তি-তর্ক-তথ্য-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ সে ধরণের আরো লেখা। আগামী সংখ্যার সম্ভাব্য লেখকদের কাছে সে লেখার জন্য আন্তরিক অনুরোধ রইল।

মোস্তাফিজুর রহমান
mustafiz223@gmail.com

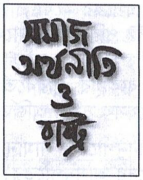

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে আনুপাতিক নির্বাচনের ভূমিকা

নজরুল ইসলাম *

১। ভূমিকা

স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনও সমস্যাকীর্ণ। এসব সমস্যার তলবর্তী কারণ হলো, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিকাশের মাত্রার সাথে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর অসংগতি। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও বহুদল ভিত্তিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে কয়েক শতক ধরে শিল্প-পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সহযোগী প্রক্রিয়া হিসেবে। সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও পুরোপুরি শিল্পায়িত হয়ে ওঠেনি। এরূপ অবিকশিত অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে বিকশিত পুঁজিবাদের উপরিকাঠামো অনুসরণের চেষ্টা করা হলে সমস্যা হওয়ারই কথা। বাংলাদেশ একাই এই সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত নয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশেই গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এও দেখায় যে, কোনো কোনো দেশ পুরোপুরি শিল্পায়িত হওয়ার আগেও গণতন্ত্র চর্চায় অধিকতর সফল হয়েছে। প্রতিবেশী ভারতই তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। মধ্য আমেরিকার কোস্টারিকা অথবা আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকাতেও গণতন্ত্রের তুলনামূলকভাবে সফল চর্চা লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রমাণিত হয়, উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুরোপুরি শিল্পায়িত হওয়ার আগেও গণতন্ত্রের সফল অনুসরণ হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের পদক্ষেপ কী হতে পারে?

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উন্নত চর্চার লক্ষ্যে এ যাবত বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) অনুরোধ-উপরোধ; (খ) আইনগত পদক্ষেপ; (গ) সামাজিক চাপ সৃষ্টি; এবং (ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন।[2]

---

* *জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ*

2. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Islam (2016)

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এসবের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিতক পরিবর্তনই সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন গণতন্ত্র চর্চার জন্য সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে তা হলো, বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে যেসব সুফল অর্জিত হবে, তার মধ্যে রয়েছে :

(ক) বিভিন্ন দলের ভোটানুপাতের সামান্য পরিবর্তনের কারণে নির্বাচনী ফলাফলের (অর্থাৎ সংসদের আসনুপাতের) বড় ধরণের পরিবর্তন রোধ;
(খ) কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার বিষয়গত সুযোগ এবং বিষয়ীগত প্রণোদনা হ্রাস;
(গ) আসনের সীমানা নিয়ে কারচুপির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস;
(ঘ) অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংসদে যোগদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি;
(ঙ) নির্বাচনী প্রচারের মানোন্নয়ন;
(চ) প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস;
(ছ) রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও শক্তি বৃদ্ধি;
(জ) স্থানীয় সরকারসমূহের বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি;
(ঝ) নির্বাচনে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং জনগোষ্ঠীর জন্য 'সম-উচ্চতার জমিন' সৃষ্টি এবং তার ফলে আরও অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন সংসদ গঠন;
(ঞ) অধিকতর ন্যায্যতা অর্জন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের প্রশমণ।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, বৃটিশ শাসনের ঐতিহ্যের কারণে বাংলাদেশের অনেকের নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থাই নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে আনুপতিক নির্বাচন প্রচলিত। উন্নয়নশীল বিশ্বেও আনুপাতিক নির্বাচনের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এসব অনেক দেশ অতীতে বৃটিশ, ফরাসী এবং স্পেনের উপনিবেশ থাকার ফলে সেসব দেশের নির্বাচন পদ্ধতি তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। লক্ষ্যণীয়, প্রতিবেশী নেপালেও সম্প্রতি আনুপাতিক (আংশিক) নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশেও আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের কুফলসমূহ দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। এবারের নির্বাচনের প্রাক্কালে পরিলক্ষিত বিভিন্ন দলের নানা রকম জোট গঠনের কসরত, যেনতেন প্রকারে সংসদে ঢুকে পড়ার প্রয়াস, সাংসদ পদকে একটি নেহাত বস্তুগত লাভের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা, ইত্যাদি বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতির বিভিন্ন অসারতার দিক আরও বেশি উন্মোচিত হয়েছে। সেকারণে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন বাংলাদেশেও বাড়ছে। বেশিরভাগ বামপন্থী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দল ও জনগোষ্ঠী অনেকদিন ধরেই আনুপাতিক নির্বাচনের দাবী জানিয়ে আসছে। ২০১৪ সনের নির্বাচনের আগে দেশের অন্যতম বড় দল, জাতীয় পার্টির সভাপতি, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আনুপাতিক নির্বাচনের

পক্ষে অবস্থান ঘোষণা করেন। বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির অনেক চিন্তাশীল নেতা এবং পরামর্শকও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের বিভিন্ন কুফল নিয়ে চিন্তিত এবং আনুপাতিক নির্বাচনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তাঁদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে লেখকের সাথে এই মনোভাব ব্যক্তও করেছেন। সুতরাং, আনুপাতিক নির্বাচনের সুফল সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং বিশ্লেষণ উপস্থাপনার মাধ্যমে এর পক্ষে আরও জনমত সৃষ্টি করা গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও এই নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে তারই আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ প্রবন্ধে আলোচনার কাঠামো নিম্নরূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিশ্বব্যাপী আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ ও বৈচিত্র্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাব্য সুফলসমূহ আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার সম্ভাব্য কিছু নেতিবাচক দিক এবং সেগুলো কাটিয়ে ওঠার উপায় আলোচিত হয়েছে। সবশেষে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে উপসংহার পরিবেশিত হয়েছে।

২। বিশ্ব অঙ্গনে আনুপাতিক নির্বাচন

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচন ব্যবস্থা মূলত বৃটিশ মডেল অনুসারে নির্মিত। এর কারণ এ দেশে আধুনিক (তথা বুর্জোয়া) রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচন পদ্ধিতি বৃটিশ আমলে এবং বৃটিশ শাসকদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে বৃটিশ মডেল অনুসারে এদেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।[3] সে কারণে বাংলাদেশের অনেকের নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনই একমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থা বলে মনে হয়। আসলে তা নয়। পরিশিষ্টের সারণীতে বিশ্বের ১০৭টি দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। চিত্র-১ এই তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। এই সারণী থেকে আমরা নিম্নরূপ পরিলক্ষণসমূহ পাই।

প্রথমত, পরিশিষ্টের সারণীতে অন্তর্ভুক্ত ১০৭টি দেশের প্রায় ৬০ শতাংশেই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। উন্নত দেশসমূহের বেলায় এই অনুপাত আরও বেশি। সারণীতে অন্তর্ভুক্ত ২২টি উন্নত দেশের মধ্যে ১৯টি (তথা ৮৬ শতাংশ) দেশেই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত।

---

3. তবে বিষয়টি এত সরলও নয়। প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনে 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী' (সেপারেট ইলেক্টরেট) ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লক্ষ্যণীয়, 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী' ব্যবস্থার মধ্যে আনুপাতিক নির্বাচনের সীমিত ধরণের প্রতিফলন দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও, মূলগতভাবে বৃটিশরা স্বীয় দেশের অনুকরণে এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করেছিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ এবং প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব প্রজাতন্ত্র নতুন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে (সারণীতে যাদেরকে 'নতুন গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে), তাদের সবাই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অন্য অনেক দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব নির্ধারিত হলেও এসব দেশের জন্য তা প্রযোজ্য ছিল না। তারা গণতন্ত্র সংক্রান্ত সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে নিজেদের নির্বাচন ব্যবস্থা নির্ধারণের সুযোগ পেয়েছে। আমরা দেখতে পাই, তারা সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচনকেই শ্রেয় মনে করেছে।

তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যেও আনুপাতিক নির্বাচন যথেষ্টই প্রচলিত। বস্তুত প্রায় অর্ধেক (৪৭ শতাংশ) উন্নয়নশীল দেশই আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করছে। উপরে উল্লিখিত হয়েছে, প্রতিবেশী নেপালও (আংশিক) আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[4]

চিত্র ১।
বিশ্ব পরিধিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক ও আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন

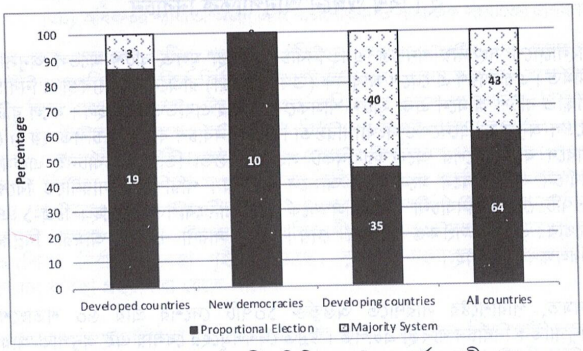

সূত্র: পরিশিষ্টের সারণীর ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক প্রণীত

চতুর্থত, যেসব দেশ দীর্ঘকাল যাবত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে, তাদের অনেকে তা বাতিল করে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

4. ২০১৫ সালে গৃহীত নতুন সংবিধান অনুযায়ী নেপালের সংসদে ১১০ জন সদস্য আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে (এবং বাকী ১৬৫ জন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে)।

এ দেশটি সম্প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচন গ্রহণ করেছে। বিশেষ লক্ষ্যণীয়, যুক্তরাজ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচন প্রসারিত হচ্ছে। যেমন, স্কটল্যান্ডের সংসদ নির্বাচন এবং ওয়েলশ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের এসেম্বলি নির্বাচন এবং এসব এলাকার সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আনুপাতিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। খোদ ইংল্যান্ডের 'লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে, এবং এই দলের সহযোগে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের নেতা ডেভিড ক্যামেরনকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, এই সরকার আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করবে। কানাডাতেও আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো আন্দোলন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে আনুপাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সে কারণে এই দলের প্রাইমারি বেশি আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ হয়। বিপরীতে, রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি দ্রুতই শেষ হয়ে যায় এবং আকর্ষণীয় ও অর্থবহ হয় না। ফলে এই দলও তাদের প্রাইমারিতে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা ভাবছে।

সংক্ষেপে, বিশ্বব্যাপী আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাই বেশি প্রচলিত। উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে; সবকটি নতুন গণতন্ত্রের দেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে; এমনকি আগে যেসব দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসরণ করেছে, তাদের অনেকেই আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির দিকে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীব্যাপীই এখন আনুপাতিক নির্বাচনের দিকে হাওয়া বইছে।

৩। আনুপাতিক নির্বাচনের রকমফের

লক্ষ্যণীয়, আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু রকমফেরও হতে পারে। এই পদ্ধতির মৌলিক রূপটি নিম্নরূপ। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ নির্বাচনের আগে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। এই তালিকার মধ্যে ক্রমানুবর্তিতাও প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ, পার্টি যদি মাত্র একটি আসন পায়, তাহলে যে এই আসনটি পাবে, তার নাম এই তালিকার সর্ব প্রথমে থাকবে। যদি পার্টি দুটি আসন পায়, তবে দ্বিতীয় আসনটি যিনি পাবেন তার নাম তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকবে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংসদে ৩০০ আসন। কাজেই দলসমূহ এরূপ ক্রমানুবর্তীতা সহকারে তিনশ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে। অবশ্য যদি কোনো দল মনে করে যে, তার এতগুলো আসন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে সে দল কম সংখ্যক প্রার্থী সহকারেও প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করতে পারে। এরপর নির্বাচন হবে, এবং জনগণ ভোট দিয়ে জানাবেন কে কোন দলকে সমর্থন করে। ধরা যাক কোনো দল ৪০ শতাংশ ভোট পেল। তাহলে সে দল সংসদের ৪০ শতাংশ, তথা ১২০টি আসন পাবে। তখন তার পূর্ব ঘোষিত তালিকার প্রথম ১২০ জন সংসদের সদস্য বলে নির্বাচিত হবেন। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য দল থেকেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আনুপাতিক নির্বাচনের মৌল বৈশিষ্ট হলো যে, এই নির্বাচনে কোনো ভোটই বিফলে যাওয়ার সুযোগ নেই। সবার ভোট সমানুপাতে

কার্যকর হবে। যেকোনো দলের সংসদে আসনের অনুপাত নির্বাচনে তার প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের সমান হবে।

উপর্যুক্ত মৌলিক রূপটি সত্ত্বেও আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু সুনির্দিষ্ট ভিন্নতাও হতে পারে। প্রথমত, দলসমূহ প্রণীত তালিকার উপর ভোটারদের প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে আনুপাতিক নির্বাচন দুই ধরণের হতে পারে: (ক) পূর্ব-নির্ধারিত তালিকা এবং (খ) উন্মুক্ত তালিকা। পূর্ব-নির্ধারিত তালিকা হলো যখন ভোটাররা পার্টির পূর্ব ঘোষিত তালিকার ক্রমানুবর্তীতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন না। পক্ষান্তরে, উন্মুক্ত তালিকা হলো যখন ভোটার কোনো দলের পক্ষে ভোট দেয়ার সময় সে দলের তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে তাঁর মতানুসারে ক্রমানুবর্তীতা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে, উন্মুক্ত তালিকা বিশিষ্ট আনুপাতিক নির্বাচনে ভোটাররা অধিকতর মত প্রকাশের সুযোগ পান। তবে এটা যেসব দেশে সংসদের আকার ছোট এবং ভোটারদের মধ্যে গড় শিক্ষার মান উঁচু, সেসব দেশের জন্য বেশি উপযোগী। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত তালিকার পরিবর্তে পূর্ব-নির্ধারিত তালিকাই বেশি উপযোগী হতে পারে।

আনুপাতিক নির্বাচনের দ্বিতীয় রকমফের হতে পারে এর প্রয়োগের পরিধির দৃষ্ঠিকোণ থেকে।[5] সর্বোচ্চ মাত্রার এবং সর্বাধিক প্রচলিত প্রয়োগের পরিধি হলো সমগ্র দেশ বা জাতীয় পর্যায়ে। সেক্ষেত্রে ভোটের হিসাব এবং সে অনুযায়ী আসনের ভাগাভাগি হবে সমগ্র দেশের পরিধিতে। আনুপাতিক নির্বাচনের এই রূপটির একটি নেতিবাচক দিক হলো, এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের (তথা আঞ্চলিক) প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত থাকে না, যদি-না অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় (সে বিষয়টি পরে আলোচিত হবে)। এ সমস্যা কাটানোর একটি উপায় হলো, আনুপাতিক পদ্ধতিটি সমগ্র দেশের পর্যায়ে প্রয়োগের পরিবর্তে অঞ্চল পর্যায়ে প্রয়োগ করা। লক্ষ্যণীয়, যতো উঁচু পর্যায়ে আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ হবে, ততোই এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্টটি বেশি পরিস্ফুট হবে। অন্যদিকে, যতো ক্ষুদ্র ভৌগলিক (আঞ্চলিক) পর্যায়ে আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ হবে ততোই আনুপাতিক নির্বাচনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট হ্রাস পাবে। বস্তুত, যদি আনুপাতিক নির্বাচন বর্তমানের একেকটি নির্বাচনী এলাকার (অর্থাৎ ৩০০ অঞ্চলের) পর্যায়ে প্রয়োগকৃত হয়, তবে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে পর্যবসিত হবে।

লক্ষ্যণীয়, উপরের দুটি দিকের মধ্যে সম্পর্কও রয়েছে। যদি আনুপাতিক নির্বাচন জাতীয় পরিধির পরিবর্তে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রয়োগকৃত হয়, তাহলে 'উন্মুক্ত তালিকা' পন্থা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, একেকটি অঞ্চলের জন্য মোট আসন সংখ্যা এবং দলীয় প্রার্থী তালিকার দৈর্ঘ্য ছোট হবে। ফলে ভোটারদের পক্ষে সকল প্রার্থীদের চেনা, মূল্যায়ন করা এবং তার ভিত্তিতে স্বীয় ক্রমানুবর্তীতা নির্ধারণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

5. ইংরেজিতে যেটাকে Unit of application বলে অভিহিত করা হয়।

আনুপাতিক নির্বাচনের তৃতীয় রকমভেদ হতে পারে এর প্রয়োগের মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে। আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ হতে পারে 'পূর্ণাঙ্গ'। এটা হয় যখন গোটা সংসদই আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়। তবে আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ 'আংশিক'ও হতে পারে। যেমন, ইতিপূর্বে উল্লেখিত নেপালে আংশিকরূপী আনুপাতিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। নেপালের সংসদের ১১০টি আসন আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে এবং বাকী ১৬৫টি আসন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। অন্য আরও কিছু দেশেও আনুপাতিক পদ্ধতির এ ধরণের আংশিক প্রয়োগ দেখা যায়। আনুপাতিক পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন অনেক দেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, একটি কক্ষ আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়; অন্যটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। আবার প্রত্যেকটি কক্ষও আংশিকভাবে আনুপাতিক (অর্থাৎ মিশ্র) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে পারে। সুতরাং, আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগের মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট বৈচিত্রের সুযোগ রয়েছে।।

চতুর্থত, 'উন্মুক্ত তালিকা'-রূপী সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরেকটি রকমফের হতে পারে। যেমন হতে পারে যে, প্রত্যেক ভোটার দল বাছাইয়ের জন্য কেবল একটি ভোটের পরিবর্তে মোট ৩০০টি (যতগুলি আসন) ভোট দেয়ার অধিকার পাবেন। সেক্ষেত্রে তিনি তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সকলকে একটি করে ভোট দিতে পারেন; কিংবা তিনি কাউকে কাউকে বেশি সংখ্যক ভোট দিয়ে তাদের প্রতি তার বিশেষ সমর্থন প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি, তিনি আর কাউকে কোনো ভোট না দিয়ে কেবল একজন প্রার্থীকেই ৩০০ ভোট দিতে পারেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ধরণের যোগমূলক (কিউমুলেটিভ) ভোট প্রদান পদ্ধতিসম্পন্ন উন্মুক্ত তালিকারূপী আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনে ভোটারদের মতামত প্রকাশের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষিতে উন্মুক্ত তালিকা এবং যোগমূলক ভোট খুব একটা প্রযোজ্য হবে কিনা সন্দেহ।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, আনুপাতিক নির্বাচনের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ সম্ভব– কিছু অপেক্ষাকৃত সরল, কিছু অপেক্ষাকৃত জটিল। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত সরল রূপের আনুপাতিক পদ্ধতিই অধিকতর উপযোগী হবে। তার আগে দেখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আনুপাতিক নির্বাচন কীভাবে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সহায়ক হতে পারে।

৪। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আনুপাতিক নির্বাচনের বিভিন্ন সম্ভাব্য সুফল

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন কিভাবে সহায়ক হতে পারে, তার দশটি দিক নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।[6]

6. এ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনার জন্য দেখুন Islam (2016), Chapter 5.

(ক) ভোটানুপাতের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা নির্বাচন ফলাফলের নাটকীয় পরিবর্তন রোধ

আনুপাতিক নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর দ্বারা ভোটানুপাতের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা নির্বাচনী ফলাফলের নাটকীয় পরিবর্তন রোধ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘকাল যাবত, এবং অনেকাংশে এখনও, মূলত দুটি দল বা জোট দ্বারা প্রভাবিত। এই দুই দলের ভোটানুপাত অনেকটা কাছাকাছি। অতীতে দেখা গেছে, এই ভোটানুপাতের সামান্য হেরফেরের কারণে নির্বাচনী ফলাফলের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এটাকে বলা যায় 'অসমানুপাতিক ফলাফলে'র সমস্যা। যেমন ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে বিএনপির ভোটানুপাত এবং আসনানুপাত ছিল, যথাক্রমে ৩৩.৬০ এবং ৩৮.৬৭ শতাংশ। ২০০১ সনের নির্বাচনে এই অনুপাতসমূহ হয়, যথাক্রমে, ৪১.০০ এবং ৬৪.৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ ভোটানুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৭.৪০ শতাংশ, কিন্তু আসনানুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৬৬ শতাংশ– প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশি। একইভাবে ২০০১ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটানুপাত এবং আসনানুপাত ছিল, যথাক্রমে, ৪০.২০ এবং ২০.৬৭ শতাংশ। ২০০৮ সনের নির্বাচনে এই অনুপাতসমূহ হয় যথাক্রমে ৪৯.০০ এবং ৭৬.৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ ভোটানুপাত বৃদ্ধি পায় ৮.৮০ শতাংশ, কিন্তু আসনানুপাত বৃদ্ধি পায় ৫৬.০০ শতাংশ– ৬.৩৬ গুণ বেশি (সারণী ১ এবং চিত্র ২-৩)

সারণী ১

বভিন্ন নির্বাচনে বড় দল ও অন্যান্যদের প্রাপ্ত ভোট এবং আসনের অনুপাত

Year	*Awami League*		Bangladesh Nationalist Party		*Jatiya* Party		Other	
	Share of votes (%)	*Share of seats (%)*	*Share of votes (%)*	*Share of seats (%)*	*Share of votes (%)*	*Share of seats (%)*	*Share of votes (%)e*	*Share of seats (%)*
1979	24.50	18.00	41.20	69.00	...	...	34.30	13.00
1991	30.10	29.33	30.80	46.67	11.90	11.67	27.20	12.33
1996	37.40	48.67	33.60	38.67	16.40	10.67	12.60	2.00
2001	40.02	20.67	41.00	64.33	7.22	4.67	18.98	15.00
2008	49.00	76.67	33.20	10.00	7.00	9.00	10.80	4.33
2014	79.14	78.00	...	...	11.31	11.33	9.55	10.67

Source: Author, based on information in Chapter 2 of Islam (2016)

অনেক সময় অসমানুপাতিক ফলাফলের সমস্যা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, তা 'বিপরীত ফলাফলে'র সমস্যার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ভোটানুপাত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দলের আসনানুপাত কমে যায়। বাংলাদেশে একাধিকবার এ ধরণের ঘটনা

ঘটেছে। যেমন আওয়ামী লীগের ভোটানুপাত ১৯৯৬ সনে ছিল ৩৭.৪০ শতাংশ। ২০০১ সনে এটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০.০২ শতাংশ। অথচ, একই সময়ে এই দলের আসনানুপাত কমে যায় ৪৮.৬৭ শতাংশ থেকে ২০.৬৭ শতাংশে। বিএনপির জন্যও একই ধরণের বিপরীত ফলাফলের উদাহরণ দেখা যায়। যেমন, ১৯৯১ সনে এই দলের ভোটানুপাত ছিল ৩০.৮০ শতাংশ। ১৯৯৬ সনে তা ৩৩.৬০ শতাংশে বৃদ্ধি পায়; অথচ একই সময়ে এই দলের আসনানুপাত ৪৬.৬৭ শতাংশ থেকে ৩৮.৬৭ শতাংশে হ্রাস পায় (সারণী ১ এবং চিত্র ২-৩)।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে একটি দলের জনপ্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে নির্বাচনী ফলাফলের (অর্থাৎ আসনুপাতের) ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে না। অনেক সময় এই সম্পর্ক এমনকি বিপরীতমুখী হয়ে যায়। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে, ভোটানুপাতের মাত্র কয়েক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে গোটা নির্বাচনী ফলাফলের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। কোন একটি দলের আসনসংখ্যা একবারেই কমে যেতে পারে; অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলের আসনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থাৎ আসনসংখ্যার পরিবর্তনের মধ্যে ভোটারদের নিকট বিভিন্ন দলের জনপ্রিয়তার প্রকৃত পরিবর্তনের সঠিক প্রতিফলন থাকে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের এই মৌলিক দুর্বলতার আলোকেই আনুপাতিক নির্বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটানুপাত আর আসনানুপাত সর্বদাই সমান। সুতরাং এই পদ্ধতিতে 'অসমানুপাতিক ফলাফলে'র কোন সম্ভাবনা থাকে না; 'বিপরীত ফলাফলে'র কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফলে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা হ্রাস পায়। আনুপাতিক নির্বাচনের এই বৈশিষ্টের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি হলো, কোন দলের ভোট কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই অপর দলকে সংসদ থেকে একরূপ 'বিদায় করে দেয়া'র সুযোগ নেই। ফলে নির্বাচন 'হয় জিত, কিংবা মৃত!' ('Do or die!')-র মতো বিষয় হয় না। আনুপাতিক নির্বাচনে কোন দলেরই মৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই; যদি-না ভোটারদের মধ্যে সে দল মৃত না হয়ে যেয়ে থাকে!

এ পদ্ধতিতে সকল দলেরই নিজ নিজ ভোটানুপাত অনুযায়ী জীবিত থাকা নিশ্চিত। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও অপর দল তাঁর ভোটানুপাত অনুযায়ী আসন পাবেই। ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একে অপরকে 'নিশ্চিহ্ন করে ফেলা'র প্রবণতা হ্রাস পাবে। যেহেতু কোনোভাবেই অপর দলকে 'নিশ্চিহ্ন' করা সম্ভব নয়, সেহেতু তাঁর সাথে সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফরে রাজনীতিতে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি বিস্তৃত হবে। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য তা অনুকূল হবে।

Figure 2: Share of votes and share of seats of *Awami League* in recent elections

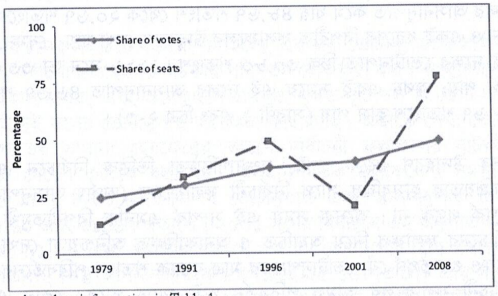

Source: Author, based on information in Table 1

Figure 3: Share of votes and share of seats of BNP in recent elections

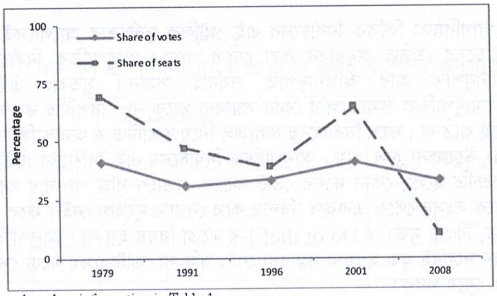

Source: Author, based on information in Table 1

(খ) কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার বিষয়গত সুযোগ এবং বিষয়ীগত প্রণোদনা হ্রাস

আনুপাতিক নির্বাচনের দ্বিতীয় সুফল হলো, এতে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার বিষয়গত (অবজেক্টিভ) সুযোগ এবং বিষয়ীগত (সাবজেক্টিভ) প্রণোদনা হ্রাস পায়। উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, আনুপাতিক নির্বাচনে ভোটানুপাতের অল্প পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলের বড় পরিবর্তনের সুযোগ নেই। অর্থাৎ, নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে হলে

'বৃহৎ' কারচুপির আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু, স্বল্প কারচুপি যতো সহজে করা যায়, বৃহৎ কারচুপি করা ততো সহজ নয়। বস্তুত কারচুপির পরিমাণ এবং কারচুপির মোট মূল্যের মধ্যকার সম্পর্কটি ক্রমবর্ধমান হারের (এক্সপোটেনশিয়াল) (চিত্র-৪)। ফলে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলের বিপুল পরিবর্তনের বিষয়গত সুযোগ হ্রাস পাবে।

চিত্র-৪। নির্বাচনে কারচুপির সুবিধা ও মূল্যের মধ্যকার সম্পর্ক

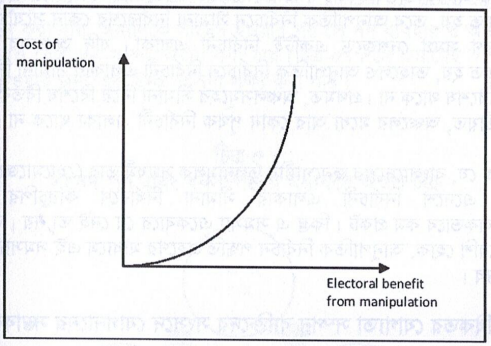

একইসাথে আনুপাতিক নির্বাচনে কারচুপি করার বিষয়ীগত প্রণোদনা হ্রাস পাবে। এর একটি কারণ স্পষ্ট। যদি কারচুপির বিষয়গত সুযোগ হ্রাস পায় তবে স্বাভাবিকভাবেই কারচুপি করার বিষয়গত প্রণোদনাও হ্রাস পাবে। কিন্তু এর পেছনে আরও কিছু কারণ আছে। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে কোন একটি আসনের ফলাফল নির্ভর করে সেই নির্বাচনী এলাকার ভোটের উপর। শুধু তাই নয়, প্রার্থীরাও সেই এলাকার। নির্বাচনী এলাকার ভোটের ফলাফলের সাথে এসব প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ভাগ্য আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে যায়। নির্বাচনে তারা প্রচুর অর্থ 'বিনিয়োগ' করে এবং বড় রকমের আর্থিক ও অন্যান্য সুফল (মুনাফা) প্রত্যাশা করে। (এ বিষয়ে আরও আলোচনা নীচে দেখুন।) ফলে, যেনতেন প্রকারে নির্বাচনে জেতার জন্য অদম্য চাপ ও প্রণোদনার সৃষ্টি হয়। সেকারণে অর্থের পাশাপাশি পেশীশক্তির ব্যবহার বেড়ে যায়। এভাবে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে অর্থ ও পেশীশক্তির ভূমিকা বৃদ্ধি পায়।

বিপরীতে, আনুপাতিক নির্বাচনে কোন এলাকার ভোটের সাথে সে এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত হয় না। বস্তুত আনুপাতিক নির্বাচনে আসনভিত্তিক কোনো নির্বাচনী এলাকাও নির্দিষ্ট হয় না। সেকারণে কোনো এলাকার ভোট নিয়ে কারচুপি করার জন্য স্থানীয় রাজনীতিবিদদের মরণপণ হওয়ার

কোনো কারণ থাকে না। ফলে নির্বাচনে অর্থ এবং বিশেষত পেশীশক্তি ব্যবহারের প্রণোদনা হ্রাস পায়।

(গ) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে কারচুপির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি সুবিধা এই যে, এর ফলে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে কারচুপির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়।[7] এর কারণ, এই নির্বাচন পদ্ধতিতে আসন ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকা নেই। বস্তুত, যদি সমগ্র দেশের পরিধিতে প্রয়োগকৃত হয়, তবে আনুপাতিক নির্বাচনে সীমানা নির্ধারণের কোন সুযোগই থাকে না, কারণ সমগ্র দেশজুড়ে একটিই নির্বাচনী এলাকা। যদি অঞ্চলের ভিত্তিতে প্রয়োগকৃত হয়, তাহলেও আনুপাতিক নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের সমস্যা বিশেষ থাকে না। প্রথমত, অঞ্চলসমূহের সীমানা নিয়ে বিশেষ বিতর্কও থাকে না। দ্বিতীয়ত, অঞ্চলের মধ্যে আর কোন পৃথক নির্বাচনী এলাকা থাকে না।

এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক সমধর্মীতার (হোমোজেনেইটির) কারণে এদেশে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে কারচুপির সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম প্রকট। কিন্তু এ সমস্যা একেবারে যে নেই তা নয়। তবে কম হোক, বেশি হোক, আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যা দূরীভূত করা সম্ভব।

(ঘ) অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংসদে যোগদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি

আনুপাতিক নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য সুফল হলো, সংসদে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদের যোগাদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থায় সাংসদের মানের অবনতি ঘটছে। অর্থবলই বর্তমানে সাংসদ হওয়ার মূল চাবিকাঠি। পেশীশক্তি সংগ্রহ এবং ব্যবহার করার জন্যও অর্থ প্রয়োজন। সে জন্যই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে সাংসদদের মধ্যে আশি শতাংশেরও বেশি হচ্ছে ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। এদের অনেকে নেহাত অর্থের বিনিময়ে সাংসদ হচ্ছে; বলা যেতে পারে, সাংসদ পদ কিনে নিচ্ছে। এদের বহুলাংশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংসদ পদ ব্যবহার করে নিজেদের ধনসম্পদ আরও বৃদ্ধি করা। সে উদ্দেশ্যে এরা সংসদ ব্যবহার করে বিভিন্ন নিয়মকানুনও বানিয়ে নিচ্ছে। যেমন, সাংসদ হওয়া মাত্রই এরা বিনা শুল্কে গাড়ি আমদানির সুযোগ পায়, এবং এই সুযোগ ব্যবহার করে রাতারাতি কোটিপতি বনে যায়। এরা নিজেদেরকে রাজউকের বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্পে জমি পাওয়ার অধিকারী করেছে। এতে করে আরও কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়ে যায়। নিজ নিজ এলাকার সকল টেন্ডার-পারমিট, স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতিত্ব ইত্যাদি এদের করায়ত্ত হয়ে যায়; এবং এসবের অপব্যবহারের মাধ্যমে আরও বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়।

7. ইংরেজিতে এই সমস্যার নাম দেয়া হয়েছে 'জেরিমিয়েন্ডারিং' (jerrymeandering)।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্যপদ ব্যবহার করে যেসব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প ও বাজেটের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তা থেকে সুবিধা আদায় করে। অসৎ ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা কর ফাঁকি, ব্যাংক ঋণ খেলাপ ইত্যাদি অপরাধ করে এবং তা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্যও সাংসদ পদ ব্যবহার করে। সামগ্রিকভাবে, সাংসদ হওয়া যেন একটি বিপুল লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত সাংসদ হওয়া যেন বাংলাদেশে ধনী হওয়ার সবচেয়ে দ্রুত, সহজ এবং নিশ্চিত পথ। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে সংসদ পদ এবং ধন-সম্পদের মধ্যে একটি দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। একদিক ধন-সম্পদ দ্বারা সংসদ পদ অর্জন করা যায়, অন্যদিকে সাংসদ হওয়ার পর সে পদ ব্যবহার ও অপব্যবহার করে আরও বেশি ধন-সম্পদ অর্জন করা যায় (চিত্র-৫)। সে কারণেই বাংলাদেশে সাংসদ হওয়ার জন্য এক উদগ্র বাসনা লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ৫।
সংসদ পদ এবং ধনসম্পদের মধ্যকার অশুভ চক্র

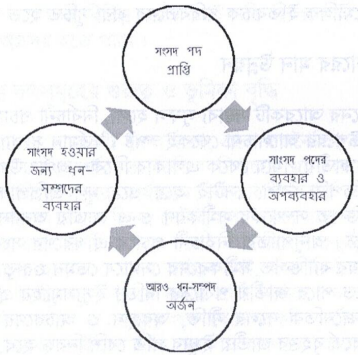

বহু নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি মাস্তানেরা সাংসদ বনে গেছে। নিজ নিজ এলাকায় সন্ত্রাসের কারণে এদের অনেকে 'গড-ফাদার' উপাধি পেয়েছে; অনেকে 'ইয়াবা-কিং' বলে পরিচিত হয়েছে। কোনো কোনো সাংসদ গাড়িতে বসে নিজ এলাকার সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালাতে দ্বিধা করে না। এ ধরনের লোকজন দ্বারা বর্তমানের সংসদ আকীর্ণ। এদের দাপটে কম অর্থবলের, ত্যাগী রাজনীতিবিদেরা আর সংসদে যেতে পারে না। অর্থনীতিতে গ্রেশাম'স ল' বলে একটি কথা আছে; তা হলো, 'Bad money drives away good money!' বাংলাদেশের সংসদের দিকে তাকালে অনেক সময় সে কথাই মনে হয়।

আনুপাতিক নির্বাচন অপেক্ষাকৃত ভাল ও যোগ্য লোকজনকে সংসদে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে সাংসদ প্রার্থী মনোনয়নের সময় মনোযোগ চলে যায় জাতীয় পর্যায় থেকে এলাকার দিকে (অর্থাৎ, উপর থেকে নীচে); দেখা হয় স্বীয় এলাকায় মনোনয়ন প্রত্যাশীর জেতার সম্ভাবনা আছে কিনা, যা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মূলত নির্ভর করে অর্থবল এবং পেশীবলের উপর। আনুপাতিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহকে এমনসব লোকজনকে প্রার্থী তালিকায় নিতে হবে যাদের জাতীয় ভিত্তিতে পরিচিতি আছে (অর্থাৎ, নজর যাবে নীচে থেকে উপরে)। সংসদের মূল দায়িত্ব জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন বিষয়ে নীতি ও আইন প্রণয়ন। কাজেই জাতীয় পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজনদেরই সংসদে আসা প্রয়োজন। জাতীয় ভিত্তিক পরিচিতি অর্জন করতে হলে একজন ব্যক্তিকে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। সে যোগ্যতা শুধু অর্থ ও পেশী শক্তি দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে, একদিকে যেমন দলসমূহ নিজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজনের সন্ধান করবে, তেমনি এ ধরণের লোকজন নিজেদেরকে (বর্তমানের বহুলাংশে পঙ্কিল) রাজনীতি থেকে দূরে রাখার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার এবং তাদের প্রার্থী হিসেবে সংসদে যোগ দিয়ে দেশের আরও উপকার করার জন্য উৎসাহী হবে। এভাবে দেশের রাজনীতির গুণাগুণের একটি মৌলিক ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হতে পারবে।

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারের মান উন্নয়ন

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি সম্ভাব্য সুফল হলো, নির্বাচনী প্রচারের গুণগত মান বৃদ্ধি। এ বিষয়টি উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে দৃষ্টি যায় জাতীয় পর্যায় থেকে এলাকার দিকে– অর্থাৎ উপর থেকে নীচে। এলাকায় কার প্রতিপত্তি বেশি, সেটাই হয়ে ওঠে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ফলে এলাকার ভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমীকরণ ও এ জাতীয় অন্যান্য সংকীর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আনুপাতিক নির্বাচনী প্রচারে এ ধরণের সংকীর্ণতার সুযোগ কম। স্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তিগত সমীকরণের সেখানে তেমন গুরুত্ব নেই। দৃষ্টি বরং সম্পূর্ণত নিবদ্ধ হতে পারে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুসমূহের প্রতি এবং সেসব ইস্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি, অবস্থান ও আচরণের উপর। স্থানীয় কূপমুণ্ডকতার পরিবর্তে বৃহত্তর জাতীয় ইস্যুর প্রতি বেশি নিবদ্ধ হবে, এবং এর ফলে নির্বাচনের প্রচারাভিযানের মানের উন্নতি হবে।

(চ) প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল হলো, তা প্রাক নির্বাচনী জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে দলসমূহ প্রাক-নির্বাচনী জোট বাঁধার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এর কারণ, ভোটানুপাতের সামান্য পরিবর্তন দ্বারাই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে। ফলে দলসমূহ চেষ্টা করে প্রাক নির্বাচনী জোট গঠনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য। সে

কারণে অনেক সময় বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত শক্তি-সমাবেশ নিয়েও জোট গঠিত হয়, যেগুলোকে ইংরেজিতে Unholy Alliance (অপবিত্র কিংবা অশুভ মৈত্রী) বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনেই এ ধরনের মৈত্রী উদাহরণ দেখা গিয়েছে। বর্তমান নির্বাচনের প্রাক্কালেও এরূপ বিভিন্ন মৈত্রীর দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। এ ধরণের পাঁচমিশেলি জোট এবং মৈত্রী গঠনের একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে যে, এতে করে দলসমূহ তাদের প্রকৃত পরিচয়ে জনগণের নিকট আবির্ভূত হতে পারে না, এবং জনগণও বিভিন্ন দলের প্রকৃত নীতি ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

আনুপাতিক নির্বাচনে প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। জোট গঠনের সকল তৎপরতা নির্বাচনের পর সংঘটিত হতে পারে। এতে একাধিক সুবিধা। প্রথমত, নির্বাচনে সকল দল নিজ নিজ পরিচয়ে হাজির হতে পারে এবং নিজেদের ভোটানুপাত যাচাই করতে পারে। ফলে নির্বাচনে পরিচ্ছন্ন বিতর্ক হতে পারে এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন দলের সমর্থনের সঠিক পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন পরবর্তী (সরকার কিংবা সংসদের বিরোধীপক্ষ গঠনের লক্ষ্যে) জোট গঠনের প্রক্রিয়া বিভিন্ন দলের শক্তি সংক্রান্ত 'অনুমানের' পরিবর্তে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 'প্রমাণিত উপাত্তে'র ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে। এভাবে দেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্র বিভিন্ন দলের ভোট শক্তি সম্পর্কে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে।

(ছ) রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব ও ভূমিকা বৃদ্ধি

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি সুফল হলো, এতে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য এবং অতীতে দলের কার্যক্রমে ভূমিকার পরিবর্তে এলাকায় প্রতিপত্তি (জিতে আসার সক্ষমতা) আছে কিনা, সেটাই মূল বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দলের ত্যাগী কর্মী এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু যাদের হয়তো সেরকম অর্থবল নেই, তাঁরা নির্বাচনের সময় যথাযথ স্বীকৃতি পান না। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী নির্ধারণে দলের তেমন কোনো সক্রিয় যৌথ ভূমিকা থাকে না। দলের পক্ষ থেকে একটি 'মনোনয়ন বোর্ড' গঠিত হয়; এই বোর্ড সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনয়ন দেন। দলের বাকিদের এক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। এসব মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য দলের কোন প্রাক-নির্বাচন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে, নির্বাচনের সময় দলের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগের পরিবর্তে দল ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি দ্বারা বিকর্ষিত হয়। অর্থাৎ দল 'সেন্ট্রিফুগাল শক্তি' দ্বারা আক্রান্ত হয়।

আনুপাতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। দলীয় প্রার্থী (ক্রমানুবর্তীতাসম্পন্ন) তালিকা নির্ধারণের জন্য দলকে প্রাক-নির্বাচনী সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। এই সম্মেলনে যৌথ আলোচনা এবং প্রকৃত ভোটের মাধ্যমে

এই প্রার্থী তালিকা প্রণীত হতে হবে। নতুবা গোটা দল এই তালিকাকে নিজের তালিকা মনে করবে না; তালিকার পেছনে সমবেত হবে না; তালিকাকে জেতানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না। কাজেই দলকে জেতানোর স্বার্থে দলীয় নেতৃত্ব নিজ থেকেই প্রাক-নির্বাচন সম্মেলনের আয়োজন করবে। নতুবা প্রার্থী তালিকার পুরো দায়িত্ব শুধুমাত্র দলীয় নেতৃত্বের ঘাঁড়ে এসে পড়বে; এবং সে পুরো দায়িত্ব গ্রহণ দলীয় নেতৃত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। ফলে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রাক্কালে মনোযোগ দলীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার উপর নিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ দলের মধ্যে 'সেন্ট্রিপেটাল শক্তি' সৃষ্টি হবে। সাধারণ নির্বাচনের আগে দলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এটা অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইমারি নির্বাচনের মতো। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই দলের অভ্যন্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থী তালিকা নির্ধারিত হয়, যদিও সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশে তেমন খবর প্রচারিত হয় না। সামগ্রিক বিচারে, নির্বাচন এবং সংসদ গঠনে দলীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সাংবাৎসরিকভাবেই দলীয় অভ্যন্তরীণ জীবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। দলীয় প্রার্থী তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য, এবং ক্রমানুবর্তীতায় উপরে থাকার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, যাতে প্রাক নির্বাচনী সম্মেলনে তাঁরা বেশি প্রতিনিধির ভোট পায়।

এই প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম ফলশ্রুতি হবে যে, সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য অর্থবলই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে না। অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে দলীয় কাজে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার মাধ্যমে এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিগণ দলের প্রার্থী তালিকায় এবং সংসদে স্থান করে নিতে পারবেন। ফলে দেশের রাজনীতিতে দলীয় জীবন এবং দলের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রসঙ্গে আনুপাতিক নির্বাচনের আরও কয়েকটি সম্ভাব্য ইতিবাচক দিকের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, আনুপাতিক নির্বাচন 'বিদ্রোহী প্রার্থী' সমস্যার প্রশমন করতে পারে। দলের প্রার্থী তালিকায় যারা স্থান পাবেন না তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদেরকে অন্য দল গঠন করতে হবে। তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে এরূপ পৃথক দল গঠন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তাঁর নিবন্ধন পাওয়া, এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ ও সময় আর নাও থাকতে পারে। ফলে মনোনয়ন না পেলেই বিদ্রোহী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়ত, আনুপাতিক নির্বাচনে একই ব্যক্তির একাধিক আসন থেকে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে না। ফলে বিভিন্ন আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পরে একটি রেখে বাকিগুলো থেকে পদত্যাগ এবং সেগুলোতে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিড়ম্বনা এড়ানো সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, আনুপাতিক নির্বাচনে মৃত্যু, অসুস্থতা, অথবা অন্যান্য কারণে কোনো সাংসদ নিজ দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর দল সে আসনের জন্য তাদের দলীয় তালিকা থেকে ক্রমানুবর্তীতায়

পরবর্তী ব্যক্তিকে সেই আসনের জন্য মনোনীত করতে পারেন। এটাও আনুপাতিক নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিরই আরেকটি উদাহরণ।

(জ) স্থানীয় সরকারসমূহের ভূমিকা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা

আনুপাতিক নির্বাচনের একটি সবিশেষ সুফল হলো, স্থানীয় সরকারসমূহের ভূমিকা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি। বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির ফলে স্থানীয় সরকারসমূহ সঠিকভাবে বিকশিত হতে এবং উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ হলো, এই নির্বাচন পদ্ধতিতে একজন সাংসদ একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন, ফলে তিনি ঐ এলাকার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে সাংসদদের ভূমিকার মধ্যে একটা দ্বৈততার উদ্ভব ঘটে। একদিকে তিনি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াদি নিয়ে নীতি ও আইন প্রণয়নকারী। অন্যদিকে তিনি একটি নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি। এই দ্বৈততার সুযোগ নিয়ে সাংসদেরা নিজেরাই বিভিন্ন আইন, আদেশ ও নীতিমালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে কায়েম করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এর দুটি উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়। একটি হলো, এলাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তার ব্যবহার ও অপব্যবহার থেকে উপকৃত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো, এরূপ কর্তৃত্ববলে এলাকার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভুত্ব বজায় রাখা এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচনে জিতে আসা সুগম করা।

উপর্যুক্ত কারণে দেখা যায় সাংসদেরাই স্বীয় এলাকার সকল স্থানীয় বিষয়ের যেন হুকুমদার হয়ে ওঠেন। বস্তুত, সাংসদেরা প্রায়শ স্বীয় এলাকায় ক্ষুদে স্বৈরাচারীতে পরিণত হন। তাদের এই 'দাপটে'র ফলে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ভূমিকা হারিয়ে সাংসদের বশংবদে পরিণত হয়। স্থানীয় সরকারসমূহ সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না। উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে সাংসদদের সংঘাত বাংলাদেশে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বলাবাহুল্য, এই পরিণতি দুঃখজনক, কারণ বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে গণমুখী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আনুপাতিক নির্বাচন এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারে। এই পদ্ধতি সাংসদদের ভূমিকার উপর্যুক্ত দ্বৈততার অবসান ঘটায়। তাদের ভূমিকা শুধুমাত্র জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নীতি ও আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন না; এরূপ কোনো এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন না; এবং সে এলাকার উন্নয়ন বিধান এবং তদারকি তাদের করণীয়র মধ্যে পড়ে না। স্থানীয় বিষয়াদি এবং উন্নয়ন শুধুমাত্র স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব বলে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হয়; ফলে স্থানীয় সরকারসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং বিকশিত হতে পারে।

(ঝ) নির্বাচনে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং জনগোষ্ঠীর জন্য 'সমতল জমিন' সৃষ্টি এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন সংসদ গঠন

আনুপাতিক নির্বাচনের একটি বড় সুফল হলো যে, এতে ছোট-বড়, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ, সকলের জন্য প্রতিনিধিত্ব অর্জনের সমান সুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একটা 'সমতল জমিন' তথা 'level playing field' নিশ্চিত হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচনের একটি বড় সমস্যা হলো তথাকথিত 'অপচিত ভোটে'র সমস্যা। ধরা যাক কোন একটি আসনে একজন প্রার্থী ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন; আর বাকি পাঁচজন প্রার্থী প্রত্যেকে ১৫ শতাংশ করে ভোট পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রথম প্রার্থী জয়লাভ করলেন, এবং বাকি ৭৫ শতাংশ ভোটের কোনো মূল্য থাকলো না। এই ভোট অপচিত ভোটে পর্যবসিত হলো। এটাকেই 'অপচিত ভোটে'র সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ক্ষুদ্র দলগুলোর জন্য 'অপচিত ভোটে'র সস্যা এক বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ ভোটারেরা আগে থেকেই জানেন যে, এসব দলের প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন না (অর্থাৎ জিতবেন না)। সাতরাং তাদেরকে দেয়া ভোট নিশ্চিতভাবেই 'অপচিত ভোট' হবে। ফলে তাঁরা এসব দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান না। সে কারণে এসব দল সহজে ক্ষুদ্র থেকে বড়ও হতে পারে না। তাঁরা একটা কুচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে যায় (চিত্র-৬)।

চিত্র ৬।
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন, অপচিত ভোট এবং ক্ষুদ্র দল এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সৃষ্ট কুচক্র

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের জন্যও একই পরিস্থিতি প্রযোজ্য। ক্ষুদ্রতার কারণে তাদের প্রার্থীরাও 'অপচিত ভোট' সমস্যার শিকার হন। ফলে ক্ষুদ্র দল এবং জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচনে স্বীয় পরিচয়ে সহজে সংসদের সদস্য হতে পারেন না। সেকারণে অনেক সময় দেখা যায়, স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য তাঁরা বড় দল এবং জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অন্তর্নিহিতভাবেই বড় দল এবং জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক, এবং ছোট দল এবং জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক।

আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংসদে আসন পাওয়ার জন্য কোন একটি আসনে (অথবা এলাকায়) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার প্রয়োজন নেই। মোট ভিত্তিতে যে দল যতো শতাংশ ভোট পাবে, সংসদেও সে দল ততো শতাংশ আসন পাবে। সুতরাং, আনুপাতিক নির্বাচনে কোনো ভোটই অপচিত ভোট নয়। সকল ভোটের মূল্য সমান– ভোটের আগে এবং পরে। ফলে সংসদ আরও বেশি প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে; সমাজের সকল অংশ সংসদের সাথে সম্পৃক্তি বোধ করতে পারে; এবং তা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সমাজের কোনো অংশ দেশের সংসদ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে না; এবং স্বীয় ক্ষোভ বা বঞ্চনা প্রকাশের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন কিংবা এ ধরণের কোনো গণতন্ত্রে বহির্ভূত পন্থা সহজে গ্রহণ করবে না।

(ঞ) অধিকতর ন্যায্যতা অর্জন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের প্রশমণ

উপর্যুক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন অধিকতর ন্যায্য বলে প্রতিভাত হবে, এবং তাঁর ফলে দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের প্রশমন ঘটবে। প্রথমত, এ পদ্ধতিতে আসনুপাত সবসময় ভোটানুপাতের সমান; ফলে নির্বাচনের ফলাফলের ন্যায্যতা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতি ছোট-বড় সকল দল এবং জনগোষ্ঠী সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জনের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। ফলে সে দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পদ্ধতি ন্যায্য বলে প্রতিভাত হবে। ন্যায্যতা হলো শান্তির পূর্বশর্ত। যেহেতু এই নির্বাচন পদ্ধতি অধিকতর ন্যায্য বলে প্রতীয়মান হবে, সেহেতু তা দেশে অধিকতর শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

৫। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকসমূহ

বাংলাদেশ গণতন্ত্রের বিকাশে আনুপাতিক নির্বাচনের উপর্যুক্ত ইতিবাচক দিকসমূহের পাশাপাশি এর কিছু সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকও রয়েছে। আলোচনার ভারসাম্যের স্বার্থে সেগুলোও লক্ষ্য করা দরকার, এবং সেগুলো প্রশমনের কী উপায় আছে সে বিষয়টিও আলোচনা প্রয়োজন। নীচে এরূপ তিনটি দিকের আলোচনা করা হলো।

(ক) ভৌগলিক প্রতিনিধিত্বের সমস্যা

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির একটি দুর্বলতা হলো সংসদের ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। স্বীয় প্রার্থী তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক দলসমূহ নিঃসন্দেহে দেশের সকল এলাকা থেকে প্রার্থী অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করবে, কারণ সকল এলাকার মানুষের ভোট তাঁরা তাদের তালিকার পক্ষে চাইবে। কিন্তু যেহেতু কোন দলের তালিকা থেকে কতজন প্রার্থী নির্বাচিত হবে তা আগে থেকে বলা যায় না, সেহেতু নির্বাচিত সংসদ কতখানি ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করবে, তা অনিশ্চিত থেকে যায়।

দলসমূহকে নিজ নিজ প্রার্থী তালিকায় সকল অঞ্চল থেকে প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো কিংবা নিয়ম-প্রথা চালু করা ছাড়াও সংসদের ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অন্যান্য সুযোগও আনুপাতিক পদ্ধতির মধ্যে আছে। ইতোপূর্বে আমরা তার কিছু উল্লেখও করেছি। এর একটি হলো পুরো দেশের পরিধিতে প্রয়োগ না করে এই নির্বাচন পদ্ধতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিধিতে প্রয়োগ করা। যেমন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আনুপাতিক নির্বাচন চারটি বড় বড় অঞ্চলের ভিত্তিতেও প্রয়োগকৃত হতে পারে। বাংলাদেশে আগে চারটি বিভাগ ছিল: রাজশাহী বিভাগ (উত্তরবঙ্গ); খুলনা বিভাগ (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল); সিলেট বিভাগ (পূর্বাঞ্চল); এবং ঢাকা বিভাগ (মধ্য অঞ্চল)। ধরা যাক, এই চার অঞ্চলের ভোটারসংখ্যা সমান। সেক্ষেত্রে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য আসন সংখ্যা হবে ৭৫টি। তখন প্রত্যেক অঞ্চলে যে দল যতো শতাংশ ভোট পাবে সে অনুযায়ী ঐ ৭৫টি আসন বিতরিত হবে। এতে চারটি অঞ্চলের সম-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। তবে আগেই উল্লিখিত হয়েছে, আনুপাতিক পদ্ধতি যতো ছোট অঞ্চল ভিত্তিক প্রয়োগকৃত হবে ততো এর মূল স্পৃহাটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক পদ্ধতি জাতীয় পর্যায়ের পরিবর্তে অঞ্চল পর্যায়ে প্রয়োগের প্রয়োজন আছে কিনা, তা ভাবার বিষয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশের জন্য ভৌগলিক প্রতিনিধিত্বের সমস্যাও ততো প্রকট নাও হতে পারে। প্রথমত, দেশটি ভৌগলিকভাবে ক্ষুদ্র। দ্বিতীয়ত, এ দেশের জনগোষ্ঠী বহুলাংশে সমধর্মী (হোমোজিনিয়াস)।

ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনের দ্বিতীয় উপায় হলো সংসদে আনুপাতিক ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যদের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভৌগলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যদের স্থান করে দেয়া। নেপালে গৃহীত (আংশিক) আনুপাতিক পদ্ধতি কিছুটা সে ধারাতেই রচিত হয়েছে।

ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনের তৃতীয় উপায় হলো দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, অথবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক মূল সংসদের পাশাপাশি আরেকটি ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক ফোরাম সৃষ্টি। বাংলাদেশে যেমন উপজেলা চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি ফোরাম হতে পারে, এবং সংসদের কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণে (যেমন বাজেট

অনুমোদনে) এই ফোরামকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। কাজেই মূল আনুপাতিক পদ্ধতি বজায় রেখেও বিভিন্ন উপায়ে ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করা সম্ভব। আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।৪

সর্বোপরি জাতীয় সংসদের ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য কিনা, সেটা প্রশ্নের বিষয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আনুপাতিক নির্বাচনে জাতীয় পরিধির প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংসদের সদস্য হাওয়ার সম্ভাবনা বেশি; ফলে তারা দেশের সকল এলাকার স্বার্থ রক্ষা করবেন এটাই প্রত্যাশিত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা করে ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজন আছে কিনা, তা প্রশ্নের বিষয়।

(খ) ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা?

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, আনুপাতিক নির্বাচন কেবলই জোট (কোয়ালিশন) সরকারের জন্ম দিবে; ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন ডেকে আনবে; এবং তা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করবে। এই অনুমানের একটি ভিত্তি হলো আনুপাতিক নির্বাচনের অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য। উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, আনুপাতিক নির্বাচনে ছোট দলসমূহ এবং জনগোষ্ঠীর সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জন সহজ হয়; ফলে সংসদে উপস্থিত দলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, একদিকে বড় দলগুলোর আসন সংখ্যা হ্রাস পাবে; অন্যদিকে বহু ছোট দলের উপস্থিতি দেখা যাবে। ফলে সরকার হবে মূলত জোট সরকার। ধারণা করা হয় যে, যেহেতু একক দলের সরকারের চেয়ে জোট সরকার সময়সময়ই অধিকতর অস্থিতিশীল, সেহেতু ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের সমস্যা দেখা দিবে।

ঘনিষ্ঠ বিচারে দেখা যায় এসব যুক্তি পুরো ঠিক নয়। বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন না হওয়া সত্বেও কোয়ালিশন সরকার হচ্ছে, ও বড় দলগুলো অনেক সময় ছোট দলের উপর সরকার গঠনের জন্য নির্ভরশীল হচ্ছে। ভারতেও আমরা দেখি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার অধীনেই ১৯৭০ দশক পর্যন্ত একক দল ভিত্তিক (কংগ্রেসের) সরকার ছিল। আশির দশক থেকে কোয়ালিশন সরকারের পর্ব শুরু হয়। আবার সম্প্রতি বিজেপির নেতৃত্বে একক দলীয় সরকারের আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং, সরকার একদলীয় হবে নাকি জোটভিত্তিক হবে, তা বেশি নির্ভর করে তলবর্তী রাজনৈতিক বিভক্তির উপর, নির্বাচন ব্যবস্থার উপর নয়। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্যণীয়, আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের আগে কোন জোট গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না (উপরের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত, যদিও উভয় ধরণের নির্বাচন ব্যবস্থাতেই জোট সরকার সম্ভব, তবে আনুপাতিক নির্বাচনের অধীনে গঠিত জোট সরকার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কে অনুমানের পরিবর্তে যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (উপরের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৮. এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইস্যুসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Islam (2008a)।

তদুপরি, আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদে যেহেতু বেশি সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ থাকবে, সেহেতু সেখানে আরও বেশি প্রতিনিধিত্বশীল জোট গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে; সেটা বরং একটি ইতিবাচক দিক।

সর্বোপরি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সরকারের অস্থিতিশীলতা মানেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নয়। যেমন ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন; তাঁর মানে এই নয় যে, ইতালি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দ্বারা আক্রান্ত। যদি সংসদে দেশের সকল মূল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকে, এবং সরকার গঠন ও পতনের প্রক্রিয়া সংসদীয় নিয়ম মেনে চলে, তবে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন অতো উদ্বেগেরে কারণ নাও হতে পারে। সংসদ যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্বশীল কিনা এবং সংসদীয় ব্যবস্থা স্থিতিশীলভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা, সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়।

(গ) 'মনোনয়ন বাণিজ্য' এবং 'দলের পিঠে সওয়ার হওয়া'র সমস্যা

আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে একটি শঙ্কা হলো, এতে 'মনোনয়ন বাণিজ্য' আরও বেড়ে যাবে এবং 'দলের পিঠে সওয়ার হওয়া'র নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। এই শঙ্কার ভিত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে নীচের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমত, মনোনয়ন বাণিজ্য বর্তমান, তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক, নির্বাচনেও প্রচলিত (যে কারণে এ কথাটির উদ্ভব ঘটেছে)। বলা হয়ে থাকে, দলীয় তহবিলে বড় অংকের অনুদানের মাধ্যমে অনেকে দলের মনোনয়ন পেয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, মনোনয়ন পেলেও প্রার্থীকে স্বীয় এলাকায় নির্বাচনে জিততে হয়; তবেই কেবল সে সাংসদ হতে পারে; নতুবা নয়। অর্থাৎ, মনোনয়ন পাওয়ার পরও প্রার্থীকে এলাকার ভোটারদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা (অথবা সক্ষমতা) প্রমাণ করতে হয়। পক্ষান্তরে, আনুপাতিক নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকায় একবার ঢুকে যেতে পারলে আর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে হিসেবে বলা যেতে পারে, আনুপাতিক পদ্ধতিতে মনোনয়ন বাণিজ্যের সম্ভাবনা আরও প্রকট এবং এতে দলের উপর সওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আনুপাতিক নির্বাচনে দলের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (তথা অর্থ এবং সম্পর্কের কারণে মনোনয়ন পেয়ে যাওয়া) ততো সহজ হবে না। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় দলীয় 'মনোনয়ন বোর্ড' দলের স্বল্প সংখ্যক নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু আনুপাতিক নির্বাচনের জন্য দলীয় তালিকা দলীয় সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রণীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। ফলে আনুপাতিক নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য বরং হ্রাস পেতে পারে। কারণ, সম্মেলনের সকল প্রতিনিধিদের অর্থ দিয়ে 'হাত করে ফেলা' সহজ হবে না। এদিকে, যদি সত্যসত্যই দলের সম্মেলনে নির্বাচনের মাধ্যমে, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দলের প্রার্থী তালিকা

নির্ধারিত হয়, তবে সে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের আর 'দলের ঘাড়ে সওয়া হওয়া'র অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না, কারণ দল স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে (নিজের ঘাড়ের উপর তুলেছে!)। অর্থাৎ, যদিও আনুপাতিক নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সাধারণ নির্বাচনে প্রমাণ করতে হয় না, তাদেরকে সেটা দলের অভ্যন্তরে (তথা, প্রাইমারি পর্যায়ে) ঠিকই প্রমাণ করতে হয়। লক্ষ্যণীয়, প্রাইমারি পর্যায়ে প্রার্থীদের কেবল দলের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যই চেষ্টা করতে হয় না; তাদেরকে আরও চেষ্টা করতে হয় এই তালিকায় যতো পারা যায় উপরের দিকে থাকতে– অর্থাৎ ক্রমানুবর্তীতার প্রতিযোগিতায়ও ভাল করতে হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রমাণের প্রয়োজন আনুপাতিক নির্বাচনেও কম নয়।

সবশেষে লক্ষ্য করা দরকার, আনুপাতিক নির্বাচন 'উন্মুক্ত তালিকা' রূপেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ ভোটাররাও সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ পাবেন। এরসাথে যোগমূলক ভোট পদ্ধতি যোগ হলে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের রায় আরও বেশি প্রভাবশালী হতে পারে। বাংলাদেশে গড় শিক্ষার হার যখন আরও বৃদ্ধি পাবে তখন এ ধরণের আরও উন্নত মানের আনুপাতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

৬। উপসংহার

বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনও সমস্যাসংকুল। এসব সমস্যার তলবর্তী কারণ হলো অ-বিকশিত অর্থনীতির সাথে বিকশিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর অসংগতি। এই অসংগতি নিরসনের উপায় দ্রুত দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও শিল্পায়ন। তবে স্বল্প- মেয়াদেও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা অর্জন ও বিকাশের জন্য সহায়ক হতে পারে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম সম্ভাবনাময় হলো বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন। এ প্রবন্ধের আলোচনা থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন উপায়েই আনুপাতিক নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মনোন্নয়নের জন্য সহায়ক হতে পারে। আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু সমস্যাও আছে। তবে সেসব কাটানোর বিভিন্ন উপায়ও আছে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব কিনা। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ কতগুলো বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, জনগণের কাছে পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনই একমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। বস্তুত পৃথিবীর বেশিরভাগ উন্নত দেশে আনুপাতিক ব্যবস্থা প্রচলিত। ইংল্যান্ডেও আনুপাতিক নির্বাচনের প্রচলন বাড়ছে। নিউজিল্যান্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন পরিত্যাগ করে সম্প্রতি আনুপাতিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। প্রায় অর্ধেক উন্নয়নশীল দেশেও আনুপাতিক ব্যবস্থা অনুসৃত হচ্ছে। প্রতিবেশী নেপাল সম্প্রতি আনুপাতিক (আংশিক) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ ক্রমশ বেশি করে উন্মোচিত হচ্ছে। বিশেষত, যেভাবে এই নির্বাচন পদ্ধতির ফলে সংসদ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের করায়ত্ত হচ্ছে এবং তাদের অনেকে সাংসদ পদকে জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ব্যবহার করছে, তাতে জনগণের আশা পূরিত হচ্ছে না। যদি যুক্তি দিয়ে তাদেরকে দেখানো যায় যে, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা আরও গণকল্যাণমুখী সংসদ সৃষ্টি করতে পারবে, তবে তারা ব্যাপক হারে এই ব্যবস্থার পক্ষে আসবেন।

তৃতীয়ত, দেশের অনেক রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যেই আনুপাতিক ব্যবস্থার পক্ষে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছেন। তাদের মধ্যে ছোট দলের সংখ্যাই বেশি। তবে দশম নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় পার্টির নেতা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদও আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে স্বীয় অবস্থান ঘোষণা করেছিলেন। বড় দুটি দল, তথা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিরও অনেক চিন্তাশীল নেতা আনুপাতিক নির্বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন।

চতুর্থত, দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীও আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেছেন। নাজিম কামরান চৌধুরী, ব্যারিস্টার হারুন-অর-রশিদ সহ আরও অনেকে পত্র-পত্রিকায় এই পদ্ধতির পক্ষে মতও ব্যক্ত করেছেন।9

পঞ্চমত, বাংরাদেশের জনগণ এক অর্থে আনুপাতিক পদ্ধতির সাথে অভ্যস্তই বটে! নির্বাচনে অনেক সময় তারা এলাকার সুনির্দিষ্ট প্রার্থীর বদলে দলের (মার্কার) পক্ষেই ভোট দেয়। বঙ্গবন্ধু একবার বলেছিলেন, নৌকার পক্ষে যদি 'কলা গাছ' দাঁড়ায় তবে কলা গাছকেই ভোট দিতে হবে! কাজেই আনুপাতিক পদ্ধতির প্রবর্তন এই মনস্তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণই হবে।

সুতরাং, যেটা প্রয়োজন, তা হলো একটা জাতীয় ভিত্তিক আলোচনা। পত্র-পত্রিকা বিশেষত টেলিভিশনের আলোচনার মাধ্যমে আনুপাতিক পদ্ধতির ইতিবাচক দিকসমূহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যায়। যদি সাধারণ মানুষ এই পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে বড় রাজনৈতিক দলসমূহও তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে। সুতরাং, সঠিকভাবে, ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করে গেলে বাংলাদেশেও আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব।

9. *নাজিম কামরান চৌধুরী, প্রাসংগিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Choudhury (2016)। ব্যারিস্টার হারুন রশীদের অভিমনের জন্য দ্রষ্টব্য: Rashid (2007)।*

নির্দেশিত রচনাবলী

Choudhury, Nazim K (2006), "The Constitution is Neiter Bible Nor a Plaything," *The Daily Star,* December 5

Islam, Nazrul (2006), *Governance for Development: Political and Administrative Reforms in Bangladesh,* New York: Palgrave-Macmillan

ইসলাম, নজরুল (২০১১), "বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশলীতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব," *প্রতিচিন্তা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা ২১-২৮

Islam, Nazrul (2008a), Can Proportional Representation Help Stabilize Democracy in Bangladesh? *Journal of Bangladesh Studies,* Vol. 10, No. 2, pp. 52-58

Islam, Nazrul (2008b), Vital Reforms Ignored, *The Daily Star*, Dhaka, November 21

Islam, Nazrul (2008c), Looking Beyond 2008 Election, *The Daily Star*, Dhaka, December 1

Islam, Nazrul (2007), "Growing Our Way Out of Trouble," *Forum*, Vol. 2, Issue 6 (July), pp. 1-7

Islam, Nazrul (2001), "The Institutional Approach to Political Stability in Bangladesh," *Journal of Social Studies*, No. 93, July-September, pp. 80-100

Islam, Nazrul (1999), "Can We Stop *Hartal* By Reducing the Government Term?" *The Daily Star*, Dhaka, November 9

Islam, Nazrul (1998), "An Idea to Reduce *Hartal*," The Daily Star, Dhaka, April 9

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৭), "আগামী দিনের বাংলাদেশ : নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় স্বদেশ ভাবনা," সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬৪, পৃষ্ঠা ৩৯-৫০

Rashid, Harun ar (2007), "The Case for Proportional Representation," *The Daily Star*, Dhaka, November 6

পরিশিষ্ট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Algeria	PE	3,843	5,753	1.01	Party list
Angola	PE		1,975		Party list
Antigua and Barbuda	MS	5,143*	14,065	3.41	
Austria	PE	8,444	27,000	2.95	Party list
Argentina	PR	7,838	11,332	0.93	Party list
Bahamas	MS	16,911*	19,088	0.41	
Bangladesh	MS	1,348**	1,851	1.60	
Barbados	MS	7,039	16,086	2.09	
Belgium	PE	8,070	24,662	2.83	Party list
Belize	MS	3,439*	6,015	1.88	
Bhutan	MS	227*	828	4.41	
Bolivia	PE	2,431	2,929	0.47	Mixed
Botswana	MS	1,168*	7,257	6.28	
Bulgaria	PE		7,258		Party list
Burkina Faso	PE	768	933	0.49	Party list
Burundi	PE	677	699	0.08	Party list
Cambodia	PE	1086*	514	-2.46	Party list
Canada	MS	10,576	26,821	2.35	

Cape Verde	PE	1,417	4,983	3.19	Party list
Chile	PE	5,086	11,430	2.05	Party list
Colombia	PE	2,819	6,080	1.94	Party list
Costa Rica	PE	4,513	8,342	1.55	Party list
Cyprus	PE	5,413*	20,457	4.53	Party list
Czech Republic	PE	13,447***	13,617	0.13	Party list
Denmark	PE	11,438	27,827	2.25	Party list
Dominica	MS	4,356*	8,197	2.13	
Dominican Republic	PE	2,080	6,497	2.89	Party list
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Equatorial Guinea	PE	970	6,495	4.87	Party list
Estonia	PE	11,380***	11,081	-0.27	Party list
Ithiopia	MS	400	725	1.50	
Finland	PE	7,785	22,741	2.72	Party list
Gambia	MS	722	954	0.70	
Germany	PE	13,686*	25,061	2.04	Mixed
Ghana	MS	412	1,392	3.09	
Grenada	MS	2,937*	5,896	2.35	
Guinea-Bissau	PE	493	762	1.10	Party list
Guyana	PE		3,733		Party list
Hungary	PE	5,721*	11,383	2.32	Mixed

Iceland	PE	8,381	25,795	2.85	Party list
India	MS	892	2,644	2.75	
Indonesia	PE	1,071	3,772	3.20	Party list
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Ireland	PE	5,294	24,948	3.95	Preference voting
Israel	PE	6,745	22,237	3.03	Party list
Italy	PR	7,167	22,487	2.90	Mixed
Jamaica	MS	3,477	4,521	0.66	
Kenya	MS	1,179	1,268	0.18	
Latvia	PE		8,998		Party list
Lesotho	PE	576	1,834	2.94	Mixed
Liberia	PE	2,004*	472	-4.71	Party list
Liechtenstein	PE				Party list
Luxemburg	PE	12,920	48,217	3.35	Party list
Malawi	MS	461	839	1.51	
Malaysia	MS	1,801	11,406	4.72	
Malta	PE	2,997*	18,863	6.32	Preference voting
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Mexico	PE	3,719	8,082	1.96	Mixed

Micronesia	MS	2,297*	3,782	1.68	
Moldova	PE		2,218		Party list
Morocco	MS	1,299	3,720	2.67	
Nepal	MS	800	1,421	1.45	
New Zealand	PE	12,063	20,423	1.33	Mixed
Namibia	PE	5,256*	5,269	0.01	Party list
Netherlands	PE	10,463	26,293	2.33	Party list
Netherlands Antilles	PE	11,965*	14,014	0.53	Party list
New Caledonia	PE				Party list
Nicaragua	PE	4,428	3,438	-0.63	Party list
Nigeria	MS	1,106	1,074	-0.07	
Norway	PE	9,473	33,092	3.18	Party list
Pakistan	MS	801	2,477	2.86	
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Palau	MS	8,692**	9,357	0.37	
Papua New Guinea	MS	2,150*	4,355	2.38	
Paraguay	PE	2,510	4,965	1.72	Party list
Peru	PE	3,129	4,205	0.74	Party list
Poland	PE	3,973*	8,611	2.61	Party list
Portugal	PE	3,689	17,323	3.94	Party list

Romania	PE	1,276*	5,211	4.80	Party list
Saint Kitts and Nevis	MS	3,757*	14,393	4.58	
Saint Lucia	MS	2,877*	6,839	2.93	
Saint Vincent and Grenadines	MS	2,540*	7,672	3.75	
Samoa	MS	2,591*	3,071	0.57	
San Marino	PE				Party list
Sao Tome and Principe	PE	1,006	1,300	0.86	Party list
Singapore	MS	4,219	29,434	4.98	
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Slovakia	PE	9,874	9,697	-0.18	Party list
Slovenia	PE	15,202	18,206	1.82	Party list
Solomon Islands	MS	1,988*	2,013	0.04	
South Africa	PE	4,927	8,226	1.29	Party list
South Korea	MS	1,458	15,702	6.12	
Spain	PE	4,880	19,536	3.53	Party list
Sri Lanka	PE	866	4,047	3.93	Party list
Suriname	PE	3,704	4,753	0.84	Party list
Swaziland	MS	2,785*	8,517	3.80	
Sweden	PE	11,065	25,232	2.08	Party list
Switzerland	PE	15,253	28,831	1.60	Party list
Tanzania	MS	502	817	1.23	

Tonga	MS	1,054*	3,398	3.98	
Country	*Representation System*	*Initial per capita income*	*Per capita income in 2000*	*Average annual growth rate*	*Comment*
Trinidad and Tobago	MS	6,274	14,770	2.90	
Turkey	PE	2,250	5,715	2.36	Party list
Tuvalu	MS				
Uganda	MS	873	1,058	0.48	
United Kingdom	MS	10,323	24,666	2.20	
United States	MS	12,892	34,365	2.48	
Uruguay	PE	6,143	10,740	1.41	Party list
Venezuela	PE	6,092	7,323	0.46	Mixed
Wallis and Futuna	PE				Party list
Yemen	MS	974***	1,082	1.06	
Zambia	MS	910	866	-0.12	
Zimbabwe	MS	2,298	3,256	0.88	

Sources: Author, based on information egarding income from Penn World Tables, Version 6.2 complied by Alar. Heston, Robert Summers, and Bettina Atter at Center for International Comparison of Production, Income, and Prces at the University of Pennsylvania, September 2006 (http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt62/). Information regarding representation system is taken from ACE Electoral Knowledge Network. See http://aceproject.org/epic-en/CDTable?view=country&question=ES005

Notes:
1. PE and MA stand for 'Proportonal Election' and 'Majority System.'
2. Per capita income refers to the RGDPCH variable of Penn World Tables and refer to real GDP per capita measured as chain series in constant prices in terms of 1$ of 2000.
3. Initial income refers generally to that of 1960. However, for some countries it refers to income in 1970, 1980, and 1990, and these are marked by *, **, and ***, respectively.
4. The growth rate is average annual compound growth rate for the respective periods.
5. Comments are mainly with regard to the type of Proportional Representation practiced in particular countries.

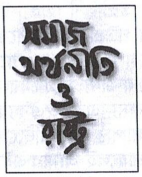

গণতন্ত্র: "সোনার হরিণ"?

এম. এম. আকাশ

"If the demands of justice can be assessed only with the help of public reasoning and if public reasoning is constitutively related to the idea of democracy, then there is an intimate connection between justice and democracy, with shared discursive features."
(Sen, 2009)

"বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়ে তোলা এবং বিকশিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করবে। বাক্-ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য পার্টি কাজ করে যাবে। পার্টি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়াস চালাবে।"
(একাদশ সংগ্রেসে গৃহীত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র, পৃষ্ঠা ২)

ভূমিকা

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের উপর অসংখ্য প্রবন্ধের সঙ্গে নিছক আরেকটি প্রবন্ধ যোগ করা নয়। এই প্রবন্ধে "গণতন্ত্র" প্রত্যয়ের আদি সারমর্ম উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে। সেই সারমর্মের বাস্তব প্রতিফলনে যেসব সীমাবদ্ধতা ঐতিহাসিকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে সে সম্পর্কে চুম্বক উপলব্ধিগুলিও আমি এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। অবশেষে শেষ যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হবে তা হচ্ছে বর্তমান একবিংশ শতাব্দিতে "আদর্শ গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি কি এবং তা অতিক্রমের জন্য বাস্তব প্রাতিষ্ঠানিক হাতিয়ারগুলি কি হতে পারে? কিছুটা উত্তর-আধুনিক যুগের স্টাইলে যেমন এখন সর্বত্র সব "আদর্শ", সব "Grand Narrative"-কেই সংশয়বিদ্ধ করা হচ্ছে– সেরকম "গণতন্ত্র" কি শেষাবধি একটি "সোনার হরিণে" পরিণত হয়েছে বা হবে? সে কি "চমকে বেড়ায়, থমকে দাঁড়ায়, দেয় না সে যে ধরা"– এরকম, এক সোনার হরিণ? না কি তা একটি বাস্তবায়নযোগ্য 'স্বপ্ন'। যদি তাই হয় তাহলে সেদিকে এগোনোর শর্তগুলি কি?

এসব তাত্ত্বিক আলোচনার বাস্তব পটভূমি এবং প্রয়োজনীয় বাস্তব তথ্য বা দৃষ্টান্তের জন্য আমি কম-বেশি চেষ্টা করবো যথাসম্ভব বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে যাতে এ দেশের গণতন্ত্র চর্চার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সংকটগুলি আমরা চিহ্নিত করে বাস্তব করণীয়গুলি নির্ধারণের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। পাঠকরা এই প্রবন্ধ পাঠ করে যদি সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেন তাহলেই আমার এই প্রয়াস স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আমি বলছি না যে পাঠকরা গণতন্ত্রের জন্য সে তাগিদ একদমই অনুভব করছেন না, কিন্তু সেই তাগিদের পথরেখা কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে সম্মিলিত যৌক্তিক মতৈক্য এখনো তৈরি হয়নি। সেরকম কোন মতৈক্যে উপনীত হওয়া যায় কি না, তার অন্বেষণই এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

গণতন্ত্র কি?

"গণতন্ত্র" বা "Democracy" শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে গ্রীসে। এটি একটি শব্দ বন্ধ যার মধ্যে দুটি উপশব্দ লুকানো আছে। প্রথম উপশব্দটি হচ্ছে "Demos", গ্রীক ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে People বা জনগণ। আরেকটি উপশব্দ হচ্ছে "Kratos", গ্রীক ভাষায় তার অর্থ হচ্ছে "Power" বা ক্ষমতা। সুতরাং আদিতে গ্রীসে গণতন্ত্র বা Democracy বলতে বুঝানো হতো "জনগণের ক্ষমতা"। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে "জনগণ" বলতে গ্রীসে "মহিলা, বিদেশি, শিশু ও দাসদের" বাইরে স্বাধীন স্থানীয় অধিবাসীদের বুঝানো হতো। গ্রীসের এথেন্সে "স্বাধীন নাগরিকদের" ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ নীতি ও/এবং সংগঠন গড়ে তোলা হয় যেমন– এ্যাসেম্বলি বা সাধারণ সভা, "নোমোথেটায়ি" বা আইন প্রণেতাবৃন্দ, জনগণের কোর্ট বা আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট-বৃন্দ, পাঁচশত কাউন্সিলরদের কাউন্সিল এবং ব্যক্তি নাগরিক স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে সে সব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্র কার্যকরী করতেন।

গ্রীক গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এথেন্সের গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে বছরে অন্তত ৪০ বার সাধারণ নাগরিকদের সভা অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে ৬০০০ নাগরিক উপস্থিত হলে তা "কোরাম" পূর্ণ করেছে বলে বিবেচিত হতো। সাধারণ সভায় প্রত্যেক নাগরিকের প্রস্তাব করার ও ভোট দেয়ার অধিকার ছিল। সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো উপস্থিত নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির ভিত্তিতে। (Jalal Firoj, 2012, P-3)[1]

গ্রীক "গণতন্ত্র" কি আসলেই "গণ"-এর তন্ত্র বা "জনগণের ক্ষমতা" ছিল? আসলে তা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষমতা ছিল না। সংখ্যালঘিষ্টের জন্যই এই

1. গণতন্ত্রের পরিসর বৃদ্ধির সংগ্রামী ইতিহাস আরো বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, Manus I Midlarshky (ed.) Inequality, Democracy and Development, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

গণতন্ত্র কার্যকর ছিল। তবে আইন দ্বারা নির্ধারিত সেই সংখ্যালঘিষ্টের প্রত্যেকের ক্ষমতা ও অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি "গণতন্ত্রে" অংশগ্রহণের পরিসর ও গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়টিই সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শোষকরা সাধারণত হন সংখ্যালঘিষ্ট এবং স্বাভাবিক কারণেই তারা চান গণতন্ত্রের পরিসর কার্যত তাদের তথা এলিটদের বৃত্তের মধ্যেই যাতে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এখন গ্রীক সমাজের মতো আইন করে সেটা করা সম্ভব নয়। তবে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বন্টন যদি সমাজের মধ্যে অসম থাকে তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণীত না হলেও "ধনী ক্ষমতাবানরাই" জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার একটি সুবন্দোবস্ত করে নেন বা নেয়ার চেষ্টা করেন।

প্রয়োজন হলে সেখানে তারা তাদের আর্থিক ক্ষমতা, পেশি শক্তির ক্ষমতা এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিধি-প্রবিধি প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে এলিটদের নিজস্ব ক্ষমতা সুনিশ্চিত করে রাখেন। কখনো কখনো "এলিটরা" (অ-জনগণ) নিজেদের দুইটি অংশের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়ে "জনগণের" ক্ষমতায়নকে ঠেকিয়ে রাখেন। কখনো লোকরঞ্জনবাদী জননায়ক জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমেও গদী দখলে সক্ষম হন ও এলিটদের আধিপত্য বজায় রাখেন। যদি এর পরেও জনগণ কখনো কখনো ক্ষমতাকে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বুদ্ধিমত্তার সংগে ব্যবহার করে কোনভাবে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হন তখন ক্ষমতাসীন এলিটরা তাদের গণতন্ত্রের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে "অগণতান্ত্রিক" পদ্ধতিতেই ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাসে গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতাগুলি সুপরিস্ফুট। ১৯৭১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে শাসক-শোষক-এলিটদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তবে ১৯৯০ সালে আমরা দেখেছি যে জনগণ (অন্ততঃ শহরের অধিকাংশ মানুষ) বাংলাদেশে নিরস্ত্র হরতাল ও গণঅভ্যুত্থানের অস্ত্র ব্যবহার করে সামরিক এলিট সরকারকে কোনঠাসা করে তারপর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যারা "গণতান্ত্রিক সংগ্রামে" নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা লংকায় সিংহাসনে বসে "রাবনে" পরিণত হলো। তাদের হটিয়ে যারা "রাম" হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় ক্ষমতায় বসলেন, তারাও অচিরেই "স্বমূর্তী" ধারণ করলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে এরকম একটি উপলব্ধি বর্তমানে তৈরি হয়েছে যে গণতান্ত্রিকভাবে 'যেই লংকায় যাক্ সেই আবার 'রাবন'-এ পরিণত হবে'। হয় "রাবন" নিজেই ক্ষমতায় ছলে-বলে কৌশলে জোড় করে নির্বাচিত হবেন অথবা ছদ্মবেশী দ্বিতীয় 'রাবন' এসে ক্ষমতা দখল করবেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মধ্যে এমনভাবে অর্থ-পেশী-রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতার আধিপত্য ইত্যাদি তৈরি হয়েছে যে তা ভেদ করে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম এরকম সৎ-যোগ্য-দক্ষ-গণমুখী জন প্রতিনিধিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। এ কথা অনেক দেশের জন্য আজ সত্য। সর্বাধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের হেনরী ফোর্ড বলেছিলেন যে তার

দেশে "রিপাব্লিকান" বা "ডেমোক্র্যাট" যেই জিতুক না কেন তার কিন্তু কোন পরাজয় হবে না। অর্থাৎ সেখানেও এলিট শাসকশ্রেণির দ্বিদলীয় ক্ষমতার বৃত্ত থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা কঠিন। তবে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টির ভেতরেই বার্নি স্যান্ডার্সের উদ্ভব হয়েছে। অতএব বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিছক বুর্জোয়া ক্ষমতার মিউজিক্যাল চেয়ার হলেও কখনো কখনো সেখানে তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো তা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে জনগণ একটি ন্যূনতম মাত্রায় ক্ষমতায়িত ও সংগঠিত না হলে গণতন্ত্রের যে আদি উদ্দেশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাস্তব প্রতিষ্ঠা তা আদৌ ফলপ্রসু বা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে অনেকেই বলতে পারেন "ফলাফল" নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক পথ বা তার রীতি নীতির একটি "আত্যন্তিক ও গঠন-মূল্য" (Intrinsic and Constitutive Value) এবং "উপায়গত মূল্য" (Instrumental Value) আছে। জনগণের ইচ্ছা জনগণের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সেই ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার বজায় না রাখলে জনগণের ইচ্ছা যে কি তাইই জানা ও প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই গণতান্ত্রিক আলাপ আলোচনার সুযোগ এবং প্রক্রিয়া ছাড়া গণতন্ত্রের দিকে বা গণ-ক্ষমতায়ণের দিকে প্রথম পদক্ষেপই অসম্ভব। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই ধরণের মতামতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি ১৯৯৯ সালের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

"Throughout the 19th century theorists of democracy found it quite natural to discuss whether one country or another was "fit for democracy". This thinking changed only in the 20th century with the recognition that the question itself was wrong: A country does not have to be deemed fit for democracy: rather, it has to become fit through democracy. Now the choice is ours. This is indeed a momentous change, extending the potential reach of democracy to cover billions of people, with their varying histories and cultures and disparate levels of affluence".

[Amartya Sen, 1999]

সেনের মতে একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র (জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ আলোচনার অধিকার ও সেই ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থে) এক পরম (Absolute) সার্বজনীন অপরিহার্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ মানব সমাজের বিভিন্ন অংশ যে যেখানে উন্নয়ন মাত্রার যে অবস্থানেই থাকুক না কেন তাকে বেছে নিতে হবে "গণতন্ত্র" অথবা "গণতন্ত্রহীণতা"। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত দ্বীপের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা অথবা মত প্রকাশ ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিয়ে থাকা। সেনের মতে সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হতে হবে বা হতে পারলেই তা যথার্থ উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে। এই প্রতিপাদ্যের মূলে রয়েছে সর্বজনীন মানব অধিকারের প্রত্যয়। যে অধিকারগুলি প্রতিটি মানুষের আজন্ম

অধিকার। আমরা যারা মানুষ বা নাগরিক তারা যে যত অযোগ্য বা দুর্বল ও বিচিত্র ইচ্ছারই অধিকারী হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনরক্ষা ও স্বাধীনভাবে জীবন প্রণালী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সেজন্য আত্মসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মতামত প্রদানের অধিকারও থাকতে হবে। তবে এই "Life, Liberty and Voice" এর অধিকার যদি সর্বজনীন হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অধিকার প্রয়োগের বাস্তব সুযোগ এমনভাবে করে দিতে হবে যাতে তারা একে অপরের অধিকার রক্ষা করে পরস্পরকে বিকশিত করতে পারে। কিন্তু এধরনের সমন্বিত ও সামগ্রীক অধিকার প্রয়োগের পূর্ব শর্ত হচ্ছে প্রত্যেকের নিজস্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করার পর সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রাধান্য দিয়ে যথাসম্ভব সমন্বিত ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন। আর প্রতিটি অধিকারই ভোগ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে অন্যের অনুরূপ বা সমরূপী অধিকারকে রক্ষা করে চলা। প্রত্যেকের অধিকার প্রয়োগ ও অধিকার রক্ষার দায়িত্বের এই সংশ্লেষণ ব্যতীত সামাজিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তারপরেও সমাজের এলিট সংখ্যালঘিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের অধিকার বাতিল করতে যদি হয়ই তাহলে সেটাও করার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি অবাধ উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং যেখানে সংখ্যালঘিষ্ট তার মত প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং পরে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিবে। গণতন্ত্রের উপরোক্ত ধরণ অবশ্য উচ্চ মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক ছাড়া বাস্তবায়ন কঠিন। তবে কখনো কারো গণতান্ত্রিক অধিকার অন্যায়ভাবে লংঘিত হলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অন্য সকলের এবং তা সম্ভব না হলে আইন প্রয়োগেকারী কর্তৃপক্ষের, যেখানে গিয়ে তিনি সবসময়ই ন্যায়বিচার চাইতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রে আইন আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থাকতেই হবে। গণতান্ত্রিক আইনের বাস্তব গ্যারান্টি ছাড়া তাই গণতন্ত্র অসম্ভব।

তাই চরম (Absolute) সর্বজনীন গণতন্ত্র (জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের) একমাত্র শ্রেণিবিরোধহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুশীলনে অভ্যস্ত উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী নাগরিকদের রাজত্বেই সম্ভব! মার্কস বর্ণিত সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন এধরনের একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বশাসিত সমাজ। পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের এই সারমর্মের সংগে মার্কসবাদের স্বপ্নের সমাজের কোন বৈপরীত্য নেই। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার থেকে সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে দুটি প্রাসঙ্গিক উধৃতি এখানে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না–

ইশতেহারে প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, যে কোন শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যে "রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনের" ব্যবস্থা প্রথমে চালু হয় তা আসলে গঠিত হয় অধিপতি শ্রেণির ক্ষমতা রক্ষার জন্য। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায়, "সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো এক শ্রেণির উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণির সংগঠিত শক্তি মাত্র"। আর এর বিপরীতে সাম্যবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কস সাম্যবাদকে অভিহিত করেছেন "রাষ্ট্রহীণ-শ্রেণিহীন সমাজ" হিসাবে (বলা বাহুল্য যে, সাম্যবাদের পূর্ববর্তী উত্তরণকালীন সমাজতান্ত্রিক সমাজকে মার্কস শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেননি। তবে তিনি আশা করেছিলেন যে তা সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু বাস্তবে যেটা ইতিহাসে হয়নি। কেন হয়নি তা

নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কেউ কেউ মনে করেন বিপ্লবের মাধ্যমে উদ্ভবের পর গণতান্ত্রিক চর্চার যথাযথ বিকাশ না ঘটাটাই তার অন্যতম কারণ। (তাজুল ইসলাম, ২০১৭)। ইশতেহারে সাম্যবাদী শ্রেণিহীন সমাজে কী ধরণের ও কী মাত্রার গণক্ষমতা বা গণতন্ত্র থাকবে সেই প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন–

"বিকাশের গতি পথে যখন শ্রেণি পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটাজাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারি (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র থাকবে না।... শ্রেণি ও শ্রেণি বিরোধ সংবলিত পুরোনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নিবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।" (মার্কস-এঙ্গেলস, ১৮৮৮)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বামপন্থীরা যাবতীয় শ্রেণি বিভক্ত সমাজের "রাজনৈতিক গণতন্ত্র" (Political Democracy) কে যখন সীমাবদ্ধ শাসক গোষ্ঠির গণতন্ত্র হিসাবে সমালোচনা করেন তখন তারা মার্কসের বিদ্যমান বাস্তবতার সমালোচনার দিককে অধিক গুরুত্ব দেন। সেটি হচ্ছে "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র" না থাকলে "রাজনৈতিক গণতন্ত্র" কখনোই পূর্ণ গণ-ক্ষমতায় বা সকলের ক্ষমতায় পর্যবসিত হতে পারে না। নিছক রাজনৈতিক গণতন্ত্র তখন কার্যত আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের (Formal Democracy) আড়ালে শাসক শ্রেণির আধিপত্যে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শাসকরা হয় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান সংখ্যালঘিষ্ট শোষকদের দল। এই বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য কিন্তু এখানেই কথা শেষ হয়ে যায় না। কারণ দীর্ঘমেয়াদে "সকলের অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অর্জন, রক্ষা ও বিকাশের" লক্ষ্য মার্কসবাদী বিপ্লবী বাম ও বাম নয় কিন্তু গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী, উভয়ই বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই দিকে যাত্রা শুরু করতে হয় সর্বদাই কোন না কোন শাসকদের অসর্বজনীন আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন মাত্রার ভেতরে থেকেই এবং বিদ্যমান সীমিত গণতান্ত্রিক সুযোগগুলি ব্যবহার করেই। যুগপৎ অসর্বজনীন রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিসরকে জনগণের মধ্যে বিস্তৃত করা এবং অসর্বজনীন অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পরিসরকে জনগণের মধ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধির সংগ্রাম ছাড়া পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটানো বাস্তবে কোথাও সম্ভব হয়নি হবেও না। গণতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি যুগপৎ গড়ে তোলার জন্য সহজ কোন রাস্তা বা নিশ্চিত খাঁটি কোন গণতন্ত্রের ফর্মুলা বামপন্থীদের সামনে খোলা নেই। সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে ও জনগণকে চেষ্টা করতে হবে যেন অর্থনৈতিক সমতা ও রাজনৈতিক সমতা হাত ধরাধরি করেই অগ্রসর হয়; যদিও সেরকম আদর্শ অবস্থা বাস্তবে সর্বদা নাও থাকতে পারে। এলিটদের ক্ষমতা হ্রাস ও জনগণের সবরকম ক্ষমতা বৃদ্ধিই উত্তরণ পর্বের প্রধান কর্তব্য। উত্তরণকালীন পর্বে এমনকি কমিউনিস্ট জনপ্রতিনিধিদেরও কর্তব্য হবে নিজের ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমাগত শুকিয়ে বিলুপ্ত করা।

প্রয়োগবাদীরা বলেন, যে মাত্রায় সমাজে শ্রেণি বিরোধ কমে আসবে, সে মাত্রায় গণতন্ত্রের পরিসর বাড়ানো যেতে পারে। প্রলেতারিয়েত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতদের

প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, চর্চা করা, তারপর গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বৃদ্ধি করে অন্য বিদ্যমান শ্রেণিগুলিকে রাষ্ট্রের ক্রমপ্রসারমান গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যে ক্রমশঃ অর্ন্তভুক্ত করা, তাদেরকেও গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ করে দেওয়া যদি তারা অগণতান্ত্রিক শোষণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে না চায়, এবং চূড়ান্ত পর্বে এসে সর্বজনীন গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রেণিহীন, বিরোধহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা। লেনিনের ভাষায়, তখন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই কোন প্রয়োজন থাকবে না। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের এক্সপেরিমেন্টগুলি প্রথমে উল্লিখিত পথে আগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরে বিভিন্ন পর্যায়ে "গণতন্ত্রের" পরিসর ক্রমাগত বাড়াতে না পেরে এবং শ্রেণি পার্থক্য "স্যেকুলার" (Secular) কায়দায় না কমাতে পেরে ক্রমশঃ পথ বিচ্যুতিও হয়েছিল। কোথাও কোথাও শ্রেণি বিরোধ না কমে তা নতুন রূপে "আমলা ও পার্টি নেতৃত্ব" বনাম "জনগণ" এ ধরণের দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণির বা শোষিতের "গণতন্ত্র" বা প্রস্তাবিত "সর্বহারার একনায়কত্ব" শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পার্টির "নেতা-সভ্যদের সংখ্যালঘিষ্ট একনায়কত্বে" পরিণত হয়েছিল। তারও পরে "পার্টির নেতা-সভ্যদের এই "একনায়কত্ব" "পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একনায়কত্বে" এবং আরো পরে "কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একনায়কত্ব" শেষাবধি কোন কোন সময়ে "এক ব্যক্তির একনায়কত্বে" পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন বিপ্লবের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সাধারণ মানুষদের মৌন গণতান্ত্রিক সমর্থন পেলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীনরা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পরেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ আলাপ আলোচনা ছাড়াই উপর থেকে হুকুম দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার কারণে অবশেষে শাসিত জনগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগহীন এক নিষ্ক্রিয় সত্ত্বায় পরিণত হন। যদিও এই নতুন কেন্দ্রীভূত শাসনের সুদীর্ঘ যাত্রা পথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অর্জনের বা সাফল্যের নিদর্শন সমাজতন্ত্রের রয়েছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনগণের রাজনৈতিক স্বক্ষমতার বা এন্টাপ্রেনার সুলভ বা উদ্যোক্তাসুলভ গুণের বিকাশ ঘটানো আর সম্ভব হয়নি। এটাই ছিল বিদ্যমান অতীত সমাজতন্ত্রের প্রধান একটি ট্রাজেডি। একতরফা রাষ্ট্র নির্ভরতা থেকে ব্যক্তির উদ্যোগী স্বনির্ভরতা, প্রশাসনিক পদ্ধতি থেকে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, শ্রেণিভেদ থেকে শ্রেণিভেদের বিলুপ্তির যাত্রাপথে সঠিক মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতার দিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বদা ভারসাম্য বজায় থাকেনি।

এ কথা ঠিক, যখন শ্রেণি বিরোধ তুঙ্গে অবস্থান করে যখন যুদ্ধ চলছে অর্থাৎ যখন ইতিহাসের এমন এক পর্ব উপস্থিত হয়েছে যে সামান্য বল প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন সমাজের জন্মদান করাটাই কর্তব্য তখন খুবই অল্প সময়ের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে গণতান্ত্রিকভাবে সম্মতি নিয়েই স্থগিত রেখে উপর থেকে পরিচালিত যুদ্ধকে/বিপ্লবকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একতরফা হুকুমের অধীনে রাখতে হতে পারে, কিন্তু তা জরুরি বা আপদকালীন কৌশল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে উপর থেকে বল প্রয়োগ তো নয়ই, এমনকি পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের জোরে উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার এই

"হুকুম পদ্ধতি" বৃহত্তর স্বার্থে স্বল্প সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও কখনোই তা সর্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি হতে পারে না। বাধ্য হয়ে বা Pragmatic ভাবে নেয়া এই পদ্ধতি কোনক্রমেই একটি কাম্য নৈতিক পদ্ধতি হতে পারে না। প্রথমতঃ সে ধরনের "সংকুচিত গণতন্ত্রকে" সাময়িক জরুরি অবস্থা হিসাবেই দেখতে হবে এবং সেই দেখাটাও সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতদের দ্বারা আগে বা পরে কোন না কোনভাবে গণতান্ত্রিকভাবে অনুমোদিত হতে হবে। সেখান থেকে যথাশীঘ্র সরেও আসতে হবে। রাষ্ট্র বা শাসকরা যাতে মিথ্যা দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র যখন তখন স্থগিত রাখতে না পারে সেজন্য পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সংবিধানগুলিতে সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরক্ষামূলক (Countervailng) নীতিমালার সন্নিবেশন লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যমান এক দলীয় শাসনাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এরকম আইনি বা সাংবিধানিক Check and Balance এর বিপুল ঘাটতি ছিল বা এখনো আছে। সবকিছু একক শ্রমিক শ্রেণির একক অভিভাবকদের কর্তৃত্বাধীন, সবকিছু একক পার্টির অধীন, সবকিছু একক আদর্শ মার্কসবাদের অধীন, এ ধরনের একশীলা "সামগ্রীকতা" (Totalitarianism) মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিশীল স্ফূরনের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। বিকাশের জন্যই দ্বন্দ্বের প্রয়েজন এবং সমাজতন্ত্রকে অনেক অবৈরী দ্বন্দ্ব মেনে নিতে হবে। জনগণের মধ্যে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক প্রবণতা, ভুল-শুদ্ধ উভয় প্রবণতা, ভুল করে আবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধনের প্রবণতাসহ আরো যে সমস্ত বহুমুখী জটিল প্রবণতা বিদ্যমান তা নিজের সমাজে এবং বাইরের বিশ্বে যতটুকু সম্ভব বিশ্বব্যাপী আদান প্রদান ও প্রকাশের গণতান্ত্রিক সুযোগ বা স্বাধীনতা সমাজতান্ত্রিক সমাজেও থাকা দরকার। সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের অবৈরী ব্যক্তি ও দলের স্বাধীনতা আরো প্রসারিত হওয়াটা দরকারী ছিল কারণ মানব সমাজের জন্য যেটি সত্য তা বিভিন্ন মানুষের অবাধ গণতান্ত্রিক মতবিনিময় ছাড়া জানা অসম্ভব। আবার সত্য মিথ্যা হয়ে গেলে সেটা বুঝার জন্যও গণতন্ত্র দরকার। এটা বুঝে রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই লিখেছিলেন,

"দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কনিকা")

সবকিছু 'অপরিকল্পিত', সবকিছু "প্রাইভেট", সবকিছু "পার্টি বহির্ভূত ব্যক্তিদের" হাতে বিশৃঙ্খলভাবে সমর্পন করাটাও কিন্তু সর্বদা শুভ বলে বিবেচিত হয় না। গণতন্ত্র অর্থ এক লাফে রাষ্ট্রহীন আইনহীন নিয়ন্ত্রণহীন নৈরাজ্য নয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা এই দুই বিপরীতের গতিশীল ভারসাম্য বিন্দুটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে এই দুই পরস্পর বিরোধী নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ন্ত্রিত শক্তির মধ্যে অবৈরিতামূলক মত বিনিময়ের জন্য দ্বান্দ্বিক সংলাপ বজায় রাখা। বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্রের শক্তির দিকটি হচ্ছে যদিও আদতে তা সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থকেই শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে থাকে, কিন্তু তা ঢেকে রাখার জন্য বাকিদেরকেও তা সর্বদা বিরোধী একটি কণ্ঠস্বর হিসাবে বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করার সুযোগ দেয়। দৃশ্যমান বিরোধী দল হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি আনুষ্ঠানিক

বৈশিষ্ট। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকেও তাই পার্টি বহির্ভূত জনগণকে ইতিহাসের Subject হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। একবিংশ শতকের সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব যদি প্রকৃতই উত্তরণ কালপর্বে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অবশিষ্ট অবৈরী বা এমনকি কম আক্রমনাত্মক বৈরী শ্রেণি বা দলগুলির সংগে গণতান্ত্রিক সংলাপের সংস্কৃতি চালু রাখতে চান তাহলে তাদেরকে ভলতেয়ারের মত ঘোষণা করতে হবে, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". তবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সুসভ্যতারও একটি আইনি সীমা আছে ও থাকবে। যখন অপরের "সমালোচনার অস্ত্রটি" অস্ত্র দিয়ে সমালোচনায় পরিণত হয় বা বস্তুগত আঘাতে পরিণত হয় তখন আঘাতকারীরও আর গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে না।

সাধারণভাবে আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে সর্বদাই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজের পক্ষে আছে কি না, তা নিজেকেই যাচাই করে নিতে হয় এবং তা একমাত্র কোন না কোন ধরণের স্বচ্ছ পরমতসহিষ্ণু সমালোচনামূলক গণসংলাপের মাধ্যমেই সম্ভব। আফ্রিকার ট্রাইবগুলির মধ্যে আজও এ ধরনের পরস্পরের সঙ্গে সংলাপ নির্ভর, মুক্ত আলোচনা নির্ভর বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। অমর্ত্য সেন আফ্রিকান ঐ অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন এবং নেলসন মেন্ডেলাকে তাঁর "দ্য আইডিয়া অফ জাস্টিস" গ্রন্থে উধৃত করে পাস্পরিক সংলাপ নির্ভর গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। মেন্ডেলা এধরনের গণতান্ত্রিক সভা-সমিতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,

"Everyone who wanted to speak did so. It was democracy in its purest form. There may have been hierarchy of importance among speakers, but everyone was heard, chief and subject, warriors and medicine man, shopkeepers and farmers, landowners and labourers...the foundation of self government was that all men were free to voice their opinions and equal in their values as citizens".

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থনীতিতে শ্রেণিহীন সমাজ ছাড়া যদি "সমগ্র জনগণের সার্বিক ক্ষমতায়ন" অসম্ভব হয়– তাহলে শ্রেণি বিভক্ত সমাজকে বিলোপের আগে পর্যন্ত কি সর্বদাই সর্বজনীন গণতন্ত্র "সোনার হরিণ" জাতীয় স্বপ্ন হয়েই থাকবে? না কি গণতান্ত্রিক সংলাপের সুযোগ এবং শ্রেণিহীন সমাজ কায়েমের লক্ষ্য উভয়কেই যতদূর সম্ভব এক সংগে হাত ধরাধরি করে সামনে অগ্রসর হতে হবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্র কি আসলেই দীর্ঘ মেয়াদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পর পরিপূরক নাকি শুরুতে তারা পরস্পর বিরোধী পরে তারা পরস্পর পরিপূরক? নাকি কখনো পরিপূরক কখোনো দ্বান্দ্বিক? বাম-ডান সকলের সামনে এইসব নানা প্রশ্ন আজ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এইসব প্রশ্নের কোন একটি মাত্র দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চিত উত্তর সম্ভবত নেই। জনগণের

অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি না করে জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয় এ কথা সহজেই স্বীকার্য। কিন্তু তা সবসময় গণতান্ত্রিক পথে নিরস্ত্র সংলাপের মাধ্যমে অর্জিত নাও হতে পারে। তবে বামের একটি অংশ আরেকটু আগ বাড়িয়ে মনে করেন সশস্ত্র পথ অনিবার্য ও কাম্য। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত আলোকিত ও মানবিক বাম অংশটি অতটা জিঘাংসাপরায়ন নয়, তাঁরা মনে করেন বাধ্য না হলে শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনই শ্রেয় যেহেতু তা কম ক্ষয়-ক্ষতি বহন করে। এছাড়া বিপ্লবীদের সংগ্রাম মূলতঃ পাপ ও পাপী তৈরির সামাজিক ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে এবং পাপীদের ব্যক্তিগত দেহের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ততটুকু যতটুকু তারা জান দিয়ে শোষণমূলক অন্যায় ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করতে চাইবেন।[২]

জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকতা ছাড়া কর্তৃত্বমূলক পরিবেশে অসম্ভব নয়, বাস্তবে তা প্রমানিত হয়েছে, যদিও তা আদর্শ নয়। প্রথমে অগণতান্ত্রিক পরিবেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তারপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক গণতন্ত্র দিতে বাধ্য হয়েছে বা দিচ্ছে এরকম উদাহরণ আমরা পূর্ব এশিয়ার "কঠোর রাষ্ট্রগুলির" কারো কারো ক্ষেত্রে এবং প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, গণতন্ত্র বিশেষ করে সমালোচনামূলক সংলাপের স্বাধীনতা বজায় রেখেও কি সেটুকু উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব ছিল না?

---

২. *এমন কি তথাকথিত কট্টর বামদের নেতা কমরেড মাও সে তুং সোভিয়েৎ পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের ছয় মাস পরে সিপিসি-ও কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোতে প্রদত্ত এক বিখ্যাত বক্তৃতায় স্ট্যালিনের ভুলগুলি স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন, "Particularly worthy of attention is the fact that in the Soviet Union certain defects and errors that occurred in the course of their building socialism (ইরফান হাবিবের মতে এখানে মাও প্রধানতঃ স্ট্যালিন আমলের ত্রুটিগুলির কথাই বলছেন।) have lately come to light, Do you want to follow the detours they have made. It was by drawing lessons from their experience that we were able to avoid certain detours in the past. And there is all the more reason for us to do so now. What are the positive factors, internal and external? Internally workers and the peasants are the basic force. The middle forces are forces that can be won over. The reactionary forces are a negative factor but even so we should do our work well and turn this negative factor as far as possible into a positive one. Internationally, all the forces that can be united with must be united with, the forces that are not neutral can be made neutral through our efforts, and even the reactionary forces can be split and made use of. In short we should mobilize all forces, whether direct or indirect, and strive to make China a powerful socialist country"" [Irfan Habib, 2009-P- 128]*

যারা কর্তৃত্বমূলক কায়দায় আর্থসামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা টেকসই হয়নি এবং এদের গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান এবং অসম্পূর্ণ বা মিশ্র পর্যায়ে রয়েছে। সোভিয়েত মডেলেরও ইতিহাস দেখাচ্ছে জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আগে বৃদ্ধি পেয়েছে রাজনৈতিক সংকুচিত গণতন্ত্রের অধীনেই এবং অবশেষে বহু বছর পর সেখানে স্থবিরতা দেখা দেয় এবং তাকে দূর করতে গিয়ে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিস্তৃতভাবে দেওয়ার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আবার ভেঙে যেতেও আমরা দেখেছি। ফলে সেখানে আরো খারাপ ধরনের মাফিয়া ধনতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদ চেপে বসেছে। অন্যদিকে চীনে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়াই প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য বৃদ্ধি একই সঙ্গে এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই মুহূর্তে চীনের এক পার্টির শাসনের ভেতরে ও বাইরে বর্তমানে একাধিক শ্রেণিকে ও স্তরকে তাদের মতামত প্রদানের ও পার্টি সদস্যের বাইরে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচনের অধিকারসহ কিছু কিছু সীমিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যদিও সেখানে মূল পার্টির কর্তৃত্ব নিশ্চিত রাখার শর্তটি কঠোরভাবে মেনেই এসব সংস্কার করা হচ্ছে। কেউ একে 'অগণতন্ত্র', কেউ কেউ একে "কর্তৃত্ববাদ" নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ আগে কর্তৃত্ব মেনে নাও– তারপর সেই পরিসীমার মধ্যে সীমিত গণতন্ত্র ভোগ কর। অন্যদিকে পশ্চিমা উদারনৈতিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক সুযোগগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত আছে, কিন্তু সেসব সুযোগ ব্যবহারের সক্ষমতা সীমিত এবং জনগণ কর্তৃক শাসক শ্রেণির কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবার উপক্রম হলে তখন তা সাধারণত সহ্য করা হয় না। সুতরাং সবমিলিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও জনগণের গণতন্ত্রের এই উত্তরণকালীন বহুমাত্রিক মিশ্রণ নিয়েই একবিংশ, শতকের ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি চলছে।

তবে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু-ধরনের ব্যবস্থাতেই আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি/প্রবৃদ্ধি ও ধীরে ধীরে জনগণের ন্যূনতম সক্ষমতার বিকাশ সাধনের তথা চরম দারিদ্র্য হ্রাসের নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সরকারের "দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের" পটভূমিতেই সেখানে উৎপাদন শক্তির বিকাশ এবং চরম (Absolute) দারিদ্র্য দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, যদিও বিপুল ধন বৈষম্যের কারণে নিম্নবর্গের জনগণের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা সেখানে কম বলে গণতন্ত্রের সুযোগগুলি উপভোগ করে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনে তারা সক্ষম হচ্ছেন না, গণতান্ত্রিক সুযোগগুলিও ঠিকমত কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও সেখানে রয়েছে প্রবল সামাজিক বৈষম্য (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে), বর্ণ বৈষম্য ও দেশি-বিদেশি বৈষম্যও সম্প্রতি সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাছাড়া দরিদ্র জনগণের চিন্তা ও মূল্যবোধের জগতেও অতি ধনী বুর্জোয়া শাসকদের আধিপত্য (Hegemony) অক্ষুন্ন রয়েছে। তবে সম্প্রতি মধ্যবিত্তরাই সেখানে ৯৯ শতাংশের উপর ১ শতাংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপাত্যের অভিযোগ সামনে তুলে ধরেছেন। বিদ্যমান গণতন্ত্র আসলে কতটুকু গণতান্ত্রিক সে প্রশ্ন এখন সেখানেই উঠতে শুরু করেছে। একথা ঠিক যে কোনমতেই ঐ "উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে" সামাজিক বৈষম্যের ও শোষণের সমস্যার সমাধান ছাড়া "জনগণের ক্ষমতা" বা "প্রকৃত গণতন্ত্র" বলা যাবে না।

অন্যদিকে কখনো-কখনো তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আমরা স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নহীনতা ও চরম গণতন্ত্রহীনতার পরস্পর পরিপূরক চরম হতাশাজনক এক অবস্থারও সাক্ষাৎ পাই। আফ্রিকান এক নায়কদের অধীনে অনুন্নত দারিদ্র্য কবলিত দেশগুলি হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিকে রয়েছে স্বেচ্ছাচারী শাসক, আরেকদিকে রয়েছে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকারহীন অসহায় জনগণ। যদিও উন্নয়ন মাত্রায় ভিন্নতা বিদ্যমান কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীরা অনেকেই উত্তর কোরিয়ার "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রকেও একই পংক্তিভুক্ত করে থাকেন।

তবে তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে আবার গান্ধী-নেহেরু-ম্যান্ডেলা-মুজিব প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়করা স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্তত কিছুদিন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এক সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার। এক্ষেত্রে তাঁরা কখনো ব্যর্থ হয়েছেন, কখনো সফল হয়েছেন। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকুশলতার Economic (Performance) রেকর্ডও কখনো ভালো কখনো মন্দ প্রমাণিত হয়েছে। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাই হোক না কেন প্রায়ই তা অগণতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে হেলে পড়েছে, আবার কখনো একক রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের দিকেও হেলে পরেছে (তবে মেন্ডেলা ব্যতিক্রম), কখনো কখনো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র উভয়েরই অবনতি হয়েছে। কখনো কোন একটি সূচকের একপেশে সাময়িক উন্নতিও লক্ষ্য করা গেছে।

এইসব পরস্পর বিরোধী ইতিহাসের আলোকে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের একটি লেখার সাহায্য নিয়ে প্রণীত নীচের তালিকায় বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশে "গণতন্ত্র" ও "উন্নয়নের" সম্পর্কটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো।

তালিকা-১
গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশে-দেশে[৩]

	গণতান্ত্রিক শাসন	কর্তৃত্বমূলক শাসন
উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।	যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/ পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ। স্কেনডিনে-ভিয়ান রাষ্ট্রসমূহ।	চীন/মালয়েশিয়া/দক্ষিণ কোরিয়া/সিংগাপুর/রাশিয়া/ ভিয়েতনাম/কিউবা
উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।	মালয়েশিয়া/দক্ষিণ কোরিয়া/সিংগাপুর/ রাশিয়া	ক্যামবোডিয়া, রাজতন্ত্রের অধীনস্ত নেপাল, রাজতন্ত্রের অধীনস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি, অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসনাধীন পাকিস্তান, এরশাদ ও জিয়ার আমলের বাংলাদেশ, মার্কোসের অধীনস্ত ফিলিপীন।

	গণতান্ত্রিক শাসন	কর্তৃত্বমূলক শাসন
উন্নয়ন অন্তত দশ বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল।	যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/ পশ্চিমা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ।	চীন/মালয়েশিয়া/দক্ষিণ কোরিয়া/সিংগাপুর/রাশিয়া/ ভিয়েতনাম/কিউবা/ শেখ হাসিনার শাসনাধীন বাংলাদেশ
উন্নয়ন পাঁচ বছরের চেয়ে বেশি সময় অব্যাহত থাকে নি।	শেখ মুজিবের শাসনাধীন বাংলাদেশ, ভারত, খালেদা জিয়ার শাসনাধীন বাংলাদেশ।	জেনারেল এরশাদের শাসনাধীন বাংলাদেশ।

এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে অবশেষে পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচনা ও বজায় রাখা উভয়ই সম্ভব। আবার রজনৈতিক গণতন্ত্র রেখেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচনা ও বজায় রাখা সম্ভর। এধরনের দ্ব্যর্থতামূলক সম্পর্ক থেকে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় না। এজন্য প্রতিটি দৃষ্টান্তের প্বার্শশর্তাবলী সম্পর্কে গভীরতর অধ্যয়ন প্রয়োজন হবে, যার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই।

সামগ্রীক ঐতিহাসিক বিচারে উন্নয়নবিদরা কেউ কেউ মনে করেন নিম্নবর্গের মানুষের voice and individual initiative সক্রিয় থাকলে অর্থাৎ রাজনৈতিক গণতন্ত্র নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত থাকলে হয়তো সর্বত্রই উন্নয়ন ফলাফল আরো ভালো এবং টেকসই হওয়া সম্ভব ছিল। একথা বিশেষভাবে সত্য, প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্য উন্নয়ন পর্বের ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে এও প্রমাণ করেছেন যে উন্মুক্ত আলাপ-আলোচনার সুযোগ ও ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম থাকলে অনেক সময় চরম "অর্থনৈতিক সংকটেও" রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবিচলিত নিষ্ঠুরতা বজায় রাখতে পারেন। এমতাবস্থায় তারা জানতেই পারেন না বা বিশ্বাসই করেন না যে দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে! সুতরাং রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক চরম অবনতি রোধের জন্য প্রয়োজনীয়ও হতে পারে। তিনি এটাও বলেছেন যে রাজনৈতিক

৩. গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নানারকম ইকনমিট্রিক গবেষণা আছে। রবার্ট বারো ও এডাম প্রেজয়রস্কীর গবেষণা প্রমাণ করেছে যে গণতন্ত্রের সংগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার চর্চার সংগে অর্থনৈতিক কর্মকুশলতার কোন আত্যন্তিক (Intrinsic) দ্বন্দ্ব নেই। এক্ষেত্রে অল্প কিছু দৃষ্টান্ত দাবী করতে পারে দুর্বল নেতিবাচক সম্পর্ক, কিন্তু বেশির ভাগই শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্কের পক্ষেই রায় দেয়। সেনের মতে দুইয়ের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি (Directional Linkage) প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে অন্যান্য অনেক প্বার্শশর্তাবলীর উপর। (সেন, ১৯৯৯)

গণতন্ত্র না থাকলে, মানুষের নিজের ভালো মন্দ নিজে নির্ধারণের স্বাধীনতা না থাকলে সেই আরোপিত উন্নয়নকে আদৌ উন্নয়ন বলা সম্ভব নয়, কারণ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তির নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীন মূল্যায়নের সক্ষমতা। খাঁচার পাখি ভালো দানাপানি পেলেও তাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। তবে এরপরেও এ কথা ঠিক যে সাধারণভাবে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূলত সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণই যথেষ্ট। যদিও সংশ্লিষ্ট জনগণের অনুমোদন ছাড়া এই সঠিক নীতির সঠিক প্রক্রিয়াটি চালানো কঠিন এবং তা শেষাবধি টেকসই হয়না বা তা সঠিক হলো কিনা সেটাও সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত ছাড়া চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায় না; তারপরেও একথা সত্য যে অনেক কর্তৃত্ববাদী দেশেই অবাধ গণতন্ত্র ছাড়াই সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালা বেশ কিছুদিনের জন্য অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে সেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল এবং বৈষম্যও কমেছিল। কিন্তু স্বাধীনভাবে তা মূল্যায়নের সুযোগ সেখানে জনগণ কখনোই পায়নি। একসময় জনগণকে সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে হয়েছে।

নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই আমরা পর্যাপ্ত নাও মনে করতে পারি। এই প্রশ্নে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হলে জনগণকেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে তারা কাকে অগ্রাধিকার দিবেন গণতন্ত্র না কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সমাজতান্ত্রিক ক্ষমতা, বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রহণের প্রাথমিক পর্বে গণতান্ত্রিকভাবেই গণতন্ত্র কার জন্য কতটুকু থাকা উচিত তা নির্ধারণ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা জানি যে মাসলোর Hierarchy of Needs তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক সক্ষমতা যত অর্জিত হবে নাগরিকরা ততই আরো বেশি বেশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। জনগণের অগ্রাধিকারও নিশ্চয় বদলে যাবে। তদুপরি রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান প্রদান ও নীতি প্রণেতাদের জবাবদিহিতা ও সুশাসনেও আস্তে আস্তে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। Benevolent Dictator উপর থেকে স্বল্প সময়ের জন্য এবং কম উন্নত দরিদ্র অর্থনীতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরোপিত উন্নয়ন চালাতে পারলেও কোন না কোন সময়ে উন্নত ও জটিল সমাজে প্রশাসকের পক্ষে বা গণবিচ্ছিন্ন অগণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্ভব হবে না। ভালো ও দক্ষ নেতৃত্ব চিরকাল বেঁচেও থাকেন না এবং ভালো ও দক্ষ নেতা সবসময় ভালো ও দক্ষও থাকে না। সুতরাং জনগণ Benevolent Dictator এর পক্ষে কিছু সময়ের জন্য গণতান্ত্রিক রায় দিলেও এটা উন্নয়ন লিটারেচারে স্বীকৃত হয়েছে যে এরকম কোন ব্যক্তি বা নেতা নয় বরং সুশাসনের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাবলীর প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভালো অর্থনৈতিক পলিসিও শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী হয় না অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও জনগণের বিভিন্ন অংশের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে উন্নয়ন অবশেষে স্থবির হয়ে যেতে বাধ্য। অংশগ্রহণমূলক সুশাসনের জন্য ন্যূনতম মাত্রার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাটাও খুবই জরুরি। এ জন্য প্রয়োজন হবে ক্রমাগত বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও তৃণমূলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল গ্রুপের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং তাদের কাছে ক্রমাগত কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা। এই জন্যই গণতন্ত্র যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির ফল, তেমনি উপায়ও বটে, গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও বটে।

সুতরাং আমরা এখানে প্রচলিত কায়দায় শুধু পাঁচ বছর পর পর কেন্দ্রীয় ভোটের মধ্যে গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলছি না। আমরা বলছি অংশগ্রহণমূলক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা। যেখানে জনগণই উন্নয়নের স্রষ্টা, উন্নয়নের ফলভোগকারী এবং উন্নয়নের বিচারক।

আমরা নিকট ইতিহাসে এও দেখেছি যে রাজনৈতিক ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে অথবা মিলিটারি শাসকের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বিজয় অর্জন করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্গল খোলা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে কোন কোন কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী দেশে গণতন্ত্রকে তৃণমূলে প্রসারিত করেই জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আয়ের পুনর্বণ্টনমূলক কর আরোপ করে নিজেদের জন্য ব্যাপক সামাজিক অধিকার বা সুযোগসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশের গণতান্ত্রিক শাসকরা, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়াই গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমেই সেটা করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও সূচনালগ্নে সেই সোশাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনৈতিক শক্তিগুলি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার দৃশ্যমান সামাজিক অর্জনগুলি থেকেই অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলিতে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত স্তরের সংগে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের জনগণের ভোটের ঐক্য রক্ষার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটাতে তারা পেরেছিলেন বলেই তারা পুঁজিপতিদের কর প্রদানে বাধ্য করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এটাই একমাত্র পথ নয়। জারের রাশিয়ায় জনগণ হয়তো সেভাবে গণতান্ত্রিক কায়দায় সেটা আদায় সম্ভব বলে মনে করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সুযোগে ভোটের মাধ্যমে গণশক্তির দ্বারা বলীয়ান হয়ে "অর্থনৈতিক অসমতা" যেমন কিছুটা সংশোধিত ও সীমিত করা যেতে পারে তেমনি বিপ্লবী প্রক্রিয়াতে শোষক-শাসকদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করেও জনগণের অর্থনৈতিক সমতা বিকশিত হতে পারে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকার রেখে বা না রেখে অর্থনৈতিক সমতার প্রসার ঘটতে পারে এবং তা ঘটলে শ্রেণিবিরোধ প্রশমিত হবে এবং বাস্তবে তখন "রাজনৈতিক গণতন্ত্র" কিছুটা জনগণের চাহিদার চাপে, কিছুটা উন্নয়নের জন্য, কিছুটা অনুকূল পরিবেশের দরুন, একটি বিকাশমান শর্ত হিসাবে ক্রমশ সামনে আসতে থাকবে। বস্তুত গণতান্ত্রিক সুযোগগুলি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে দেয়া না হলে জনগণ চলমান উন্নয়নকে উন্নয়ন মনে করছে কিনা সেটা বাইরে থেকে বোঝাই দুষ্কর হয়ে পরে! সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে দেখা গেছে আত্মসন্তুষ্ট স্থবিরতা বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গণতন্ত্র থাকলে তেমনটি সম্ভব ছিল না বলেই মনে হয়। সুতরাং উন্নয়ন শুধু শাসক অর্থনীতিবিদদের বিষয়ীগত ঘোষণা বা কিছু পরিসংখ্যান নয়, তা জনগণের দ্বারা অনুভূত ও সক্রিয়ভাবে স্বীকৃত ইতিবাচক জীবন্ত বাস্তব ফলাফলও বটে। তাই ইতিহাসে উন্নয়নের নানা উদাহরণ থেকে একবিংশ শতকে অমর্ত্য সেন সহ অনেকেই মনে করেন যে দীর্ঘস্থায়ী টেকসই আদর্শ ব্যবস্থা হচ্ছে "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক" গণতন্ত্রের পরস্পর পরিপুরক ক্রমবিকাশমান ব্যবস্থা এবং অবশেষে উভয়ের পূর্ণ মেলবন্ধন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আমাদের যুগপৎ শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস

এবং জনগণের জন্য গণতন্ত্রের প্রসারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়টাই কর্তব্য হবে। এই দুই দিকের জন্য সংগ্রামের সময় কখন কোনটি প্রধান সক্রিয় দিক হবে তা নির্ভর করবে নিজ নিজ দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর। সর্বোপরি সে দেশের শ্রমজীবীদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার উপর। বিপ্লবী তত্ত্ব বা বিপ্লবী নেতৃত্ব বা বিপ্লবী দলের সীমিত সংখ্যক সদস্যদের সংকীর্ণ মতের ভিত্তিতে সেটা নির্ধারিত হওয়া উচিৎ নয়। জনগণকেই সংস্কার বা বিপ্লব কোন একটা পথ গণতান্ত্রিকভাবে বেছে নেয়ার সুযোগটি দিতে হয়। তার অর্থ বা তাৎপর্য হচ্ছে, কোন না কোন পদ্ধতিতে, জনগণের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে মত-দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার উন্মুক্ত রাখা এবং সেটার ভিত্তিতে যাতে কেন্দ্রীয় নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করাটা হচ্ছে সকল উন্নয়নেরই একটি "আবশ্যকীয় শর্ত", "উপাদান" এবং "ফলাফল"। একেই অমর্ত্য সেন অভিহিত করেছেন গণতন্ত্রের, Intrinsic, Instrumental and Constitutive Value" হিসাবে। শুনতে Paradoxical হলেও এ কথাও সত্য যে, জনগণই গণতান্ত্রিকভাবে সংবিধান অনুসারে কারো কারো গণতান্ত্রিক অধিকার সাময়িকভাবে সংকুচিত বা স্থগিত রাখতে পারে। আমাদের দেশেই তার উদাহরণ আছে। কিন্তু এ ধরনের সংকুচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থায়ী চিকিৎসা হতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্র বলতে জনগণের ক্ষমতাকে বুঝিয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি গণতান্ত্রিক দেশে "অ-জনগণদের" বা এমনকি "গণশত্রুদের" মানুষ হিসাবে কোনরকম আত্মরক্ষার আইনগত ক্ষমতা বা অধিকারই থাকবে না? শত্রু কি মানুষ নয়? গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বা বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কি তাদেরকে যখন ইচ্ছা, এবং যাকে খুশি তাকে দমন বা গুম-খুন করার অধিকার রাখে? আমরা জানি এরকম অন্ধ বাচবিচারহীন অবাধ ক্ষমতা মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেই। এমনকি গণশত্রুদের বিরুদ্ধেও মানবিক রাষ্ট্রের নির্যাতনের অধিকার নেই। মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র আইনের চোখে অপরাধী বলেই কাউকে গুম-খুন নির্যাতন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিকভাবে অনুমোদিত নিরপেক্ষ আদালতে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত ও শাস্তি নির্ধারিত হলে তারপর সেই শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষমতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে। কে গণশত্রু এবং কে গণশত্রু নয় সেটিও আইনি প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হতে হবে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সমাজে যতদিন অপরাধী থাকবে ততদিন রাষ্ট্রকেও (অর্থাৎ আইন, আদালত, পুলিশ, মিলিটারি, ইত্যাদি) থাকতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে গণতান্ত্রিক আইনের ও ঐ আইন কার্যকরী করার দায়িত্বরত কোন না কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকতে হবে? একথা স্বীকার্য যে যতদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে ততদিন গণতন্ত্র শর্তহীনভাবে অপরাধী/নিরাপরাধী সকলের জন্য সমানভাবে প্রজোয্য হতে পারে না। একার্থে পূর্ণ স্বাধীনতা বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না।[৪]

৪. লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কিভাবে ধীরে ধীরে জনগণের ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে ফুড়িয়ে যাবে এবং পূর্ণ গণতন্ত্র আসবে তার বর্ণনা রয়েছে।

ইতিহাসে পূর্ণশর্তহীন গণতন্ত্র প্রথম পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল স্বশাসিত আদিম শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে, কারণ সেখানে জনগণের গণতন্ত্র ছিল প্রতিটি ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং ব্যবস্থাটি ছিল রাষ্ট্রহীন– শাসক শ্রেণিহীন। জনগণ তথা সমাজই সেখানে জনগণ তথা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। সেসব সমাজের আধেয় (Content) এবং আকার (Form) দুইই ছিল জন সদস্যদের সক্রিয় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ থেকে উদ্ভূত। সেরকমই একটি আধুনিক সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন কার্ল মার্কস। অবশ্য অনেকে মনে করেন শ্রেণিহীন বিরোধহীন সেরকম সমাজে উত্তরণ কখনোই সম্ভব নয় যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের চাহিদা অসীম এবং উৎপাদন সসীম সেহেতু স্বার্থপর মানুষের মধ্যে কখনোই ঐকমত্য হবে না।

মার্কসের যুক্তি ছিল মানুষ যত প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবে ততই তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার দ্বন্দ্বটি কমতে থাকবে। কোন এক পর্যায়ে নতুন সমাজের নতুন সংস্কৃতিবান মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সকল সামাজিক বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে (অবৈরিতামূলক) দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। সেই সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতিকে সাম্যবাদীরা একই ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। বর্তমানে Climate Crisis এর চাপে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রসূত প্রাচুর্যের কারণে বিশ্বব্যাপী যুক্তিবাদী-সাম্যবাদী মানুষদের

প্রাসঙ্গিক উধৃতিটি হচ্ছে, For when all have learned to administer and actually do independently administer social production, independently keep accounts and exercise control over the parasites, the sons of the wealthy, the swindlers and other "guardians of capitalist traditions", the escape from this popular accounting and control will become inevitably so incredibly difficult, such a rare exception, and probably be accompanied by such swift and severe punishment (for the armed workers are practical men and not sentimental intellectuals, and they will scarcely allow anyone to triffle with them.), that the necessity of observing the simple, fundamental rules of the community will soon become a habit. Then the door will be thrown wide open for the transition from first phase of communist society to its higher phase and with it to the complete withering away of the state". [Lenin, 1949] কিন্তু জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ক্রমাগত সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় করে তুলে অবশেষে রাষ্ট্রকে শুকিয়ে মেরে ফেলার এই নির্দেশনা বিদ্যমান অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেই কার্যকরী তো হয়ই নি বরং রাষ্ট্র আরো প্রসারিত হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সামাজিক মালিকানা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিস্থাপিত হয়েছিল কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন দ্বারা।

এরকম মানবিক সম্মিলনের প্রক্রিয়া সীমিত আকারে হলেও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী এরকম আলোকিত ব্যক্তিদের পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাইবার সংলাপ ও তার মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের আধুনিকতম প্রস্তাবনাগুলির সংগে সমাজতন্ত্রীদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। (দেখুন Patrick Clouse, 2009) তবে পূর্ণ গণতন্ত্রের দিকে যাত্রাপথে উত্তরণকালের জনগণ ও জনশত্রুদের নিয়ে গঠিত সমাজবাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে "কি কি শর্তাধীনে গণতন্ত্র কতটুকু বিকশিত হবে" তাকেও নিজ নিজ দেশের জনগণের একটি গণতান্ত্রিক চয়নের (Choice) অধীনে স্থাপন করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকাটা যে জরুরি তা সমাজতন্ত্রীরা আজ বহু খেসারতের পর মেনে নিয়েছেন। সম্প্রতি চীনের একাডেমি অফ সোশ্যাল সাইন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট লী শেনমিং "Some thoughts on democracy and Universal democracy" প্রবন্ধে সমধর্মী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,

"My understanding is that, generally speaking, the democracy shaped in human societies can be divided into three categories: primitive democracy, state democracy and future socialist democracy in communist societies. Each category has it"s specificity so each constitutes a specific form of democracy. The first and the third share a similarity because both give equal rights to all tribal and social members in economy, politics and culture. Hence these two can be termed „full democracy". The democracy we talk a lot about now a days is mainly the second one, namely state democracy. Again state democracy can be divided farther into slave democracy, feudal democracy capitalist democracy and socialist democracy. The types debated most heatedly today are the capitalist and socialist democracies. None of the four categories is full democracy, thus the 'incomplete democracies' which in this sense have a "common nature" shared by slave democracy, feudal democracy, capitalist democracy and socialist democracy". [Lee Shenming 2008]

উপরোক্ত যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নিলে দেখা যায় "গণতন্ত্র" প্রত্যয়টি আর Binary Concept বা দ্বিমূল ধারণা থাকছে না। মার্কস অবশ্য দাবি করেছিলেন "নেতিকরনের নেতিকরন" দ্বারা আদিম শ্রেণিহীন গণতন্ত্র পরিণত হবে আধুনিক শ্রেণিহীন গণতন্ত্রে। তাঁর কাছে তাই সমাজতন্ত্র হচ্ছে দুই পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবর্তী এক উত্তরণকালীন প্রক্রিয়া। কিন্তু এই দূরকল্পী অতীতের পূর্ণ গণতন্ত্র (Absolute Democracy) ও সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ণ গণতন্ত্রের মাঝখানে বিদ্যমান বাস্তব গণতন্ত্রের বিকাশের নানা অপূর্ণ স্তর বা রাষ্ট্রের ও শ্রেণির ক্রমহ্রাসমান কর্তৃত্ব ও ক্রমপ্রসারমান গণতন্ত্রের জটিল উত্তরণকালীন মিশ্রণগুলি নিয়েই আপাতত আমরা

চলছি। আমরা আদিম সাম্যবাদেও নেই, আধুনিক সাম্যবাদী সমাজেও নেই। আমরা আছি নানা মাত্রার শোষণমূলক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে। এখানে তাই বিশুদ্ধ গণতন্ত্র সম্ভবও হচ্ছে না, তবে সম্ভব হচ্ছে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র অভিমুখী নানা ধরনের উত্তরণশীল গণতন্ত্র। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও গণতন্ত্র সম্পর্কে এ ধরনের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনশীল ধারণাকে বর্তমানে সমর্থন করেন। এদের গণতন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে এক পর্যালোচনামূলক আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজ লিখেছেন,

"এই পটভূমিকায় আরেকটি প্রশ্ন ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে, তা হলো– গণতন্ত্র কী করে পরিমাপ করা যায়? প্রশ্নটি কেবল এ নয় যে কোনটি ভালো, আর কোনটি খারাপ, প্রশ্নটি হলো, মর্মবস্তুর বিবেচনায় কোনটি গণতন্ত্র? প্রশ্ন ওঠে, 'গণতন্ত্র' এবং 'অগণতন্ত্র' কি দ্বিমূল (Binary) ধারণা? (অর্থাৎ একটির অবস্থান অন্যটিকে নাকচ করে দেয়, একটি থাকলে অন্যটি উপস্থিত থাকতে পারে না।) নাকি গণতন্ত্র হচ্ছে স্তর বিন্যস্ত পরস্পরার (Continuum) একটি অবস্থান (অর্থাৎ গণতন্ত্রের ক্রমবিন্যাস করা সম্ভব)? অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র-অগণতন্ত্রকে দ্বিবিভাজিত বলে মনে করেন এবং গণতন্ত্র পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের স্তর বিন্যাসের পক্ষে নন (Sartori, 1987) অন্যদিকে অনেকের ধারণা, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হওয়া দরকার চলমান ক্রমবিন্যাস প্রক্রিয়া হিসাবে (Bollen and Jackman, 1989)। এই বিতর্কের কোন ধরনের সমাপ্তি না হলেও ক্রমবিন্যাস ধারণার সমর্থকেরা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন গত কয়েক দশকে"। [আলী রীয়াজ, ২০১২]

পরবর্তীতে আমরা বিদ্যমান গণতন্ত্রকে এভাবেই একটি দ্বৈত প্রবণতার দ্বান্দ্বিক ঐক্য হিসাবেই দেখবো।

একবিংশ শতকে দেশে দেশে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনায় "গণতন্ত্র"-কে জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পূর্ণ ক্ষমতায়নের আদর্শ চিত্র হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের ইতিবাচক স্বাধীনতা ও নেতিবাচক স্বাধীনতার এক অবিরাম বিকাশ ছাড়া তা অর্জন করা যাবে না– অমর্ত্য সেনের এই মতকে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তির ইতিবাচক স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি অর্জন ও প্রয়োগ বা অন্য কারো হাতে প্রত্যার্পনের এবং প্রত্যাহারের সক্ষমতা। আর নেতিবাচক স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয়েছে ঐসব অধিকার যখন কোন ব্যক্তি প্রয়োগ করতে যাবে বা চাইবে তখন রাষ্ট্র শক্তি বা অন্য কোন শক্তিমান ব্যক্তি তাতে বাধা দিতে বা প্রত্যাখান করতে পারবে না যতক্ষণ সেই ব্যক্তি অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে না বা আইনত অপরাধী না হচ্ছেন। তাই অধিকার প্রয়োগের পূর্বশর্ত হচ্ছে একে অপরের অধিকারকে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করা। একই সঙ্গে রাষ্ট্রেরও সে বিষয়ে ও নিজের অধিকারের সীমানা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। সুতরাং এই বহুমুখী অধিকার ও দায়িত্বসমূহের সমন্বিত বাস্তবায়নের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলিই হচ্ছে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে বা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে

নিজস্ব ক্ষমতা অর্জিত হয়ে গেলে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে পরনির্ভতার কোন সমস্যা থাকে না, কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক পরোক্ষ গণতন্ত্রে পরনির্ভরতার সমস্যা অনিবার্য এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা তথা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত না হলে অপ্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় নাগরিকের জন্য নানা প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা না থাকলে শেষ বিচারে প্রতিনিধির বা সর্বোচ্চ "সুপ্রীমো"র (Suprimo) ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের মানের উপর নাগরিকদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শূন্য ব্যক্তিগত জীবনযাপনের নেতিবাচক স্বাধীনতা পায় এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সচরাচর রক্ষা করেও থাকে। তবে এই প্যারাডাইমে বেশিরভাগ ইতিবাচক অধিকারগুলিকে বাজারের অনিয়ন্ত্রিত অসম প্রতিযোগিতার হাতে রাষ্ট্র সমর্পণ করে দেয়। বাজার যে মাত্রায় যার অনুকূলে থাকে না সে মাত্রায় সে তার ইতিবাচক স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভাব দেখালেও বাস্তবে ধনীক শ্রেণির পক্ষেই শেষ পর্যন্ত অবস্থান নেয়।[৫]

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যক্তির ইতিবাচক স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং তা পূরণের অনেক দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু সেটা নিতে গিয়ে রাষ্ট্র ব্যক্তি জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে ফলে ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতার দিকটি ক্ষুন্ন হয়।

তবে বাস্তবে এই দুইরকম স্বাধীনতার ভারসাম্য একেক সমাজতান্ত্রিক/ধনতান্ত্রিক দেশে একেকরকম হয়ে থাকে। ফলে মূর্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী গণতন্ত্রের অগ্রগতির প্রধান সমস্যাটি একেক দেশে একেকরকম হয়ে থাকে। সাধারণত শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অর্থনৈতিক ইতিবাচক স্বাধীনতাগুলি আদায়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় হওয়ার সময় ও সুযোগ থাকে না– এমনকি সে ক্ষেত্রে তাদের নেতিবাচক স্বাধীনতা থাকলেও অর্থাৎ রাজনীতি করার ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ না করলেও তা করতে তারাই আগ্রহী হয় না। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক অধিকারগুলি অর্জনের পর অবসর পান ঠিকই কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণে তারাও উৎসাহ পান না কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি সেখানে যথেষ্ট আকর্ষণীয়, সর্বজনীন ও সংবেদনশীল

৫. যেমন ধরুন বাংলাদেশে রাষ্ট্রের আইন আছে পোশাক শিল্পের মালিকদের মজুরি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। না দিলে অসহায় শ্রমিকরা কোথায় অভিযোগ করবেন তা যদি না জানেন বা জানলেও তা যদি সেই কর্তৃপক্ষ আমলে না নেয় তাহলে কি হতে পারে। অগত্যা শ্রমিকেরা যদি রাস্তায় প্রতিবাদে নামেন তখন রাষ্ট্র এসে তাদের উপর বল প্রয়োগ করে ছত্রভংগ করে দেয়। তখন শ্রমিকরা কি এই অভিযোগ করতে পারেন না যে, "রাষ্ট্র ভাত দিতে পারে না, কিন্তু কিল মারার গোসাঁইয়ে পরিনত হয়েছে।" এরকম ঘটনা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অহরহ ঘটে থাকে।

(Enough Attractive, Enough Universal and Enough Responsive) নয়। একটি বিশেষ একক দলের নেতা ও সদস্যকে এখানে একচেটিয়া সুবিধা দেয়া হয়। দ্বান্দ্বিক সংলাপের হয় সুযোগই থাকে না বা প্রচণ্ড ঘাটতি থাকে।

একবিংশ শতকে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মানব অধিকারগুলি বাস্তবায়নের মাত্রা একেকরকম এবং সর্বত্রই গণতন্ত্রের প্রধান ইস্যু হচ্ছে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ক্ষমতা ভারসাম্য ও পারস্পরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ইস্যু। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে বিদ্যমান "পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্র" আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান "কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্রের" অধিকার বাস্তবায়নের মাত্রা ও ধরণ একরকম নয়। চীন-কিউবা-ভিয়েতনামে বিরাজমান এক দলীয় শাসনাধীন রাষ্ট্রে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক মানব অধিকারগুলিও আবার ভিন্নভাবে বিন্যস্ত। তাই এদের নিজ নিজ দেশে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নে সাধারণ কোন একটি মাত্র প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা কঠিন। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা বিশেষভাবে "পাশ্চাত্য গণতন্ত্র" ও "উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের" চ্যালেঞ্জগুলি অনুমাত্রিক মাত্রায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো। চেষ্টা করবো তাদের নিজ নিজ সমস্যাগুলির বৈশিষ্টগুলি চিহ্নিত করতে এবং তা থেকে পরস্পরের শেখার কি আছে সেটা নির্ণয়ের। সমাজতান্ত্রিক এক দলীয় দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্যাগুলিও প্রাসঙ্গিকভাবে কিছুটা আলোচিত হবে।

মার্কিন মুলুকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল উত্তর-দক্ষিণ গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের পর। মানুষকে দাস করে রাখা যাবে না এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটিকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকায় মানুষকে এমনকি যুদ্ধ করতে হয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। এরপর গৃহযুদ্ধোত্তর ঐক্যবদ্ধ আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে– সেটাই ছিল ইস্যু। গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ বক্তৃতায় গৃহযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পন্ন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আব্রাহাম লিংকন একটি বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতার শেষ বাক্যটি ছিল– "That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom- and that of the people, by the people for the people, shall not perish from the earth". [এই বক্তব্যের বিস্তৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য দেখুন এম.এম.আকাশ, ২০১১]

লিংকনের এই বক্তব্যের পর থেকে "Government of the people, for the people and by the people" কে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক মর্মবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে শুরুতে নারী সমাজকে আমেরিকান জনগণের অন্য অংশের মতো সমান মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। আরো বিভিন্নভাবে সমাজের অধঃস্তন শ্রমজীবী শ্রেণিগুলিও (দাসদের উত্তরাধিকার কালো বর্ণের মানুষরাও!) মার্কিন গণতন্ত্রের অধীনে অবাধে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বদা

প্রয়োগ করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বর্তমানে গণতন্ত্রের সংকীর্ণ যে ব্যাখ্যাটি চালু রয়েছে তাতে মত প্রকাশের অধিকার, দ্বিমত বা ভিন্ন মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার এবং প্রতিযোগিতামূলক ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের "শিষ্ট অধিকারগুলি" (Civil Rights) হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অধিকার। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী জনগণের আর্থ সামাজিক অধিকার (যেমন অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ইত্যাদি বস্তুগত ও সামাজিক অধিকার) গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণায় এগুলি পূরণের কোন আইনি দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেই। জনগণকে এসব অধিকার পূরণের জন্য আমেরিকায় ধনকুবের ব্যক্তি খাতের উপরেই নির্ভর করতে হয়। তবে বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী এগুলিকেও জনগণের সর্বজনীন অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে এগুলি পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বের কথা মেনে নেয়া হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের এসব নৈতিক দায়িত্ব শ্রেণিকক্ষে বা সেমিনারে বা মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত হলেও সাধারণত বাস্তবে পালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না এবং সবসময় তা সম্পদের অভাবের কারণে পূরণ হয় না, তা নয়। ফলে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বৈষম্য সাধারণভাবে অল্পকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান। বেশির ভাগ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে (স্ক্যান্ডিনেভীয় বা কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ছাড়া) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় অধিকার বলতে শুধু "শিষ্ট অধিকারগুলি" (Civil Rights) বুঝানো হয় এবং এসব অধিকার কায়েমের জন্য রাষ্ট্রকে যেসব শর্ত কম-বেশি পূরণ করলে চলে সেগুলিই হচ্ছে উদারনৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যবস্থা, যেমন– "স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব", "নিয়মিত নির্বাচনের সুযোগ", "নির্বাচনে বিরোধী দলের উপস্থিতি" এবং "নির্বাচনী অবাধ প্রতিযোগিতায় যেই দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের অনুমোদন পাবেন তার দ্বারা সরকার গঠনের সুযোগ এবং অবশেষে নির্বাচন পরবর্তীতে সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দলের দ্বিমত পোষণ ও তা পুনঃপ্রকাশের অধিকার অব্যাহত রাখা" ইত্যাদি। এই অবশ্য পালনীয় শিষ্ট অধিকারগুলি বাস্তবায়নের বিনিময়ে নির্বাচিত শাসক শ্রেণির বা দলের হাতে চলে আসে পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও তথাকথিত "স্বাধীন" আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধী ও আইন-শৃংখলা ভংগকারীর দমন ও শিষ্ট অধিকারগুলির প্রতিপালন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এসব বাহিনী ব্যবহৃত হচ্ছে শিষ্ট অধিকারগুলি লংঘন করে বিরোধীদের (বিরোধী দলও হতে পারে, জনগণও হতে পারে!) বাধা দান ও দমনের জন্য। তখন শুধু ইতিবাচক স্বাধীনতা নয়, এমনকি নাগরিকদের নেতিবাচক স্বাধীনতাও তথাকথিত সভ্য দেশে লংঘিত হয়।

তাই পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ গণতন্ত্রের খেলায় আমরা যেসব সীমাবদ্ধতা দেখতে পাই তা নিম্নরূপ–

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনোত্তর সময়ে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি সত্যি সত্যি অবাধ এবং সকল প্রতিযোগী খেলোয়ারের জন্য সমতল মাঠ তৈরি না করা।

২। রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলি নির্বাচনে এবং নির্বাচনোত্তর সময়ে জনগণের শিষ্ট অধিকারগুলি ও প্রণীত আইনসমূহ নিরপেক্ষ ও অবাধে প্রতিপালন বা বাস্তবায়ন না করা।

প্রথম জটিলতাটি নিরসন সেইসব পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেখানে "১ শতাংশের অর্থনৈতিক-সামাজিক আধিপত্য ৯৯ শতাংশের উপরে বিরাজমান" সেখানে খুবই কঠিন। এসব দেশে একদিকে রয়েছে শাসক শ্রেণির বস্তুগত সম্পদ ও অর্থের জোর, অন্যদিকে অর্থাৎ জনগণের দিকে রয়েছে নিজেদের মধ্যে অটুট ঐক্য, নিজেদের বিপুল সংখ্যা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের জোর। সুতরাং জনগণকে অসম মাঠে জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য সচেতন সংগঠিত সংগ্রাম করেই নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। এই যুদ্ধ জয় সহজ হবে যদি ঐ সমাজের এক শতাংশ ধনীদের মধ্যে বিভাজন বেশি হয় এবং নীচের ৯৯ শতাংশের মধ্যে ঐক্যের শক্তি অটুট থাকে। এছাড়া বেশিরভাগ সময় ধনবানেরা এমন দুটি দল তৈরি করে রাখেন যাতে জনগণ "মন্দের ভালো" এবং "আরো মন্দের" মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকেন। তখন দ্বি-দলীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যেই গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ হয়ে আটকে থাকে। তবে অবশ্য আমরা এও দেখেছি কোথাও কোথাও যখন এসব সমাজে দোদুল্যমান মধ্যবিত্তরা শক্তিশালী হয় তখন সেখানে তারাই গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতার নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হয়ে থাকে। তখন নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তরা মিলে গণতান্ত্রিকভাবেই বিপ্লব ছাড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারেন।

পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মডেলে তাই আমরা একটি "ডিম আগে না মুরগি আগে" সমস্যার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। কেউ কেউ বলেন শাসক শ্রেণির অধীনে প্রাপ্ত রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ব্যবহার করে শাসিত জনগণের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তারপর রাজনৈতিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিকভাবে অর্জনের পর মৌলিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে সফল হতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয় লাভ করতে হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রথম সুযোগেই বিপ্লবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তারপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে আরো এগিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সতর্কতার সঙ্গে ক্রমশ একটু একটু করে প্রসারিত করতে হবে। সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী উভয়ই অবশ্য ন্যূনতম সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া নিম্নবর্গ বা শ্রমজীবী জনগণের কোনপ্রকার অধিকার অর্জনই যে সম্ভব নয় তা স্বীকার করেন।

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বভাবতই সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকে কম, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্টন বৈষম্য থাকে বিরাট। দারিদ্র্যও এখানে সুপ্রকট। ফলে শাসকদের পক্ষে অর্থ, পেশি শক্তি ও কৌশলী মারপ্যাঁচের মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করা উন্নত পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এসব দেশে সহজতর হয়। এসব কোন কোন দেশে দ্বি-দলীয় গণতন্ত্র তথা "মন্দের ভালো" অথবা "মন্দের" মধ্যে গণতান্ত্রিক চয়নকে সীমাবদ্ধ রাখা শাসক শ্রেণির জন্য সহজেই সম্ভব হয়েছে। ফলে এসব দেশে আনুষ্ঠানিক

গণতন্ত্র চালু থাকলেও ঐ গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র বা আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি গণতান্ত্রিকভাবে জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রকৃত অর্থে অধিষ্ঠিত করা। বিভক্ত জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাসক দলগুলির 'এলিট নেতৃত্বের' সঙ্গে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কে বন্দি হয়ে পরেন। এসব দেশে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়েই এখনো পূর্ণ সচেতন নন। জনগণের ব্যাপক অংশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এসব দেশের কোথাও কোথাও এমনকি "কর্তৃত্ববাদ" বা "একনায়কের" (Dictator) এর জন্ম হয়েছে। অবশ্য উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প বা রাশিয়ায় পুতিনের আবির্ভাবের পর এ কথা আর বলা যাবে না যে ঐ বৈশিষ্ট্যটি শুধু মাত্র উন্নয়নশীল বা অনুন্নত এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় সীমাবদ্ধ। এইধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নায়ক একক ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং তা ব্যবহার করে ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নাগরিকদের নেতিবাচক স্বাধীনতাগুলি সংকোচিত করে ফেলে। তৈরি করে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। বাক্-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তলানিতে এসে ঠেকে। এমন কি বিরোধী শত্রুদের উপর হামলা-মামলা-গুম-খুন ইত্যাদি বল প্রয়োগও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। নির্বাচনী ব্যবস্থা ক্রমশঃ "থ্রি-এম" বা "Money, Muscle and Manipulation" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরে। প্রচারণার কুহক তৈরি করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অস্পষ্ট করে ফেলা হয়।

গণতন্ত্রের সংগ্রামে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী দুটি প্রবণতা "গণতন্ত্রের সংগ্রামে" আমরা দেখতে পাই। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল নাগরিকরা যারা নাগরিকদের বাক্-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক ত্রুটিসমূহ ইত্যাদি ব্যাপারে অধিক উদ্বিগ্ন তারা রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে ঠিক করাকেই প্রধান অগ্রাধিকার দেন। তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়মকানুনকে আরো স্বচ্ছ ও আরো জবাবদিহিতামূলক করার জন্য সংগ্রাম চালান। তাদের সংগ্রাম সুশাসনের জন্য সংগ্রাম। বিশ্বব্যাপী নাগরিকদের সুশীল সংস্থাগুলি শিষ্ট অধিকারসমূহ (Civil Rights) রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন।

অন্যদিকে যারা নিম্ন বর্গের সাধারণ শ্রমজীবীদের স্তরে রয়েছেন এবং যাদের কাছে প্রধান ও আশু সমস্যাগুলি হচ্ছে নিজেদের আয়, সম্পদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ঘাটতি, তারা সেগুলিই অর্জনের জন্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বা সংস্কারের সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেন। তারা উভয় শক্তিই প্রধানত বৈষম্য-নিরসক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করছেন। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসক উন্নয়নই হচ্ছে এসব দেশে গণতন্ত্রের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এ কথা অবশ্য সহজেই দাবি করা যায় যে "সুশাসন" ছাড়া "বৈষম্য নিরসক উন্নয়ন" টেকসই হয় না। আবার "বৈষম্য নিরসক উন্নয়ন" ছাড়া টেকসই সুশাসন সম্ভব হয় না। কিন্তু এরপরেও রয়ে যাবে সেই বিতর্ক– কোনটি হবে প্রাথমিক যাত্রা বিন্দু? আমরা কি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচিত শক্তির মাধ্যমে উন্নয়নকে এগিয়ে

নিয়ে যাব না কি বিপ্লবের মাধ্যমে সুষম উন্নয়নকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে তারপর সুশাসন ও শিষ্ট অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে, না কি দুই-ই দ্বান্দ্বিকভাবে এবং পরিপূরকভাবে একে অপরের সঙ্গে আনুপাতিক ভারসাম্য (check and balance) নির্ধারণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সামনে অগ্রসর হবে?

সুতরাং একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ নিছক উন্নয়নও নয় নিছক গণতন্ত্রও নয়। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন উন্নয়ন যা একই সঙ্গে বজায়যোগ্য (Sustainable) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। কিন্তু তা হতে গেলে উন্নয়নকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে সংহত করেই হতে হবে। তা না হলে যে উন্নয়ন আমরা পাব তা দীর্ঘ মেয়াদে টিকবে না অথবা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না।

অনুরূপভাবে আমরা যদি বুর্জোয়া গণতন্ত্র অর্জন করি এই অর্থে যে এই ব্যবস্থায় সবাই আমরা খুব পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলতে পারি, সবাই আমরা ভোটও দিতে পারি। সবাই আমরা এক সরকারকে বদলে আরেক মন্দের ভালো সরকারকে ক্ষমতায় বসাতেও পারি– তাহলেই কি সব হলো? এতসব কিছুর পরও মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে মৌলিক কোন পদক্ষেপ গৃহীত নাও হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যেতে পারে, বা সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কিছুটা সংস্কারমূলক অগ্রগতি হলেও তা হয় নিতান্তই শ্লথ গতিতে হতে পারে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের উন্নতি হতে পারে রকেট গতিতে– তাহলে ঐ "গণতন্ত্র"-ও আদৌ টেকসই হবে না বা অন্তর্ভুক্তিমূলকও হবে না। সুতরাং জনগণকে একই সংগে "সংকীর্ণ গণতন্ত্র" এবং "সংকীর্ণ উন্নয়ন" উভয় প্রত্যয়কেই আদর্শগতভাবে প্রত্যাখান করে কিভাবে উভয়কেই আরো প্রসারিত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিংশ শতকের শেষে এসে বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র ও বিপর্যস্ত সমাজতন্ত্র একবিংশ শতকের গণতন্ত্রকে এই দুটি চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিচ্ছে। এটা একই সঙ্গে বিদ্যমান উন্নয়ন নীতি ও শাসন প্রণালীর গণতান্ত্রিক সংস্কার ও মৌলিক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ।

গণতান্ত্রিক শাসনে গণতন্ত্রের মাত্রাভেদ

যে কোন শাসন ব্যবস্থায় দুটি পক্ষের অনিবার্য অস্তিত্ব থাকে– শাসক ও শাসিত। গণতন্ত্র যেহেতু একটি শাসন ব্যবস্থা সেহেতু সেখানেও শাসক ও শাসিত রয়েছেন। গণতন্ত্রের দুটো রূপের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। "প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র" এবং "পরোক্ষ গণতন্ত্র"। আমরা দাবি করেছি "পরোক্ষ গণতন্ত্রে" শাসকরা শাসিতদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার পর আর নিয়ন্ত্রিত নাও থাকতে পারেন। অর্থাৎ নির্বাচনী গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র যেখানে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিনিধিরা প্রায়ই আর গণতান্ত্রিক থাকেন না।

কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে বা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে শাসিতরা নিয়ত শাসকদের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তত্ত্বাবধান-নজরদারী-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি করে থাকেন। অসন্তুষ্ট হলে তাদেরকে প্রত্যাহার করার সুযোগ ও ক্ষমতা সেখানে জনগণের

আছে। ফলে সেখানে শাসকদের গণবিচ্ছিন্নতা হলেই তা তাৎক্ষণিক সংশোধনমূলক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত সংশোধিত হয়ে যায় বা অন্তত যাওয়ার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি সেখানে বিদ্যমান। আর সেইধরনের জবাবদিহিতার অনুশীলন সমাজের পরতে পরতে যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশি দিন কেউই কোন ধরনের ক্ষমতায় থাকতে পারেন না। তবে "বেশি দিন" শব্দের অর্থটি নির্ভর করে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদের উপর। সাধারণভাবে বলা যায়, "অগণতন্ত্রের" হুমকি তাই বিকেন্দ্রীভূত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শাসক কালক্রমে অগণতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয়ে গেলেও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাকে তৎক্ষণাৎ জবাবদিহিতার অধীনে আনা যায় এবং তাকে প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তিত করার সুযোগ বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রে "গণতন্ত্রের" তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সম্ভব না হওয়ার কারণে গণতন্ত্রে উত্তরণ শেষ পর্যন্ত কিছুটা অনিশ্চিত থেকে যায়। তাই পরোক্ষ গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন শ্রেণির বা তাদের বিরোধী দলসমূহের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা ও বজায়যোগ্যতার মাত্রা।

সুতরাং গণতন্ত্রকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই শ্রেয় ব্যবস্থা। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র উভয়ের জন্যই সর্বপ্রথম আমাদের "অগণতন্ত্রকে" বা "স্বৈরাচারকে" প্রতিহত করতে হবে আর "স্বৈরাচারকে" নাকচ করার একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে জনগণকে নিজেদের শাসকদের নির্বাচনের জন্য নিয়মিত অবাধ নির্বাচনী অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা। আর সেটি মুখে বলা যত সহজ-বাস্তবে তা কার্যকরী করা মোটেও তত সহজ নয়। বাস্তবে সেটি করতে হলে শাসকদের কৃপার উপর নির্ভর না করে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষিত ও উত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে কম-বেশি সকল গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত ও চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি নীচে প্রথমে তুলে ধরা হলো।[৬]

১। নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান।
২। একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা করা।
৩। সাংবিধানিক সংজ্ঞানুসারে নির্ধারিত ভোটার কারা হবেন ও প্রতিযোগী কারা হবেন, নির্বাচনের সাংবিধানিক এলাকা (ও বিভাগ) কি হবে সেসব সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্য পোষণ করা।
৪। একাধিক প্রতিযোগী দলের অস্তিত্ব থাকা।
৫। ভোটাররা অবাধে ভোট দিতে সক্ষম হবেন।
৬। ভোট প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগকারী এজেন্সি-সমূহ বেআইনি হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবেন।
৭। মিডিয়াকে নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সবগুলিই পরোক্ষ/প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্য সমান অপরিহার্য কি না তা নিয়ে বাম ও ডানপন্থীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকতে পারে।

৮। নির্বাচনী রায় ভোট গণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন অপকৌশল (Manupulation) চলবে না এবং নির্বাচনী রায় সকলেই মেনে নিবেন।
৯। নির্বাচন চলাকালে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, দুদক, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি যাবতীয় স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ আইন নির্ধারিত দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করবেন।

একটি আদর্শ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক দেশকে এই সবগুলি মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাবো পৃথিবীর খুব কম প্রতিনিধিত্বমূলক 'গণতান্ত্রিক' দেশই এই আদর্শ অবস্থার অধিকারী এবং সেই অর্থে প্রায় সবগুলি দেশই অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রের অধিকারী। নীচের দুই নং তালিকায় এই অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রের বিষয়টি তুলে ধরা হলো। এই তালিকায় ইচ্ছা করেই আমরা বিশেষ পাঁচটি দেশে বিরাজমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মাত্রা নিয়ে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি তালিকায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে বাংলাদেশে বর্তমানে গণতন্ত্রের ঘাটতি সর্বোচ্চ।

তালিকা-২
পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে "প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের" মাত্রা

	গণতন্ত্রের মাত্রা/রাষ্ট্র	বাংলাদেশ	ভারত	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	চীন	নরওয়ে
১	নিয়মিত নির্বাচন হয়।	×	√	√	√	√
২	নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন আছে।	×	√	√	×	√
৩	ভোটার ও প্রতিযোগী দল সংবিধান অনুসারে সংজ্ঞায়িত	√	√	√	√	√
৪	বহুদলীয় প্রতিযোগিতা	√?	√	√	×	√
৫	ভোটারদের অবাধে ভোট প্রদানের সুযোগ/অধিকার	×	√?	√?	√?	√
৬	রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির বেআইনি হস্তক্ষেপ হয় না	×	√?	√	×?	√
৭	মিডিয়া নিরপেক্ষ ও সত্য প্রচার করে থাকে।	×	√?	√?	×	√
৮	নির্বাচনী রায় সবাই মেনে নেয়।	×	√	√	√	√
৯	আইনের শাসন অব্যাহত থাকে।	×	√	√	√	√

বাংলাদেশ

যদি আমরা ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্বশেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় নেই তাহলে দেখবো বাংলাদেশ মোট ৯টি শর্তের ৭টি শর্তই পূরণে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। একটি শর্ত অর্ধপূর্ণ করেছে এবং মাত্র একটি শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই দিক থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মাত্রা নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

ভারত

ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে ৯টি শর্তের মধ্যে ৬টি শর্ত ভারতে মোটামুটি পূরণ হয়েছে। বাকি যে ৩টি শর্তে ভারতে সীমাবদ্ধতা মিশ্রিত ইতিবাচকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হচ্ছে–

১। ভোটারদের অবাধে ভোট দানের সুযোগ ও সুযোগের বাস্তবায়ন সর্বদা সম্ভব হয় না এই অর্থে যে সমাজের দুর্বল ভোটাররা সর্বদাই সেখানে নানা ধরণের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হুমকির মধ্যে থাকেন বা পরনির্ভরশীলতার বন্ধনের মধ্যে থেকেই তাদেরকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয়।

২। ভারতে পুলিশ, মিলিটারি, বল প্রয়োগকারী বেসামরিক মাস্তান বাহিনী ইত্যাদিরা যদিও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিরপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ট্রাডিশান বিদ্যমান তবু সংখ্যালঘুদের বা দুর্বলদের ক্ষেত্রে (জাতিগত, বর্ণগত, বিরোধী দলগত ও ধর্মীয় দলগুলির ক্ষেত্রে) বল প্রয়োগের ঘটনা বিরল নয় এবং গত নির্বাচনে এ ধরণের নানা অভিযোগ, নানা মহল থেকে উত্থাপিত হয়েছে। আমাদের পাশেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বা তৃণমূল কংগ্রেসের উভয়ের আমলেই নির্বাচনে এ ধরণের অসংখ্য অভিযোগের উদাহরণ বিদ্যমান।

৩। ভারতীয় শক্তিশালী মিডিয়া অনেকাংশে ধনীক শ্রেণির মালিকানাধীন ও তাদের দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত উভয়ই বৃহৎ গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। উভয় দেশেই শক্তিশালী বিরোধী দল রয়েছে। উভয় দেশেই ভোটারদের এবং মিডিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য ধনবান দলগুলির বিশেষ সক্ষমতা রয়েছে যেহেতু তাদের হাতে রয়েছে প্রচুর অর্থ এবং ব্যয়বহুল নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা। ৯টি শর্তের মধ্যে যুক্তেরাষ্ট্রে ৭টি শর্ত পূরণ হলেও অন্তত দুটি শর্ত পূরণের ব্যাপারে সেখানে প্রশ্নবিদ্ধতা বিদ্যমান–

১। ভোটারদের অবাধে ভয়-ভীতি লোভ-প্রতারণা ইত্যাদির উর্ধ্বে থেকে ভোট দানের সুযোগ ও সক্ষমতা এখানেও সীমিত।

২। মিডিয়ার নিরপেক্ষভাবে সত্য তুলে ধরার সক্ষমতা এখানেও সীমিত।

তবে ভারতের নির্বাচনের মতো এখানে নির্বাচনে পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং পেশি শক্তির বা বেসামরিক দলীয় বাহিনীর আস্ফালন ও অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল বা নেই বললেই চলে।

চীন

চীনে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি একটি বিশেষ অনন্য (Unique) শাসন ব্যবস্থা যেখানে গণতন্ত্রের ৯টি শর্তের মধ্যে মাত্র ৩টি শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। ২টি শর্ত অপূর্ণ রয়েছে এবং ৪টি শর্তই প্রশ্নবিদ্ধ আকারে বিদ্যমান রয়েছে। চীনের গণতন্ত্রের অপূর্ণ শর্ত দুটি নিম্নরূপ–

১। চীনে নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি একাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। অতত্রব নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ বলা যাবে না।

২। চীনে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান তা সংবিধান অনুসারে নির্ধারিত কিন্তু সংবিধানে এ-ও বলে দেওয়া আছে যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শাসনতান্ত্রিক স্থায়ী নেতৃত্ব মেনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ চীনের নির্বাচনে বহু প্রার্থী থাকলেও, বিরোধী দল সেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না। যদিও চীনে একাধিক শ্রেণি থাকায় সেখানে বহু দলের অস্তিত্বের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিদ্যমান– কিন্তু তাদেরকে নিজস্ব দল গঠনের সুযোগ না দিয়ে বর্তমানে পার্টির ভেতরেই স্বাতন্ত্র গ্রুপ হিসাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ চালু করা হয়েছে। যদি কখনো কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে থাকেও তাহলে চীনা পার্টির শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব মেনে নিয়েই তাকে চলতে হবে। যাই হোক চীনে বহু দলীয় প্রতিযোগিতা নেই বা থাকলেও তা আপেক্ষিকভাবে সীমিত বলেই আমরা ধরে নিতে পারি।

গণতন্ত্রের বাকি যে চারটি প্রশ্নবিদ্ধ শর্ত চীনে বিদ্যমান সেগুলি হচ্ছে–

১। ভোটারদের অবাধে ভোট প্রদানের অধিকার। চীনের ভোটাররা জানেন যে পার্টির প্রার্থীকে ভোট না দিলে, তাদের পরবর্তীতে বিশেষ অসুবিধায় পরতে হতে পারে কারণ, পার্টির শাসন যে কোনভাবেই হোক্ না কেন অপরিবর্তিত থেকে যাবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে যেহেতু ভোট গোপনে অনুষ্ঠিত হয় এবং পার্টি প্রার্থীর বাইরেও প্রার্থী কখনো কখনো থাকে, সেহেতু ভোটাররা ইচ্ছা করলে পার্টি প্রার্থীর বাইরেও ভোট দিতে পারেন। তবে নিঃসন্দেহে সে স্বাধীনতা আপেক্ষিকভাবে সীমিত।

২। চীনের সকল ক্ষেত্রেই পার্টির আধিপত্য বিদ্যমান। সুতরাং নির্বাচনে চীনের পার্টির সক্রিয় উপস্থিতি সর্বব্যাপী হওয়ায় সেখানে জনগণের উপর এক ধরণের অদৃশ্য বাধ্যবাধকতা থেকেই যায়। তাই একদিক দিয়ে দৃশ্যত রাষ্ট্রীয় সংস্থা বেআইনি হস্তক্ষেপ করছে না তা যেমন সত্য তেমনি প্রয়োজনে তারা যে হস্তক্ষেপে দ্বিধা করবেন না তাও সত্য। কারণ সে সক্ষমতা, অধিকার ও সুযোগ হাতে রেখেই তারা নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। বিশেষত তিয়েনমান স্কোয়ারের ঘটনার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী জনগণের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও দমনের জন্য সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে। ক্ষমতাচ্যুতির মৌলিক চ্যালেঞ্জ চীনের পার্টি কখনোই সহ্য করবেন না। একথা অবশ্য অনেক বুর্জোয়া ব্যবস্থার জন্যও সত্য।

৩। চীনে সকল মিডিয়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.সি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াও চীনে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মিডিয়াও সেখানে প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ নয়। সর্বদা সত্যনিষ্ঠও নয়। অমর্ত্য সেনের চীনের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনায় সেটি আরো স্পষ্ট ও স্বীকৃত হয়েছে।

৪। চীনের মানবাধিকার আইন, দুর্নীতি দমন আইন, বাক্-স্বাধীনতার আইন, সমালোচনার স্বাধীনতার আইন, এগুলি এমনভাবে প্রণীত যে তাতে আইনের শাসন রক্ষিত হওয়া আর সি.পি.সি-র রাষ্ট্র ক্ষমতা রক্ষিত হওয়া সমার্থক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আইনের শাসন রক্ষিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আইন প্রণীত হচ্ছে একটি বিশেষ দলের দর্শন-নীতি-শ্রেণিস্বার্থ অনুসারে। বামপন্থীরা দাবী করেন যে যেহেতু ঐ দর্শন-নীতি-শ্রেণি স্বার্থ শ্রমজীবী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের ভিত্তিতে প্রণীত সেহেতু এভাবেই গণতান্ত্রিক ক্ষমতা রক্ষিত হচ্ছে। এই যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে– এতে জনগণকে বিকল্প চয়নের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ রক্ষার সত্যতা পরীক্ষার কোন অধিকার না দিয়েই তা দাবি করা হচ্ছে। তাই চীনের দাবিকৃত গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত নয়।

যে কটি দিক দিয়ে "চীনা গণতন্ত্র" নিজেকে গণতন্ত্রের কাছাকাছি বলে দাবি করতে পারে সেই ৩টি দিক হচ্ছে–
১। নিয়মিত নির্বাচন।
২। ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বির সাংবিধানিক সংজ্ঞায়ন ও সেই অনুযায়ী তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।
৩। ভোটের ফলাফল নিয়ে কোন অপকৌশল না করার ট্রাডিশান। এ ধরনের অপকৌশল গ্রহণ তাদের নির্বাচনে অপ্রয়োজনীয় কারণ যেই জিতুক না কেন, এখানে শাসক শ্রেণির কোন পরিবর্তন হবে না। অবৈরী প্রার্থীরাই এখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

তবে চীনে শান্তিপূর্ণভাবে পার্টির ভেতরে নতুন শাসক শ্রেণি গড়ে উঠলে সেখানে পার্টির নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তখন সি.পি.সি. নামের দলটি ক্ষমতায় থাকলেও অথবা নির্বাচনে জয়ী হলেও আসলে তখন ক্ষমতা চলে যেতে পারে নতুন শ্রেণির হাতে। পুরনো বোতলে নতুন মদের আমদানী হতে পারে এবং সে অর্থে "মখমলের বিপ্লব" (Velvet Revolution) চীনেও হতে পারে, যেমনটি হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে।

নরওয়ে

নরওয়ে হচ্ছে আমাদের তালিকায় আদর্শ পরোক্ষ গণতন্ত্রের একটি নমুনা। এখানে পরোক্ষ গণতন্ত্রের ৯টি মাপকাঠির সবকটিই সাধারণভাবে পরিপূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

শুধু একটি কথা এখানে বলা দরকার, তা হচ্ছে নরওয়েতে যারা বিরোধী দল তাদের মধ্যে রক্ষণশীল দলও আছে। তারা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিরোধী ও নিওলিবারাল

আদর্শ অনুসরন করেন। আবার এর বিপরীতে কঠোর কমিউনিস্ট দলও রয়েছে। তবে সচরাচর এই দুই দল এককভাবে জয় লাভ করে না, কারণ মধ্য স্তরের বিরাট জনগোষ্ঠীটি সচরাচর এধরনের দুই চরম অবস্থানকে নির্বাচনে সমর্থন দেন না। তবে যদি তারা কেউ কখনো গণতান্ত্রিকভাবে জিতে যান, অর্থাৎ যদি মধ্যবিত্ত স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কারো প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে সেদিকে ভোট দেন তাহলে কি হতে পারে? সেখানে কি তখন কল্যাণমূলক ব্যবস্থাটি বা সোস্যাল ডেমোক্রেসির রাজত্ব ভেঙে যাবে, হয় কমিউনিস্ট একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে নয়তো নিওলিবারেল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

যেহেতু নরওয়ের গণতন্ত্র নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নয় এবং সেখানে আনুপাতিক প্রথার নির্বাচন বিদ্যমান, সেহেতু সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব সম্ভব নয়। ব্যবস্থাটিই সেখানে "Winner Takes All" নয়। সেখানে যেহেতু দুর্বলতর শ্রেণি ও স্তরের জন্য বিশেষ সামাজিক প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের প্রাতিষ্ঠানিক সুব্যবস্থা বিদ্যমান, সেহেতু সেখানে কোন সময়ই নিরঙ্কুশ বা জবাবদিহিতাহীন অস্বচ্ছ শাসকের অস্তিত্ব সম্ভব নয় ধরে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতান্ত্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হওয়ার সুযোগ যেমন সর্বদাই থেকে যাবে তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠও সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত হতে পারবে। এই অর্থে গণতন্ত্র, সেখানে যেই জিতুক গণতন্ত্র অব্যাহত থাকবে এবং গণতন্ত্রই গণতন্ত্রের ত্রুটি সংশোধনে সক্ষম হবে বলে দাবি করা হয়।

জনগণতন্ত্র তথা "গভীর" গণতন্ত্রের মাপকাঠিসমূহ

জনগণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের স্বশাসন। এখানে শাসক এবং শাসিত উভয়ের স্বার্থ এক বা এরা একই শ্রেণিস্বার্থের ধারক। এই ব্যবস্থায় জনশাসকরা জনগণের ভেতর থেকে নির্বাচিত হন। তবে নির্বাচিত এই নেতৃত্ব জনগণের প্রভুর মতো নয়, তাদেরকে হতে হয় জনগণের প্রতিনিধি এবং সেবক। জনগণের নেতা সেই হতে পারেন যিনি জনগণের সেবা সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন। তাই জনগণতন্ত্রে শাসকদের শাসন নির্ভর করে শাসিতের সার্বক্ষণিক সম্মতির উপর এবং শসিতের সম্মতি নির্ভর করে শাসকদের কর্মকুশলতার উপর। উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীলতা বজায় রাখলেই এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলেই এই ধরণের স্বশাসন মসৃনভাবে সম্ভবপর হবে। এখানে শাসক-শাসিতের মধ্যে শ্রম বিভাজন আছে কিন্তু এমন মাত্রায় ক্ষমতা বৈষম্য বা শ্রেণি বৈষম্য বা মর্যাদা বৈষম্য নেই যেখানে পরস্পর নির্ভরশীলতা ভেঙে কেউ অধিপতিতে পরিণত হতে পারেন। উভয়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন বৈষম্যমূলক নয় যখন একজন অপরজনের সম্মতি ছাড়া শাসন কার্য পরিচালনায় ও বাস্তবয়নে সক্ষম হতে পারেন। বরঞ্চ এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে উভয়ে প্রতিনিয়ত উভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে এ ধরণের বৈষম্যহীন, শ্রেণিহীন, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক জনগণের সমাজ কোথাও নেই বললেই চলে। সর্বজনীন মানবাধিকারগুলি সাধারণত শ্রমজীবী, শোষিত দরিদ্রদের ক্ষেত্রে হয় অনুপস্থিত না হয় অপর্যাপ্ত থাকে। তাই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নই হচ্ছে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান পূর্বশর্ত। জনগণতন্ত্রের আবশ্যকীয় শর্তগুলি বা "গভীর গণতন্ত্রের" অস্তিত্বের মাপকাঠিগুলি নিম্নরূপ:

১) জনগণতন্ত্র কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত গণশাসন ব্যবস্থা। সর্বস্তরে জনগণের নির্বাচিত সংগঠন বা সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যারা হবেন জনগণের বিভিন্ন অংশের মুখপাত্র। সংবিধানে তাদের ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত থাকবে।

২) জনগণের এই তৃণমূল নির্বাচিত সংস্থাগুলির কাজের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের আইন প্রণেতা সংস্থা, বিচারক সংস্থা এবং আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিতে হবে এবং পরস্পর Check and balance এর কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও পারস্পরিক জবাবদিহিতার জন্য নানা সাংবিধানিক সংস্থা গঠন করতে হবে। তারা সকলেই হবেন নিজ নিজ স্পেস এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ও গ্রহণযোগ্য। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা তৃণমূল ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে।

৩) অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট (Stakeholder) নাগরিকদের শুধু মতামত প্রদানের সুযোগই থাকবে না, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিরোধিতা-সমর্থনের অধিকারও থাকবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তা বিবেচনায় নিতে হবে। এসব বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রেখে সর্বাধিক সম্ভাব্য স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে।

৪) নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক), তথ্যের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরতা ও ডিজিটাল অভিগম্যতা থাকতে হবে যাতে তারা তাদের অংশগ্রহণের সুযোগটি নির্ভয়ে ও দক্ষতার সংগে কাজে লাগাতে পারেন।

৫) এ ধরণের অংশগ্রহণমূলক আলাপ-আলোচনার জন্য সর্বদা প্রয়োজন হবে যুক্তি ও সহনশীলতার সংস্কৃতি। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তার ঘাটতি যাতে না থাকে সে জন্য সচেষ্ট হতে হবে।৭

---

৭ জনগণতন্ত্রে জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্বকে নিরসনের পদ্ধতির ব্যাপারে মাও সে তুং এর তিনটি চমৎকার শিক্ষনীয় প্রবন্ধ রয়েছে। জনাব ইরফান হাবিব (2009) সঙ্কলিত গ্রন্থে "Resolving Contradictions Under Socialism" শিরোনামের অধীনে তা উত্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম– "On the Ten Major Relationships"(1956), "On The Correct Handling Of The Contradictions Among The People" (1957) Ges " Economic Problems Of Socialism In USSR" (1958). লক্ষ্যনীয় যে সবগুলিই রচিত হয়েছিল চীনের "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" ট্রাজেডির আগে।

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি যে সমাজের অধঃস্তন জনগণকে প্রত্যক্ষ সর্বজনীন গণতন্ত্র অর্জনের জন্য "সংখ্যালঘিষ্ঠ এলিটদের" তুলনায় নিজেদের সক্ষমতাকে মোটামুটি একটি ভারসাম্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাও আমরা বলছি যে গণতন্ত্রের সুযোগ ব্যবহার করেই তা প্রথমে অর্জনের চেষ্টা করা যেতে পারে। জনগণের পক্ষে কোথাও কোথাও বুর্জোয়া শাসনাধীন গণতন্ত্রের সুযোগ ব্যবহার করে বেশিদূর এগোনো নাও সম্ভব হতে পারে। সুতরাং প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অর্জন, তারপর তার সদ্ব্যবহার করে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা/অধিকার অর্জন– তারপর সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা/অধিকার ব্যবহার করে গভীরতর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র অর্জনের জন্য ধাপে ধাপে মসৃনভাবে অগ্রসর হওয়ার ফর্মুলা সকল ক্ষেত্রে সমপ্রযোয্যো নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জন করে ক্ষমতাসীন এলিটদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তাদের মাঠের লড়াইয়ে পরাজিত করে বা বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দখল করে গণতন্ত্রের জন্য পরিসর বৃদ্ধির সংগ্রামে হাত দেওয়া যেতে পারে। লেনিন যেমন রাশিয়ার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বলেছিলেন যে 'আসুন সুযোগ যেহেতু পেয়েছি সেহেতু আগে বিপ্লবী ক্ষমতা দখলটা সমাপ্ত করি, তারপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিতে হাত দেওয়া যাবে'– তেমনটিও হতে পারে। যদিও আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্রীদের এই আগাম বিপ্লবের ফর্মুলা কিন্তু কার্যকরী হয়নি! তাই মনে রাখতে হবে যে গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি শুধু ক্ষমতা দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেলে, অথবা ক্ষমতা দখলের পর গণতন্ত্রের পরিসর বৃদ্ধির পরবর্তী কর্তব্য অবহেলিত হলে আবার সংকট সৃষ্টি হতে পারে যেমনটি এত বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছে।

উপসংহারের পরিবর্তে

মোদ্দা কথা হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নই হচ্ছে যে কোন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। বুর্জোয়া বা এলিটদের অধিপত্য না ভেঙে জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। এলিটরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ততটুকু গণতন্ত্রই দেয় যতটুকুতে তাদের শ্রেণি আধিপত্য মৌলিকভাবে বিপর্যস্ত হবে না।

কিন্তু শাসিত জনগণের জন্য গণতন্ত্রের মূল্য অপরিসীম। শাসিতের কাছে শুধু নয়, সারা পৃথিবীর মানবসমাজের কাছে বর্তমানে গণতন্ত্র এক সর্বজনীন আদর্শে পরিণত হয়েছে। শাসকদের পরিত্যক্ত গণতন্ত্রের ঝাণ্ডাটি তাই জনগণকেই আজ হাতে তুলে নিতে হবে। গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী করতে হবে।

গণতন্ত্রকে সভ্য মানুষের সংস্কৃতিরূপে আত্মস্থ করতে হবে এবং জনগণকেই এ ব্যাপারে উদার ও সহনশীল হয়ে এগিয়ে এসে শোষক বা শত্রুদের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

প্রথমেই যুদ্ধ আমরা চাই না, গণতান্ত্রিকভাবেই আমরা প্রথমে মীমাংসা চাই, কিন্তু যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় অগণতান্ত্রিক এলিট শাসকরা, জনগণকে বাধ্য করে শোষক নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারী জনগণের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে।

আমরা শোষক এলিট হবো না, এলিটদের সহযোগী বা তাদের বাহিনীর সদস্যও হবো না, আমরা জনগণের জন্য, জনগণের এবং জনগণের দ্বারা নতুন এক পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা বা শাসনপ্রনালী গড়ে তুলবো। যার নাম পরিপূর্ণ গণতন্ত্র।

গ্রন্থপঞ্জী

১। এম. এম আকাশ (২০১১) "একবিংশ শতকে গণতন্ত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ", প্রতিচিন্তা (নভেম্বর, ২০১১), প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা।

২। Bollen, Kenneth and Robert Jackman, 1989, "Democracy, Stability and Dichotomies", American Sociological Review, Vol-54, No,4, 612-621.

৩। বদরুল আলম খান (২০১৬), "বাংলাদেশে গণতন্ত্র: এলিট বনাম জনগণ", প্রতিচিন্তা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬. ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা।

৪। Patrick Clouse (2009), "Participation and E-Democracy: How to Utilize Web for Policy Decision Making", The Tenth international Digital Government Research Conference: Social Networks: Making Connections between Citizens, Data and Government, Puebla, Mexico.

৫। Jalal Firoj (2012), Democracy in Bangladesh: Conflicting Issues and Conflict Resolution, Bangla Academy Dhaka.

৬। Sartori, Giovanni, 1987, The Theory of Democracy Revisited, New Jersey, Chatam House.

৭। Irfan Habib (Ed.), 2009, On Socialism:Selections From Writings of Karl Marx, Frederick Engels, V.I. Lenin, J.V. Stalin, Mao Zedong, Aligarh Historians Society/Tulika Books, New Delhi.

৮। নজরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব', প্রতিচিন্তা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১, ঢাকা

৯। Lenin (1949), Selected Works. Vol-2, Foreign language publishing house, Moscow.

১০। Manus I Midlarsky (Ed), 1977, Inequality, Democracy and Development, Cambridge University Press, Cambridge.

১১। মার্কস-এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। ১৮৮৮ সালের প্রথম প্রকাশিত সংস্করনের বঙ্গানুবাদ।

১২। Nelson Mandella (1994), Long Walk to Freedom, Little Brown Company, Boston and London.

১৩। Adam Przeworski et.al, Sustainable Democracy, Cambridge University Press, 1995, and also Robert J. Barro, Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society, Cambridge Mass,: MIT Press, 1996.

১৪। আলী রীয়াজ, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র: প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ", প্রতিচিন্তা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০১২, ঢাকা।

১৫। Amartya Sen (2009), The Idea of Justice, Penguin Books, London.

১৬। Amartya Sen (1999). "Democracy as a Universal Value", Journal of Democracy Vol-10, No.

১৭। লী শেনমিং (2008-09), ÒSome Thoughts on Democracy and Universal Democracy", in Marxist Studies in China (2008-09, Chinese Academy of Social Science, Foreign Language Press, Beijing, China.

১৮। তাজুল ইসলাম, (২০১৭) "সোভিয়েৎ গণতন্ত্র : ব্যর্থতার উৎস সন্ধানে", সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র, সংখ্যা ১০, অক্টোবর ২০১৭, ঢাকা।

১৯। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি 'একাদশ কংগ্রেসে গৃহীত দলিলসমূহ' (২০১৬) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০।

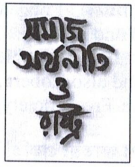

প্রায়-সর্বত্র গণতন্ত্র কেন পিছু হটছে: সাম্প্রতিকের তর্ক ও বাংলাদেশ

বিনায়ক সেন

To discover the complete horizon of a society's symbolic values, it is necessary to map out its transgressions.

- Marcel Detienne

১. তর্কটা কি নিয়ে?

এই লেখাটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্রের পিছু-হটার উদ্বেগজনক পরিণতি নিয়ে। এই প্রতিপাদ্যটি কিছু তাত্ত্বিক মীমাংসা, কিছু সাম্প্রতিক বইয়ের আলোচনা, কিছু কেস-স্টাডি, কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্ত ও কিছু অনুমান দিয়ে নানাভাবে বলার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য একে প্রমাণ করার জন্য আরো তত্ত্ব ও তথ্যের কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। সেটা স্বীকার করে নিয়েই নির্দিষ্ট করে তিনটি কথা বলতে চেয়েছি। প্রথমত, গণতন্ত্র 'পিছু হটছে' (যাকে Democratic Recession বা Backsliding বলেছেন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যারি ডায়মন্ড)। এই পিছু-হটা কেবল নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়, বা নির্দিষ্ট কিছু মাথা-পিছু আয়ের গ্রুপে সীমিত নেই। এটা যেমন ঘটছে 'প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে' (যেখানে অনেক দশক ধরে গণতন্ত্র বিরাজ করছে, যেমন ইউরোপ, আমেরিকার 'উন্নত জীবনযাত্রার' দেশগুলোয়), তেমনি ঘটছে 'দুর্বল গণতন্ত্রে' (যেখানে দুই বা বড় জোর তিন দশক ধরে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে, যেমন অধিকাংশ 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোয়)। প্রতিষ্ঠিত ও দুর্বল গণতন্ত্রের মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে পূর্ব ইউরোপের তুলনামূলকভাবে (তৃতীয় বিশ্বের তুলনায়) বেশি শিক্ষা-দীক্ষার কিন্তু মাঝারী-আয়ের দেশগুলো। যারা স্ট্যালিনীয় সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে নতুন রাজনৈতিক কাঠামোয় বিকশিত হতে শুরু করেছে। এসব দেশের সদ্য-বিকশিত গণতন্ত্র এর মধ্যে পিছু হটতে শুরু করেছে কম-বেশি। এই তিন ধারার দেশই পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথে রয়েছে, যদিও পুঁজিবাদের চর্চায় এরা নানা স্তরে অবস্থান করছে। এর অর্থ হলো যে পুঁজিবাদ সত্ত্বেও গণতন্ত্র পিছু হটছে। বুর্জোয়াদের শাসনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর নিরাপদে থাকছে না।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের পিছু-হটা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হলেও বিভিন্ন দেশে পিছু-হটার কারণ একরূপ নয়। তবে উপসর্গ বা কারণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে, পিছু-হটার পেছনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়া বা কমার কোন যোগসূত্র নেই। গত দুই দশক ধরেই পিছু-হটার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল নানা দেশে। উঁচু আয়, নীচু আয়, দ্রুত প্রবৃদ্ধি, শ্লথ প্রবৃদ্ধি– সব রকমের 'কনটেক্সটে' গণতন্ত্রের পিছু-হটা দেখতে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বলতে চাইছি যে, এখানে অর্থনৈতিক 'ডিটারমিনিজমের' কোন সুযোগ নেই। ভাবাদর্শ বা মতাদর্শ, 'পাওয়ার অব আইডিয়া'; গণ-মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া; আত্মসত্ত্বার রাজনীতি; রাষ্ট্রের কোন কোন দিকের ক্রম-বিলীয়মান ভূমিকা, আবার কোন কোন দিকের ক্রম-বর্ধমান ভূমিকা; এককথায়, রাষ্ট্র ও পুরসমাজের (State-Civil Society) মধ্যকার সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, অনেক কিছুই হয়ত এই গণতন্ত্রের পিছু-হটার ওপরে প্রভাব রাখছে। আমি এ লেখায় সেসব সম্ভাব্য প্রভাবকের তেমন কোন বিশ্লেষণ করতে যাইনি। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, Lipset-কথিত আশাবাদের কোন সুযোগ নেই এখানে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় নিম্ন-আয়ের থেকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন হবে তথা সবলতর গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে, এরকম যুক্তির পেছনে কোন তথ্যগত ভিত্তি সেভাবে নেই। উন্নয়নের ধারায় একসময়ে অপেক্ষাকৃত সুশাসন-এর স্তরে (বা সুশাসিত রাষ্ট্রের দিকে) যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অনিবার্যভাবে আরো গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণ সম্ভব, সেরকম কোন প্রবণতা এখানে কাজ করছে না। এরকম কোন গ্যারান্টিও তত্ত্বে বা তথ্যে নেই: প্রগতির রথের ঘোড়া সামনেও যেতে পারে, পেছনেও যেতে পারে। অমর্ত্য সেন যাকে বলেছেন, 'Government by Discussion'. সেই গণতন্ত্র অনেক জিডিপি আহরণের পরও দূর নক্ষত্রের মতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে পারে। সন্দেহ কী, কিছুটা ভিন্ন-অর্থে দার্শনিক জাঁক দেরিদাও বলবেন– সেই গণতন্ত্র ভূভারতে কেন, এই ভূলোকেও প্রায় কোথাও নেই, এবং কোন লাগসই শিরোনাম না পেয়ে এর নাম দেবেন 'Democracy-to-come'!

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ এই বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের সামগ্রিক পিছু-হটার বা Democratic Recession-এর বাইরে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এই পিছু-হটার মধ্যেও 'প্রগতিশীল উপাদানগুলোকে' সনাক্ত করা বা তাদের পক্ষে সমর্থন জোরালো করা সম্ভব। বাংলাদেশ কি রুয়ান্ডার মতো হবে, নাকি ঘানার মতো হবে? তুরস্ক নাকি তিউনিসিয়ার মতো হবে? ইন্দোনেশিয়ার নাকি থাইল্যান্ডের মতো অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে? ইকুয়েডর নাকি ভেনেজুয়েলাকে অনুসরণ করবে? চিলি নাকি আর্জেন্টিনার মতো হবে? স্লোভেনিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের মতো হবে, নাকি হবে হাঙ্গেরী ও পোলান্ডের মতো? এই দেশগুলো 'লিবারেল ডেমোক্রেসি' ও 'ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি' যেকোন নিরিখেই পিছু হটেছে গণতন্ত্রের সূচকে, কিন্তু এদের মধ্যে রাজনৈতিক উন্নয়নের স্তরে কী বিপুল পার্থক্য! এই Choice-এর অবকাশ তো বাংলাদেশের জন্য এখনো রয়ে গেছে। এদিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাও প্রবন্ধটির একটি উদ্দেশ্য।

লেখাটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রারম্ভিক যুক্তি ও বক্তব্য উপস্থাপনার পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে এথেনিয়ান ডেমোক্রেসির যুগের ক্লাসিক চিন্তাবিদদের প্রাসংগিকতা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আজকের পিছু-হটার আগে গণতন্ত্র কীরূপ অবস্থায় ছিল– বিশেষত শিল্প-বিপ্লব উত্তর ইউরোপে ও আমেরিকায়– সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের পরও 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' আদৌ যে লিবারেল বা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারায় পরিচালিত হয়নি সেটি আরেকবার পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আধুনিক যুগে এসে সেই প্রাগ-উদারনৈতিক, অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রের 'পশ্চাৎগমন' বলতে ঠিক কী বুঝানো হচ্ছে তা পরিষ্কার করার চেষ্টা হয়েছে। এই লক্ষ্যে হাল-আমলের পিছু-হটা বিতর্কের প্রেক্ষাপট ও প্রাসংগিক 'ডিসকোর্স'-এর উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই মর্মে আমি বলার চেষ্টা করছি যে, ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির বাইরে গিয়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। যদি নির্বাচনী গণতন্ত্রে কোন দেশ ভালো 'স্কোর' করেও থাকে, কিন্তু সমাজে ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের উদারনৈতিক চর্চা ও মূল্যবোধ 'লিবারেল ডেমোক্রেসির' নিরিখে উত্তরোত্তর 'রক্ষণশীল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' হতে থাকে, তাহলে সেদেশটিতে গণতন্ত্রের সংকট দানা বাঁধতে বাধ্য। অর্থনীতিবিদ ডানি রডরিকের পথ ধরে আমি বলার চেষ্টা করছি যে, 'লিবারেল ডেমোক্রেসিই' শ্রেষ্ঠতর, এবং সমাজে 'লিবারেল আইডিয়া'-এর ভূমিকা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু তথ্য ও উপাত্ত জড়ো করা হয়েছে দেশে দেশে গণতন্ত্রের পিছু-হটা সম্পর্কে। এটি হচ্ছে এই লেখার মূল 'ইমপিরিক্যাল' অংশ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রের পিছু-হটার সামগ্রিক প্রবণতার মধ্যে আদৌ কতটুকু কী করা সম্ভব– উন্নয়নের ফলাফলকে আরো জনকল্যাণমুখী করার ক্ষেত্রে– সে বিষয়ে কিছুটা জল্পনা থাকছে।

২. গ্রীক দেবী ডেমোক্রেটিয়া

গণতন্ত্রের দেবীর নাম গ্রীকরা দিয়েছিল 'ডেমোক্রেটিয়া'। এথেনিয়ান দেব-দেবীর মধ্যে তার অবস্থান মধ্যম সারিতে। সবার উপরেও নয়, সবার নীচেও নয়। প্রায় ষাট বছর আগে 'ইন ডিফেন্স অব পলিটিক্স' বইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নার্ড ক্রিক এই দেবীকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে: 'She is everybody's mistress and yet somehow retains her magic even when a lover sees that her favours are being, in his light, illicity shared by many another'। গণতন্ত্রের দেবী সবারই উপপত্নী, এবং প্রত্যেকেই তার আবেদনময়ী আচরণে মোহমুগ্ধ, কথাটা নির্দয় শোনায়। কিন্তু লন্ডনের সুবিখ্যাত বার্কবেক কলেজের (যেখানে দার্শনিক জিজেক অধ্যাপনা করেন) অধ্যাপক ক্রিক সাহেব বিনা কারণে কথাটা উচ্চারণ করেননি। প্রত্যেকেই এই দেবীর কাছে প্রসাদ চেয়েছেন যার যার মত করে, আর প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পেয়ে প্রীত হয়েছেন– এমনই সহৃদয়া ডেমোক্রেটিয়া দেবী। সেই থেকে বিশেষণের কমতি নেই। এথেনিয়ান ডেমোক্রেসি, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র, ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি, লিবারেল ডেমোক্রেসি, রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি, ইললিবারেল ডেমোক্রেসি, র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেসি,

'ডেমোক্রেসি-টু-কাম' ইত্যাদি নানা অভিধায় ডাকা হয়েছে তাকে। এই নামকরণের ইতিহাস ও ট্যাক্সোনমি একটি পৃথক আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

যে নামে দেবীকে ডাকা হচ্ছে সেই স্বরূপেই তার ভক্তরা তাকে দেখতে চান। অন্য কোন নামে বা অভিব্যক্তিতে তাকে দেখতে চান না তারা। রূপে-রসে-গন্ধে এসব নামকরণ এতটাই পৃথক যে এদের মধ্যে প্রায় ভাব-বিনিময় চলে না। একটা উদাহরণ দিই। একসময় মার্কসবাদীরা বলতেন, গণতন্ত্র বলতে যার ঢাক-ঢোল পেটানো হচ্ছে সেটা আদৌ 'প্রকৃত' গণতন্ত্র নয়; সেটা হচ্ছে আসলে 'বুর্জোয়া' গণতন্ত্র। কথাটা মার্কসও তার নানা লেখায় ব্যবহার করেছেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ বিদায় নিলেন। এই বিপ্লব গভীরতর সমাজ-পরিবর্তন আনল না যদিও, কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা বার্তা ইউরোপে ছড়িয়ে দিলো। বার্তাটি পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটির। বলা দরকার, ফরাসী বিপ্লবের সময়ে উচ্চারিত 'লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি' স্লোগানের মধ্যে যে ইকুয়ালিটি তা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি নিয়ে। পরবর্তীতে মার্কস সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের যে অর্থনৈতিক ইকুয়ালিটির কথা তুলবেন এটা তার থেকে আলাদা। মার্কস ও এংগেলস ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফ্যাস্টোর পাতায় পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি-র পাশাপাশি ইকনমিক ইকুয়ালিটি-র কথা বলেছিলেন। প্রথম ধারণাটি, তার চোখে, নিতান্তই সংকীর্ণ ধারণা; অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া রাজনৈতিক সমতা অর্থহীন। সেই থেকে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুত পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটিকে মার্কসের অনুসারীরা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বলে জেনে এসেছেন। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বামধারার চিন্তাবিদেরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেখবেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দার্শনিকেরা (থিওডর এডোর্নো বা ম্যাক্স হর্কহেইমার) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে কীভাবে অ-গণতন্ত্রের তথা স্বৈরতন্ত্রের বিষবৃক্ষ বড় হচ্ছে তা বড় আকারে দেখালেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের কাছে ঋণ ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো তেমনভাবে স্বীকার করেননি। তারপরও বলতে হয় ফুকোর গণতন্ত্র-বিরোধী ধারণা জার্মান দার্শনিকদের কাছ থেকেই পাওয়া। গণতন্ত্র-এর ধারণাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন ফুকো, যা প্রায় মার্কসের রক্ষণশীলতাকেও ছাড়িয়ে যায়। পুরো উদ্ধৃতিটি তাই তুলে দিচ্ছি:

'If one understands by democracy the effective exercise of power by a population which is neither divided nor hierarchically ordered in classes, it is quite clear that we are very far from democracy. It is only too clear that we are living under a regime of a dictatorship of class, of a power of class which imposes itself by violence, even when the instruments of this violence are institutional and constitutional; and to that degree, there isn't any question of democracy for us'.

নোয়াম চমস্কীর সাথে বিতর্কে ফুকো একথা বলেছিলেন ১৯৭১ সালে– তার মৃত্যুর ১৩ বছর আগে। তাহলে উনিশ শতকের মার্কসের তুলনায় বিশ শতকের সত্তর

দশকেও এসে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশের গণতন্ত্রে খুব একটা 'ইতিবাচক কিছু' অর্জিত হয়নি! ফুকোর শব্দ ব্যবহারটিও দেখুন: সত্তর দশকেও তিনি দেখছেন উন্নত আধুনিক গণতন্ত্রের পেছনে ধনিক শ্রেণির ক্ষমতার দাপট– 'ডিক্টেটরশীপ অব ক্লাস'। অথচ অনেককেই আজকাল চলতি হাওয়ার প্রভাবে সংকুচিত হয়ে বলতে শুনি 'ডিক্টেটরশীপ অব প্রলেতারিয়েত? ওটা তো উনিশ শতকীয় ধ্যান-ধারণা। আধুনিক যুগে তা বাতিল হয়ে গেছে কবেই।' ফুকো অন্তত তা মনে করতেন না। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলও তা-ই ভেবেছেন, কেন না তারা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন কীভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গাছ বেয়ে স্বৈরতন্ত্রের সর্প ঠিকই রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছে যেতে পারে। ডেমোক্রেটিক ম্যান্ডেটই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। সুতরাং গণতন্ত্রের ধারণাটি মার্কসের কালে যেমন, বিশ শতকের শেষ ভাগে এসেও একটি অস্বস্তিকর ধারণা হিসেবে রয়ে গেছে। যারা প্রথাগত অর্থে মার্কসবাদী ছিলেন না, তাদের কাছেও।

শুধু ফুকো নন, তার চেয়ে কমবয়েসী কিন্তু ভিন্ন পথের পথিক জ্যাঁক দেরিদা-র কাছেও বুর্জোয়া গণতন্ত্র সমাদৃত হয়নি। তিনি সাধারণ গণতন্ত্রকে এক পাশে রেখে র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেসির কথা ভেবেছেন। বলেছেন এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা যার পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ্য– 'যে-গণতন্ত্র আসতে বাকি' (Democracy-to-come)। এর অর্থ নির্বাচনী সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে গণতন্ত্রের অন্য কোন অর্থ খুঁজে নিতে হবে। উনিশ শতকের গণতন্ত্রে, নির্বাচনে ভোটের অধিকার ছিল কেবল শ্বেতাঙ্গদের, তা-ও সবার নয় যারা– 'প্রপার্টিড ক্লাস' তাদেরই ভোট দেওয়ার অধিকার ছিলো। বিশ শতকের শেষে এসে কালক্রমে অধিকাংশ দেশেই সর্বজনীন ভোটের ('ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট') গণতন্ত্রের প্রথা চালু হয়। এই-যে 'শ্রেণি' থেকে 'সর্বজনীনতায়' উত্তরণ, একে গণতন্ত্রের অন্তিম পরিণাম বলে ভাবতে চেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু দেরিদার এতে সায় নেই। আগামীকালের গণতন্ত্র বলতে তিনি এমন একটি ব্যবস্থার ইংগিত দিয়ে গিয়েছেন যা ভিন্ন স্বরের সাম্যবাদেরই নামান্তর। এদিক থেকে দেখলে মিশেল ফুকো, জ্যাঁক দেরিদা, এলান বাদিউ এই প্রভাবশীল ত্রয়ীর মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য গণতন্ত্রের, অন্য ক্ষমতাবলয়ের, অন্য সাম্যবাদের তত্ত্ব-তালাশের চেষ্টা দেখতে পাই। শুধু ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে নয়, জার্মান দার্শনিক হাবেরমাসও এই পথের পথিক।

এ তো গেলো উন্নত বিশ্বের প্রসংগে গণতন্ত্রের ধারণাটির অব্যাহত সীমাবদ্ধতার কথা। তৃতীয় বিশ্বের প্রশ্নে এসে গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় আরো বেশি অনির্ধারিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের কথা। সাব-অলটার্ন হিস্টরি প্রকল্পের সময় বহু ডিসিপ্লিন-এর চিন্তকরা যুক্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে পার্থ চ্যাটার্জী একাধারে ইতিহাসবিদ ও পলিটিক্যাল থিওরিস্ট। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো– উনিশ শতকের বুর্জোয়া গণতন্ত্র একদিকে যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মধ্যে, অন্যদিকে এর সর্বজনীনতার আবেদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কারণে।

'পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে'– এটাই তার মুখ্য বক্তব্য। এবং সেটা শুধু তৃতীয় বিশ্বেই নয়, প্রথম বিশ্বেও। ফলে উনিশ শতকীয় গণতন্ত্রের মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলেক্সি দ্য টোকভিল (Alexis de Tocqueville) তার 'ডেমোক্রেসি ইন আমেরিকা' বইতে যতটা প্রগতিশীল ও আশার উপাদান দেখেছিলেন তার অনেকটাই এখন অবলুপ্তির মুখে। ফরাসী বিপ্লবের একটি উদ্ভাবন ছিলো 'রিপাবলিক' বা প্রজাতন্ত্র। তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশের সংবিধানের প্রতিশ্রুতিতে 'প্রজাতন্ত্র' উল্লেখিত হলেও তা বাস্তবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে 'প্রজায়' ও 'তন্ত্রে'। প্রজাদের তন্ত্র হয়নি, নাগরিকেরা উল্টো তন্ত্রের প্রজায় পরিণত হয়েছেন। ফরাসী বিপ্লবের পর পরস্পরকে বিপ্লবীরা ডাকতেন 'সিটিজেন রবেস্পীয়ার', 'সিটিজেন দান্তন', 'সিটিজেন কামিল', 'সিটিজেন স্যাঁ জুস' ইত্যাদি সম্বোধনে। রাষ্ট্রের চোখে সবারই ছিলো একই পরিচয়; সবাই 'সিটিজেন'– ধনী-গরিব নির্বিশেষে। আমাদের রিপাবলিকে প্রজারা কখনোই সম্পূর্ণ সিটিজেন বা নাগরিক হতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে নিতান্ত 'রায়তী প্রজা' হিসেবেই রয়ে গেছে। এটিও পার্থ চ্যাটার্জীর আরেকটি পর্যবেক্ষণ। সুতরাং গণতন্ত্র পিছু হটেছে বা হটেনি সে প্রশ্নের বিচার করার আগেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গণতন্ত্রের ক্রিটিক্যাল তাত্ত্বিকদের চোখে বিশ শতকের শেষের গণতন্ত্র– তার সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্জন সত্ত্বেও– একটি সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। এই সংকটাপূর্ণ ধারণার আবার 'আরো পিছু হটা' কল্পনা করতে হলে সংকটের ভেতরে আরো গভীর সংকট-এর অস্তিত্ব চিন্তা করতে হয়। এ যেন ঝড়ের ভেতরে ঝড়ের কেন্দ্রকে বা 'আই অব দ্য স্টর্ম'কে তথ্যে-তত্ত্বে প্রত্যক্ষ করার বিষয়।

গণতন্ত্রের বিষয়ে বিভিন্ন মত ও পথের এত দুস্তর ব্যবধান যে এক হিসেবে এর 'পিছু হটা' নিয়ে আলোচনা করা খুবই দুরূহ। গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ কী প্রশ্ন করলে মহামতি প্লেটো হয়তো বলতেন এর আসল অর্থ স্বর্গলোকে লুকানো, এবং দুঃখজনকভাবে সেই অর্থটা আমাদের আজও জানানো হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মনের সূত্রেও বলা হয়েছিল– নিও-প্লাতোনিজমের প্রভাব সেখান থেকেই চলে আসে– যে 'সত্য এক হিরন্ময় পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে'। এজন্যেই সঠিক অর্থে কখনোই পৌঁছানো যাবে না, অভিজ্ঞতার আলোকে একটা কেজো-অর্থ তৈরি করেই এগুতে হবে। তবে যে-অর্থই করি না কেন, এর পক্ষে-বিপক্ষের অবস্থানটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। যেমন, প্লেটো তার রিপাবলিক-এ গণতন্ত্র চাননি। শুধু চাননি তা-ই নয়, একে পরিত্যজ্য জ্ঞান করেছেন। তার চোখে, গণতন্ত্রে বা লোকতন্ত্রে গণমানুষ বা লোকসাধারণের যে-শাসন, তা হচ্ছে এক নিকৃষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাধিক্যের জোরে বর্বররা যেখানে তাদের অসংস্কৃত শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। আর সেই শাসন জনগণের নয়– আসলে উন্মত্ত জনতার। জনতা অর্থাৎ 'mob- a powerful, selfish, fickle, and inconsistent beast'; এর ওপরে কীভাবে রাষ্ট্র-শাসনের অধিকার ছেড়ে দেওয়া চলে! স্মর্তব্য, প্লেটোর সময়ে এই 'জনতার' মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার চল প্রায় নেই বললেই চলে। গ্লাডিয়েটরদের মধ্যে রক্তপাতময় যুদ্ধ দেখাই যাদের বিনোদনের একমাত্র বা প্রধান ক্ষেত্র, তারা কীভাবে বুঝবে সক্রেটিসের দর্শন, এরিস্টোফেনিসের কমেডি, সফোক্লিসের ট্রাজিডি, পিথাগরাসের

গণিত, আর হোমারের বা হোরেসের কাব্য? সেজন্যই তিনি চান, রিপাবলিক শাসন করবেন রাজর্ষিগণ। যিনি রাজা তিনিই হবেন ঋষি, অথবা যিনি ঋষি, তিনিই হবেন নৃপতি। যেভাবেই ঘটুক, তাকে হতে হবে দ্বৈত-ভূমিকার 'ফিলোসফার-কিং'। এটা বলতে প্লেটো আসলে ক্ষমতার সাথে জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেই বুঝিয়েছেন। পুরো উদ্ধৃতিটা মনোযোগের দাবি রাখে: রাজর্ষির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'either philosophers become kings or those who are now called kings come to be sufficiently inspired with a genuine desire for wisdom; unless power and philosophy meet together'। প্লেটোর এই কথার অনুরণন আধুনিক কালেও আমরা শুনেছি। বর্বর অশিক্ষিত আবেগ-উন্মত্ত জনতার শাসনকে গণতন্ত্র নাম দিলেও তা কখনোই সুফল বয়ে আনতে পারে না এরকম কথা শিল্প-বিপ্লবের ইউরোপেও ধ্বনিত হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'এসে অন লিবার্টি' এবং 'কনসিডারেশনস অন রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট' বই দুটিকে লিবারেল ডেমোক্রেসির অন্যতম মূল টেক্সট হিসেবে ধরা হয়। সেই তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ভোটাধিকার সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের (এবং নারীরই) পাওয়া উচিৎ, তবে একটি মাত্র শর্তে। ভোটারদের আগে 'বাধ্যতামূলকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায়' শিক্ষিত হতে হবে। এবং যতদিন তা না হচ্ছে, সর্বজনীনতার প্রস্তাব ততদিন মুলতবী রইল। মিলের এই 'শিক্ষিত গণতন্ত্রের' ধারণা অমর্ত্য সেনের 'গভর্নমেন্ট বাই ডিসকাশন' ধারণার ওপরে গভীর ছায়া ফেলেছে (মিলের 'শিক্ষার' সাথে সেনের 'ক্যাপেবিলিটি' ও 'পাবলিক রিজন' প্রকল্পের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে)। টোকভিলও ১৮৩০-র দশকে বারবার গণতন্ত্রের শাসনে 'The dangers of a tyranny of majority'-এর কথা বলে গেছেন। জেফারসন বৃদ্ধ বয়সে বলেছেন, 'an elective despotism was not what we fought for.' অর্থাৎ আদি-চিন্তকরাও গণতন্ত্র নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শিক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভংগী নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে এবং তা সময় সময় গণতন্ত্রের চরিত্রকে কলুষিত করতে পারে। সাম্প্রতিক কালের একটি উদাহরণ দিই। গত কয়েক বছরে ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমেই কেন্দ্রে ও কিছু রাজ্যে জয়যুক্ত হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মন-মানসিকতায় প্রবল হিন্দুত্ববাদী 'মোড় ফেরা' একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে এতে। তারই পরিণামে কাশ্মিরে 'আর্টিকেল ৩৭০' বাতিল শাসক শ্রেণির কাছে 'জনপ্রিয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ' বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্লেটো যা-ই বলুন না কেন, তার গুরু সক্রেটিস জনতার প্রতি অত নির্দয় ছিলেন না। শেল্ডন ওউলিন (Sheldon Wolin) তার 'ফিউজিটিভ ডেমোক্রেসি' বইতে দেখিয়েছেন যে ডেমোক্রেসির 'ডেমোস' কোন অসংস্কৃত বর্বর নয়, তাদের দক্ষতা রয়েছে নিজ নিজ কাজে। একজন কাঠমিস্ত্রি বা কারিগর বাড়ি তৈরি করতে পারে বাড়ি তৈরির পেছনের বিজ্ঞান বা কলা-কৌশল তাত্ত্বিকভাবে না জেনেও, এবং সেই অর্থে 'রাষ্ট্র পরিচালনার' খুঁটি-নাটি ব্যাপার-স্যাপার তত্ত্ব-তথ্য না জেনেও তারা রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ নিতে পারে। সক্রেটিসের সাথে সংলাপে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে

যার থেকে গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তির স্পেস খুলে যায়। উদাহরণত, সক্রেটিস তর্কালাপের এক-পর্যায়ে দাবী করলেন যে 'কেবল মাত্র মহৎ ও ন্যায়বিচার করতে সক্ষম' এমন লোকদেরকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দেওয়া উচিৎ। তখন আলসিবিয়াডস্ (Alcibiades) বললেন, 'তা কী করে হয়? সেটা হলে তো যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে তারা শাসনকার্যের নামে পরস্পরকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে নিজেদের স্বার্থে।' এদিক থেকে আলসিবিয়াডস-এর সমসাময়িক 'হিস্টরি অব পেলপোনেসিয়ান ওয়ার'-এর লেখক (যিনি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে স্পার্টা ও এথেনস-এর মধ্যকার মহাযুদ্ধ নিয়ে লিখেছিলেন) থুসিটাইডস্ (Thucydides) পরোক্ষভাবে ডেমোক্রেসির কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন: 'The demos includes the whole state, oligarchy only a part. None can hear and decide as well as the many: those talents receive their due in a democracy.' রাজর্ষিরা ক্ষণজন্মা অথবা বিরল, সুতরাং রাজর্ষিদের পরিচালিত রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত হলেও ডেমোস-এর ওপরেই ভরসা করা উচিৎ–এ-ই ছিলো প্লেটোর ক্রিটিকদের মতো।

আশা করা গিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত এরিস্টটলের মাধ্যমে এই বিতর্কের সমাধা হবে। কিন্তু বরাবরের মতো এরিস্টটল এই প্রশ্নেও মধ্যপন্থার আশ্রয় নিলেন। প্লেটোর রাজর্ষি-কর্তৃক শাসনও নয়, আবার ডেমোস কর্তৃক শাসনও নয়, তিনি প্রস্তাব করলেন যে 'এরিস্টোক্রেসি' পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই সর্বোত্তম। এরিস্টোক্রেসি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'দ্য রুল অব দ্যা বেস্ট' অর্থাৎ সেরাদের দ্বারা শাসন। অলিগার্কি হচ্ছে, 'দ্য রুল অব দ্যা ফিউ'– কতিপয় ধনী ও ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা শাসন। এটি নিকৃষ্টতম শাসন, কেননা এই ব্যবস্থায় ধন-বৈভবের চরম বৈষম্যমূলক বণ্টন ঘটে। পক্ষান্তরে, ডেমোক্রেসি হচ্ছে দরিদ্র সাধারণের শাসন। এটিও সমস্যাজনক, কেননা এতে করে যারা বৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করেছেন, যারা ব্যবসার সাধারণ কারবারী, তাদের ওপরে বেশি করে ট্যাক্সের বোঝা পড়ার ও অন্যান্য রুদ্ররোষের সম্ভাবনা থেকে যায়। বাকি রইল মনার্কি বা সরাসরি রাজতন্ত্র, যেখানে রাজা হচ্ছেন অসাধারণ গুণাবলী সম্পন্ন শাসক, যিনি সমস্ত জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে তার শাসন-কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এটুকু বলেই এরিস্টটল অবশ্য যোগ করবেন যে ওরকম গুণাবলী সম্পন্ন নৃপতি কচিৎ-কদাচিৎ মেলে, তবে যদি মেলে তাতে তার কোন আপত্তি নেই। অলিগার্কি, ডেমোক্রেসি ও মনার্কি– এই তিন ব্যবস্থার তুলনায় বরং অনেক বেশি আস্থা রাখা যায় এরিস্টোক্রেসি-কর্তৃক শাসনের ওপর। অলিগার্কির সংকীর্ণ গ্রুপের তুলনায় এর বৃহত্তর শ্রেণি-ভিত্তি রয়েছে (যদিও গণ-ভিত্তি নেই), আবার ডেমোক্রেসির জনতার শাসনের নৈরাজ্যে পর্যবসিত হওয়ারও ঝুঁকি নেই এতে। এরকম একটি শাসক-শ্রেণিকে গড়ে তোলা গেলে প্লেটোর ক্ষণজন্মা রাজর্ষির জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে না আমাদের। এরিস্টটলের শাসন-বিন্যাসে অলিগার্কির চেয়েও নিকৃষ্টতর হতো প্লুটোক্রেসি– 'দ্য রুল অব দ্য রিচ'। তবে এটি তার চিন্তায় তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয়নি। এর ব্যবহার জোরে-শোরে শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে-পুঁজিবাদের উন্মেষ-পর্ব যখন। আমেরিকার গণতন্ত্র ক্রমশ: প্লুটোক্রেসিতে

পরিণত হচ্ছে– নোয়াম চমস্কী থেকে জিমি কার্টার এই অভিযোগ তুলেছেন। প্লুটোক্রেসির সাম্প্রতিক উদাহরণ রূপে আমেরিকার গণতন্ত্রের প্রসংগ প্রায়ই আলোচনায় ওঠে।

এরিস্টটলের 'পলিটিক্স'-এর আধুনিক ব্যাখ্যাকাররা অবশ্য উপরোক্ত শ্রেণিবিন্যাসের ভিন্নতর তাৎপর্য্য খুঁজে পেয়েছেন। কোনটা যে সত্যিকারের এরিস্টটলের মত তা হলফ করে বলা শক্ত। কেউ বলেছেন, এরিস্টটল নৃপতি, এরিস্টোক্রেসি ও জনগণের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন কামনা করে ছিলেন। শুধু নৃপতির কাছে ছেড়ে দিলে তা নিরঙ্কুশ ডেসপটিজমের রূপ নিতে পারে– সেটা কোনক্রমেই কাম্য হবে না। আবার এরিস্টোক্রেসি যদি সকল ক্ষমতার প্রয়োগ করতে থাকে তাহলে সেটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রে বা অলিগার্কিতে পর্যবসিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, অতীতে স্ট্যালিনীয় সমাজতন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো– কেন্দ্রীয় কমিটির সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র বা 'পার্টিতন্ত্র' উদ্ভূত হয়েছিল এরকম অভিযোগ উঠেছে। একইভাবে সব ক্ষমতা জনগণের কাছে ছেড়ে দেওয়াও বিপদজনক, কেননা জনতার মন সর্বদাই অস্থির; আজ যাকে আপনার বলে ভাবছে পরশু দিনই তাকে দেশের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করছে। সুতরাং আরো ভালো কিছু না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত একটি 'ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা' চালিয়ে যাওয়াই উত্তম প্রস্তাব। কেউ কেউ আবার এ-ও বলেছেন, এরিস্টটল আসলে গোপনে গোপনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই পক্ষে ছিলেন। তার আমলে এর চেয়ে বেশি খোলাসা করে বলা সম্ভবপর ছিল না। এরিস্টোক্রেসি বলতে তিনি গুণে-মানে সেরা লোকদের গ্রুপকেই বুঝাতে চেয়েছিলেন। তার এরিস্টোক্রেসি আসলে ছদ্মবেশী মেরিটোক্রেসি, চীনের মিডল কিংডমের প্রতিভাবান ও করিৎকর্মা আমলাতন্ত্র। এরিস্টোক্রেসির গুণপনার সাথে ডেমোসের ক্ষমতা, সমর্থন ও মতামত মিলিয়ে তিনি একটি 'Politeia' নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন– যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'সংবিধান' এবং অন্য অর্থ হচ্ছে 'সাংবিধানিক সরকার'। পলিটেইয়া এখন আধুনিক ইংরেজিতে 'পলিটি' হিসেবে অনূদিত হয়ে আসছে। মোট কথা, মুখে 'এরিস্টোক্রেসি' বললেও তার আসল লক্ষ্য ছিলো এমন এক সাংবিধানিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ যেমন কাম্য ছিলো, মেরিটোক্রেসির শাসনও অনিবার্য ছিলো, তা' রাজশক্তি যার বা যাদের হাতেই থাকুক না কেন। অবশ্যই এই ব্যবস্থাকে ফরাসী বিপ্লব-উত্তর 'গণতান্ত্রিক' আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে পুরোপুরি মেলানো চলে না। তবে, এরিস্টটল যে প্লেটোর 'ফিলসফার-কিং', সাধারণ মানের 'রাজতন্ত্র', যেকোন ধরনের 'অলিগার্কি' বা গোষ্ঠীতন্ত্র, এবং প্লুটোক্রেসি বা বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর ডাইনাস্টিক শাসনকে তার আরাধ্য Politeia-র চেয়ে নিকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা ভেবেছিলেন তাতে মোটামুটি একমত হওয়া চলে।

এছাড়া, সক্রেটিস-প্লেটোর যুগেও মেইনস্ট্রিম একাডেমির বাইরে নিম্নবর্গের গণতন্ত্র-চর্চার পক্ষে একটি স্কুল গড়ে উঠেছিল। এই স্কুলটি এথেনিয়ান ডেমোক্রেসির 'ক্রিটিক' হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসে তিনি Pseudo-Xenophon নামে পরিচিত। এর অনুসারীরা তীক্ষ্ণভাবে 'সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রের' কথা

বলতেন। একটি প্রাসংগিক উদ্ধৃতি নিম্নবর্গের গণতন্ত্র-চর্চাকে বুঝতে সহায়ক হবে। Pseudo-Xenophon বলছেন যে অত প্রতিভাবানদের দ্বারস্থ না হওয়াই ভালো, কেননা তারা সুন্দর করে যা লেখে তা কেবল নিজেদেরই স্বার্থে। এর চেয়ে বরং ভালো কিছু কম শিক্ষিত সাধারণ জনগণ যদি আইন তৈরিতে এগিয়ে আসে। Pseudo-Xenophon বলেছেন, সাধারণ জনগণ মিলে যা তৈরি করবে তা হয়তো সবার সেরা হবে না, কিন্তু গণতন্ত্রকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে এটাই সবার সেরা পথ: 'such practices do not produce the best city, but they are the best way of preserving democracy. For the common people do not wish to be deprived of their rights in an admirably governed city, but to be free and to rule the city: they are not disturbed by inferior laws, for the common people get their strength and freedom from what you define as inferior laws. If you are looking for an admirable code of laws, you will find that the ablest draw them up in their own interest… As a result of this excellent system the common people would very soon lose all their political rights', অর্থাৎ লোকসাধারণের কাছে ইচ্ছে-মত চলা-ফেরা করার, নিজের রুচিমাফিক জীবনযাপন করার 'স্বাধীনতা'-র মূল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেরা সংবিধান, সেরা শাসনতন্ত্রের রূপরেখা, এমনকি সেরা 'ফর্ম অব গবর্ণমেন্ট'-এর চেয়ে। এই কথাগুলো থেকে ধারণা হয় যে গণতন্ত্রের মধ্যে অচ্ছেদ্য ভাবে অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের ঝুঁকি লুকিয়ে আছে। আধুনিক কালের র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেসির অনুসারীরা Pseudo-Xenophonকে সক্রেটিসের সমতুল্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার থেকেও প্রাগ্রসর দার্শনিক বলে মনে করা হয়।

গুরু প্লেটোর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এরিস্টটল জোট বেঁধেছিলেন। 'গণতন্ত্র এই ধারণাটিকে শুধু রাজকার্য নির্বাহের একটি পদ্ধতি বা কোন শ্রেণি রাষ্ট্র-শাসন করতে সবচেয়ে সক্ষম এই প্রশ্নে সংকীর্ণ করতে চাননি উভয়েই। শাসিতরা কতটা 'স্বাধীনতা' ভোগ করবে– এটিও তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। প্লেটোর কাঙ্ক্ষিত রাজর্ষি পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা যেমন সত্য, এরিস্টটলের কাঙ্ক্ষিত এরিস্টোক্রেসি পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সেটা সমানভাবে খাটে। শাসন-ব্যবস্থার রূপ যা-ই হোক, শাসিতরা সামাজিকভাবে কতটা স্বাধীন এটি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক ছিলো। গল্প-প্রবাদে যে নগর-ভিত্তিক 'রামরাজ্যের' উপাখ্যান পাই, তার তাৎপর্য্য এই কারণে যে সেরকম একটি রাষ্ট্রে সকল শ্রেণি-বর্ণ-গোত্র-ধর্মের নাগরিকেরাই যথেষ্ট 'সামাজিক স্বাধীনতা' ভোগ করতেন। জনক রাজা, দশরথ, বিক্রমাদিত্য, অশোক বা আকবর বাদশাহদের 'রামরাজ্যে' আধুনিক কালের সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিলো না, কিন্তু প্রজারা যথেষ্ট সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। বাক্-স্বাধীনতা, ইচ্ছেমত পোশাক পরার স্বাধীনতা, আচরণবিধির (তা প্রচলিত বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও) স্বাধীনতা প্লেটোর রিপাবলিকে অনুমোদিত হয়েছিল। রাজনৈতিক শাসন-প্রণালীর বাইরে সামাজিক স্বাধীনতার মৌলিক গুরুত্ব সমসাময়িক রোমক রাজনীতিক ও

দার্শনিক সিসেরোর লেখাতে আরো স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। প্লেটোর মতো সিসেরোরও একটি 'রিপাবলিক' গ্রন্থ ছিলো যার নাম De Republica। যেখানে তিনি বলছেন যে শুধু ভোট দিতে পারা, রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচন করা, বা সিনেটে বিল উত্থাপনই যথেষ্ট না। সেই সাথে 'অর্থনৈতিক বৈষম্যর' প্রসংগটিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। এরিস্টটলের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। এরিস্টটলের প্রতিভার পরিচয় এখানেই যে মুখে এরিস্টোক্রেসির কথা বললেও এর অর্থ তিনি বদলে দিয়েছেন। এ প্রসংগে ওউলিন যা বলেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য: 'Aristotle's achievement was to redefine aristocracy as meritocracy, downplaying the elements of birth and wealth and emphasizing the qualities of education, culture and ability'। এরিস্টটলের এরিস্টোক্রেসি বরং চীনের ম্যান্ডারিন শ্রেণির সাথে তুলনীয়; এর সাথে জাত-পাত ভেদে কন্টকাকীর্ণ ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার কোন রকম তুলনাই চলে না। শেষোক্ত প্রথায় প্রথম দিকে 'স্বভাব-অনুযায়ী শ্রম-বিভাজনের কথা বলা' হলেও তা ক্রমশ বংশানুক্রমিক অধিকার ও দাবীতে পর্যবসিত হয়। 'শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক অর্জন ও সামর্থ্য' এই তিনটির কোনটাই গ্রাহ্য করা হয়নি ভারতবর্ষের এশিয়াটিক ডেসপটিজমে। বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তী পরিষদ বা আকবরের নবরত্ন-সভা ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ। যেমন ব্যতিক্রমী ছিলেন মহাভারত-এর কিছু অসবর্ণ বা নিম্নবর্গের চরিত্র: গৃহপরিচারিকার ঔরসে জন্ম নেয়া বিদুর, সূতপুত্র কর্ণ, নিষাদ একলব্য, এমনকি ব্যাসদেব স্বয়ং (যেহেতু তিনি পরাশর মুনি ও ধীবরকন্যা সত্যবতীর পুত্র)। নেই, বলতে গেলে, কোথাও প্রায় নেই এরিস্টটলের অর্থে 'মেরিটোক্রেসি' এই ভারতবর্ষের ইতিহাসে– কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। বুদ্ধিদীপ্ত মন্ত্রণাদাতার ভূমিকায় চাণক্যের পরেই এক দীর্ঘ শূন্যতা। তারপর এলো আকবরের নবরত্ন সভা। অবশ্য চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় এক সুবিবেচক কাজীর চরিত্র। কিন্তু এরকম উদাহরণ খুব বেশি নয়। 'আধুনিক' উপনিবেশ যুগে টিম টিম করে জ্বলছে গোপাল ভাঁড়ের উদাহরণ– নিজস্ব যোগ্যতা বলে যিনি জায়গা করে নিয়েছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ছোট-মাপের 'রাজসভায়'। কিন্তু গোপাল তো প্রথাগত অর্থে অমাত্য নন, নন ম্যান্ডারিনদের প্রতিনিধি। সে তো প্রথমত ও প্রধানত ভাঁড়।

সামাজিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রসংগ বিনা কারণে তুলিনি এখানে। যদিও আজকের যুগে উন্নত দেশে পুঁজিবাদের সাথে গণতন্ত্র এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে– ডেমোক্রেসি উইথ ফ্রি-মার্কেট ইকনমি– বাস্তবতা হলো এই যে এই দুটো শব্দ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। এরিস্টটলের কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থায় জন্ম-পরিচয় ও পৈতৃক বিত্ত-বৈভবের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ওপরে, অর্থাৎ জোর পড়েছিল ক্রম-বর্ধমান 'সমতার' প্রতি। সেই সমতা শুধু 'নাগরিক সমতা' বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমান 'ভোটাধিকারের সমতা', এক কথায়, পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। যদি নির্বাচনী গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পাশাপাশি চলতে থাকে তবে তাকে এরিস্টটলীয় অর্থে গণতন্ত্র বলা যায় না। আবারো শেল্ডন ওউলিন-র লেখাতে ফিরে যেতে হয় এজন্যে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই

অধ্যাপক বলেছেন:

'For whatever else one may want to say about free market capitalism, it is definitely not an arrangement for producing equality... In the United States evidence is substantial that various inequalities are increasing, especially along racial lines. It follows that contemporary democracy contradicts Aristotle's fundamental principle for identifying the distributive character of a democratic politeia, that each citizen should be on an equality with the rest.'

এরিস্টটলের কথা বাদ দিলাম, এখন যা হচ্ছে তার সাথে সপ্তদশ থেকে উনিশ শতক অবধি গণতন্ত্রের যে ধ্যান-ধারণাগুলো আমরা জেনে আসছি তা কি বড্ড বেমানান ঠেকছে না? সাম্প্রতিকের গণতন্ত্র ও প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক ধারণাগত প্রভেদ ঘটেছে তা-ই নয়, 'আধুনিক যুগের' গোড়ার পর্বে (অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লব যখন সংঘটিত হচ্ছিল ইউরোপে) তার সাথেও একটা বড় আকারের ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন গণতন্ত্র, আধুনিক গণতন্ত্র ও সাম্প্রতিকের গণতন্ত্র– এই তিন আমলের গণতন্ত্র পাশাপাশি সাজালে আমরা দেখতে পাব যে অনেকভাবেই সাম্প্রতিকের গণতন্ত্র তার আদি-প্রতিশ্রুতির তুলনায় ফিকে হয়ে আসছে। 'পূর্ণ গণতন্ত্রের' দিকে যাত্রা না করে বরং আরো অপূর্ণ, আরো অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে প্রায় গোটা বিশ্ব। 'আধুনিক যুগের' গোড়ার পর্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল মোটামুটি প্রায় একশো বছর ধরে। ইংলন্ডে ১৬৮৮ সালের বিপ্লব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৭৬ সালের বিপ্লব ও ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের বিপ্লব মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। যাকে মার্কস বলেছেন, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' তার সূত্রপাত এই একশো বছরেই। সপ্তদশ শতকেই আমরা প্রথম শুনতে পাই 'vox populi, vox Dei'– 'জনগণের কণ্ঠস্বর হচ্ছে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর'। উপরোক্ত তিনটি বিপ্লবের সময়ে প্রকাশিত হয় অসংখ্য জনবোধ্য প্রচার-পুস্তিকা, সংবাদ-পত্র, প্যামফ্লেট– ইশতেহার যার মাধ্যমে জনতার স্বর পশ্চিম ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোয় অপ্রতিরোধ্যভাবে বেজে উঠতে থাকে। এই স্বর আগেও ছিলো, এথেনীয় বা রোমান গণতন্ত্রের সীমিত চর্চাতেও ছিলো। আমরা কি শুনিনি সিসেরোকে তার De Republica-তে বলতে জনগণের কণ্ঠস্বরের তাৎপর্যের কথা? সিসেরোর কাছে 'সক্রেটিস' ছিলেন 'সিপিও আফ্রিকানাস' (Scipio Africanus) বলে এক মহর্ষি। সেখানে Civitas সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলাপ রয়েছে, যার মূল কথা হলো– 'সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জনগণের শক্তি' (the power of the people is the greatest)। গণতন্ত্রের সপক্ষে বলতে গিয়ে সিপিও আফ্রিকানাস বলছেন, 'only the res populi deserves to be called a res publica'। সিপিও আফ্রিকানাস কে ছিলেন তা আমরা জানি না, তবে তিনি যে সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন তা মনে হয় না। অন্তত তার ভাবিষ্যৎ সিসেরোর চোখে। তবে এটা ঠিক সিসেরোর সাক্ষ্য সত্ত্বেও জনগণের কণ্ঠস্বর সে আমলে তেমন রাজনৈতিক মর্যাদা পায়নি। যেটা পেয়েছে ১৬৮৮-১৭৮৯ কালপর্বে ইউরোপ-আমেরিকায় তিন তিনটা বিপ্লব সংঘটন

কালে। সেই কণ্ঠস্বর সাম্প্রতিকের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে– কী মূল্যবোধে, কী চর্চায়, কী পরিসরে– ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছে! নানাভাবে ও কারণে যেন দেশে দেশে গণতন্ত্র পিছু হটে যাচ্ছে। এরিস্টটল বা সিসেরো, টোকভিল অথবা মিল এই পিছু-হটা দেখলে হয়তো আঁতকে উঠতেন।

৩. পিছু-হটার আগের অবস্থা

পিছু-হটার কাল নির্ণয় নিয়ে একটা সংশয় আগে-ভাগেই উত্থাপন করা দরকার। ১৬৮৮-১৭৮৯ কালপর্বে উপরোক্ত তিনটি বিপ্লবের মাধ্যমে প্রাচীন এথেনীয় বা রোমক গণতন্ত্রের ধারণা আরো গভীর হলো ঠিকই, কিন্তু সমগ্র উনিশ শতকের বিদ্যমান রাজনৈতিক চর্চায় তার কতটা ছাপ পড়েছিল? ইডিয়মে কিছু পরিবর্তন এলো, কিন্তু কার্যত কি ফ্রান্স, আমেরিকা বা ইংলন্ড এই তিন দেশে আরাধ্য গণতন্ত্র এলো? এর সোজা-সাপ্টা উত্তর হলো– না, সেভাবে আসেনি। এরিস্টটলীয় অর্থে তো নয়ই, এমনকি ১৬৮৮-১৭৮৯ কালপর্বের 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' মূল্যবোধের অর্থেও উনিশ শতকের ইউরোপ বা আমেরিকাকে 'গণতান্ত্রিক' বলা যায় না। এমনকি রাজনৈতিক সমতার নিরিখেও। পূর্বে-বর্ণিত তিনটি বিপ্লবের অবজেকটিভ মর্মবস্তু 'গণতান্ত্রিক' বলে দাবি করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে বা কার্যত আমরা যা দেখি তাহলো আধিপত্যবাদের জয়যাত্রা। একধরনের 'কালচার অব ডেসপটিজম' আরো বেশি শক্ত হয়ে জেঁকে বসে ইউরোপে। তবে মধ্যযুগ ও পরের ডেসপটিজমের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিলো। মধ্যযুগের ডেসপট বা স্বৈরশাসকেরা অত্যাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন (ইংরেজিতে যাকে বলে Tyrant)। Tyrant এই অর্থে যে তারা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করতেন, খেয়াল-খুশি মতো শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, সমাজের প্রচলিত প্রথা বা আইন-কানুনের ধার ধারতেন না। আঠারো-উনিশ শতকের শাসকেরা সে তুলনায় ছিলেন 'আলোকিত স্বৈরশাসক'– এখানে স্বৈরশাসনের সাথে বিজ্ঞান, 'এনলাইটেনমেন্ট', উপনিবেশে 'সিভিলাইজিং মিশন' পরিচালনা, শিল্প-বিপ্লব প্রভৃতি উপাদান যুক্ত হয়েছিল। এই উদাহরণ বিশ্ব-ইতিহাসে আগের জমানাতেও ছিলো। উদাহরণ হিসেবে সম্রাট অশোককে আমরা 'এনলাইটেনড ডেসপট' বলতে পারি; আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শাসকদেরকে (আল-মামুন, হারুনুর রশীদ প্রমুখ) এই দলে ফেলা যায়; মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিপতিও (বাবরনামার লেখক বাবর, হুমায়ূন, আকবর, শাজাহান প্রমুখ) এই ধারায় পড়বেন। তুরস্কের ওটোমান সাম্রাজ্যের কনস্তানটিনপল বিজয়ী সুলতান মাহমুদ (Mehmet II) বহু ভাষাবিদ ছিলেন; আরবী, ফার্সী, গ্রীক, ল্যাটিন, স্লাভিক ইত্যাদি ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন; সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তাকেও এই দলে ফেলতে পারি। জেনারেল নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ভিক্টোরিয়ান ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়া, জার্মানীর বিসমার্ক–এরাও এই 'আলোকিত স্বৈরশাসকদের' দলে। রাশিয়ার আইভান দ্য টেরিবল যদি অত্যাচারী (Tyrant) হয়ে থাকেন, পিটার দ্য গ্রেট পড়বেন আলোকপ্রাপ্তদের সারিতে। এই তালিকা আরো দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। কিন্তু

আমার বলার কথা এই যে, উনিশ শতকের রাজনৈতিক ব্যবস্থা খোদ ইউরোপেই পুরোপুরি 'গণতান্ত্রিক' ছিলো না তিন তিনটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সত্ত্বেও। তবে এসব নতুন যুগের স্বৈরশাসকেরা নিজ নিজ দেশে 'আধুনিকতা' আনার চেষ্টা করেছিলেন; বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে সাগ্রহে বরণ করেছিলেন; একধরনের বিজ্ঞান-মনস্কতা বা 'কালচার অব র‍্যাশনালিটি'-র চর্চাকে উৎসাহিত করেছিলেন সীমিত আকারে হলেও। অবশ্য অস্ত্র শাস্ত্রেরও উন্নতি ঘটানো হচ্ছিল, আর নতুন নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা বা উপনিবেশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই তো চলছিলই। এক্ষেত্রে অনালোকিত আলোকিত সব স্বৈরশাসকরাই এককাট্টা। এমনকি সেকালের রাজনৈতিক তত্ত্বও এর বিরোধিতা করেনি। অষ্টাদশ শতকে কনদোরসে (Condorcet) GB 'Tyranny of Reason'-র মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। যেমন, তিনি লক্ষ্য করেন যে, 'Virtually every thinker who accepted [early 17th Century] mechanistic physics claimed that material bodies followed laws imposed on the world much as good citizens followed laws imposed on society'। ফিজিওক্র্যাটরা এনলাইটেনড ডেসপটিজমের পক্ষে ছিলেন, যেমন ছিলেন ব্রিটিশ ইউটিলিটারিয়ানরা। জেরেমি বেন্থাম এর গুণগান গেয়ে গেছেন– তিনি আলোকিত দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে জেলখানাকে 'আধুনিক' করার জন্য 'পেনপ্টিকন' (Panopticon) ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন (যা এখন বিশ্বজোড়া 'সারভেইল্যান্স' সিস্টেমে উন্নীত হয়েছে)। ফ্রান্সিস বেকনের শিষ্য টমাস হবস জ্যামিতির সাধনা করতে গিয়ে এক নতুন ধরনের ডেসপটিজমের ধারণায় পৌঁছান যার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবকল্যাণ। তার লেভিয়াথান (Leviathan) এরই পরিণতি। মধ্যযুগে রাজশক্তির মূলে ছিলো এক-ঈশ্বরের প্রতি অবিচল আস্থা; হবসের কাছে নিরংকুশ রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের পেছনে রয়েছে 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের' প্রেরণা। বেকনের 'knowledge is for the sake of power' স্লোগানটিকে তিনি তত্ত্বগতভাবে আরো সম্প্রসারিত করেন। বস্তুত তিনিই প্রথম আধুনিক তাত্ত্বিক যিনি ইউরোপের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে 'ডেসপটিক' শব্দটিকে গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন। আমার ধারণা, তার লেভিয়াথান রূপকল্পটি পরবর্তীতে স্ট্যালিনীয় সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্র-চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। শুধু হবস, বেন্থাম নন, মিলও (পিতা-পুত্র দুজনেই) প্রকৃত পক্ষে 'এনলাইটেনড ডেসপটিজম' ধারণায় বিশ্বাস করতেন। অর্থশাস্ত্রের ইউটিলিটারিয়ান তত্ত্বের সাথে ('গ্রেটেস্ট গুড ফর দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার') রাষ্ট্রচিন্তার এনলাইটেনড ডেসপটিজমের তত্ত্ব দিব্যি হাত ধরাধরি করে চলেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে। জেমস মিল তার বন্ধু বেন্থামের মতো একই ধারণায় অবিচল ছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাবশালী নীতি-নির্মাতা হিসেবে যুক্তি দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে একটি 'আলোকিত স্বৈরাচারী' শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে। অবশ্য প্রশ্ন উঠবে, পুত্র জন স্টুয়ার্ট তো রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট, লিবার্টি ও নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে লিখে গেছেন। সেক্ষেত্রে তাকে 'এনলাইটেন্ড ডেসপটিজমের' দলে ফেলা কতটা যুক্তিযুক্ত? এর সহজ উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সারাজীবন তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে প্রভাবশীল অবস্থানে থেকে চাকুরি করে গেছেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরিতে তার সক্রিয় হাতের

ছোঁয়া ছিলো। তিনি সত্যই বিশ্বাস করতেন, 'ভারতবাসী স্বাধীন হওয়ার জন্য এখনো তৈরি নয়'। তারা 'আধা-বর্বর' স্তরে বাস করছে (আফ্রিকাবাসীরা অবশ্য 'বর্বরতমদের স্তরে' বা স্যাভেজ-পর্যায়ে)। স্ব-শাসনের জন্য তাদের বহুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে– লিবার্টি ও রিপ্রেজেন্টেটিভনেস তো আরো পরের কথা। এমনকি খোদ নিজের দেশ ইংলন্ডেও সবাইকে ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন তিনি সেই পূর্বে-কথিত এরিস্টটলীয় যুক্তিতেই। 'শিক্ষিত গণতন্ত্রের' পূর্বশর্ত ১৮৬০-র দশকে ইংলন্ডে বা ইউরোপে কোথাও নেই– এ-ই ছিলো তার মত। এসব কথা যখন লিখছেন তখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ সবে সমাপ্ত হয়েছে। কালো মানুষেরা দাসপ্রথা থেকে আইনত মুক্তি পেলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পেতে তাদের এখনো অনেক দেরি।

এক কথায়, বিশ শতকে যখন পৃথিবী প্রবেশ করেছে, তখন ইউরোপ, আমেরিকা বা উপনিবেশসমূহে (তত্ত্বে থাকলেও) বাস্তবে প্রায় কোথাও পূর্ণ গণতন্ত্র বা ন্যূন পক্ষে লিবারেল ডেমোক্রেসি নেই। কিছু দেশে ততদিনে নির্বাচনী ব্যবস্থার গণতন্ত্র (ইলেকটোরাল ডেমোক্রেসি) এসেছিল বটে, কিন্তু তা খুবই সীমিত পরিসরে। বিত্তহীনদের, নারীদের, সংখ্যালঘুদের– কারো সেখানে ভোট দেওয়ারও ন্যূনতম অধিকার ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের পিছু-হটা নিয়ে যে তর্ক উঠেছে তার মানে কী দাঁড়ায়?

৪. পিছু-হটার মানে

পিছু-হটা বা 'ডেমোক্রেটিক রিসেশন' (democratic recession) শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যারি ডায়মন্ড। ২০০৮ সালে এই নামেই একটি প্রবন্ধ লিখেন তিনি 'ফরেন এফেয়ার্স' সাময়িকীতে। প্রবন্ধটির নাম ছিলো 'দ্য ডেমোক্রেটিক রোলব্যাক: দ্য রিসারজেন্স অব দ্য প্রিডেটরি স্টেট'। এর দ্বিতীয় স্তবকে তিনি লিখলেন: 'But celebrations of democracy's triumph are premature. In a few short years, the democratic wave has been slowed by a powerful authoritarian undertow, and the world has slipped into a democratic recession'। সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের জয় হচ্ছে এবং গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে এরকম আশাবাদী কথা ৯০-র দশকে অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে। ৮০-র দশকে লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে সামরিক একনায়কের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সরকারের অভ্যুদয় ঘটছিল। এটাও 'গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে' তত্ত্বটি প্রচারে সহায়তা করে থাকবে। কিন্তু না। ল্যারি ডায়মন্ড বললেন, গণতন্ত্রের রথ সামনের দিকে চলার পরিবর্তে বরং পেছন দিকে ছুটছে। ডেমোক্রেটিক ওয়েভ-এর পরিবর্তে চলে এসেছে ডেমোক্রেটিক রিসেশন।

গণতন্ত্রের ঢল বা 'ডেমোক্রেটিক ওয়েভ' শব্দটি এর আগে ল্যারি ডায়মন্ড ও ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার গুরু স্যামুয়েল হান্টিংটন কর্তৃক উদ্ভাবিত। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হান্টিংটন দুই কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। একটি হলো, ১৯৯৩ সালের সভ্যতার সংঘাত (clash of civilization) তত্ত্ব; আরেকটি হলো ১৯৯১ সালের 'তৃতীয় ঢেউ' (Third Wave)-এর তত্ত্ব। সভ্যতার সংঘাত নিয়ে নতুন করে এখানে বলার কিছু নেই। পশ্চিমের রক্ষণশীল ডানপন্থীদের কাছে এই তত্ত্ব (এখনো) খুবই জনপ্রিয়। পাশ্চাত্যের (খ্রিষ্টান) সভ্যতার সাথে প্রাচ্যের (মুসলিম) সভ্যতার লড়াই, এককথায় আত্মসত্তার পরিচয়ের লড়াই বা আইডিনটিটি-র সংঘাত আর সব সামাজিক শ্রেণিগত ও বর্ণগত লড়াইকে কালক্রমে ছাপিয়ে যাবে– এই ছিলো হান্টিংটনের ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যদিকে, তার তৃতীয় ঢলের তত্ত্ব সোভিয়েত পতনের ঠিক আগে আগে নির্মিত হয়। প্রতিপাদ্যটি নিম্নরূপ।

'ঢেউ' এই শব্দটি থেকেই বুঝা যায় যে হান্টিংটন বলছেন যে, এটি কোন চিরস্থায়ী দশা নয়। আজ যে দেশ অ-গণতন্ত্রের মধ্যে আছে সেটি কাল গণতন্ত্রের পর্যায়ে চলে যেত পারে; অথবা, আজ যেটি গণতন্ত্র, আগামীকাল তাতে দেখা দিতে পারে অগণতান্ত্রিকতার লক্ষণ। হান্টিংটন তার 'তৃতীয় ঢেউ' বইয়ে গণতান্ত্রিক ঢেউকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন: 'a group of transitions from nondemocratic to democratic regimes that occur within a specified period of time and that significantly outnumber transitions in the opposite directions during that period of time'। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট কালপর্বে যখন অ-গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটা দেশের সংখ্যা বিপরীত মুখী প্রবণতা সম্পন্ন দেশের সংখ্যাকে লক্ষ্যনীয়ভাবে ছাড়িয়ে যায় তখনই আমরা 'গণতন্ত্রের ঢেউ' দেখতে পাই। হান্টিংটন ইতিহাসে এরকম তিনটি গণতন্ত্রের পক্ষে ঢেউ খুঁজে পেয়েছিলেন। 'প্রথম ঢেউটির' (১৮২৮-১৯২৬) শুরু হয় প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদেরকে 'ভোটাধিকার' দেওয়ার মাধ্যমে। এর পর এই অধিকার ক্রমশ দেয়া হয় ফ্রান্স, ইংলন্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইটালী ও আর্জেন্টিনায়। ১৯১৮ সাল নাগাদ রুশ, জার্মান, অস্ট্রিয়ান ও ওটোমান সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যায় তখন সারা বিশ্বে 'গণতান্ত্রিক' দেশের সংখ্যা ছিলো ২৯। বিশের দশকে এসে এদের মধ্যকার বেশ কিছু দেশে আবার গণতন্ত্র পিছু হটতে থাকে। রাশিয়া, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশ ক্রমশ আধিপত্যবাদী (Authoritarian), অ-গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে বেছে নেয়। ১৯৪২ সাল নাগাদ বিশ্বে গণতন্ত্রের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১২। 'দ্বিতীয় ঢেউটির' (১৯৪৫-১৯৬২) শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই; এই প্রবণতা বাড়তে থাকায় ১৯৬২ সাল নাগাদ বিশ্বে 'গণতান্ত্রিক' দেশের সংখ্যা ৩৬-এ পৌঁছায়। এর পর থেকে অবশ্য বেশ কিছু দেশে আবার গণতন্ত্র পিছু হটতে শুরু করে, এবং সত্তর দশকের শুরুতে উপরোক্ত সংখ্যা কমে ৩০-এ নেমে যায়। ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু হয় এক বিশাল আকৃতির 'তৃতীয় ঢেউ' (১৯৭৪-২০০৫)– পর্তুগালে সামরিক শাসনের বিদায়ের মধ্য দিয়ে এর সূচনা। এই ঢেউটি গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে জোরালো ছিলো– অন্তত সংখ্যার দিক থেকে। এই পর্যায়ের শেষে– ২০০৫ সাল নাগাদ– বিশ্ব জোড়া 'গণতান্ত্রিক' দেশের সংখ্যা বেড়ে ১১৬-এ উন্নীত হয়। এই তৃতীয় ঢেউয়ের পক্ষের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ১৯৮০ সালের লাতিন

আমেরিকার অনেক দেশে সামরিকতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ; ১৯৮৬-৮৮ কালপর্বে ফিলিপাইনস, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে গণতন্ত্রের শাসনের প্রতিষ্ঠা; সোভিয়েত পতনের পরে ৯০-র দশকে পূর্ব ইউরোপ ও আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার উদ্ভব। গণতন্ত্রের গতিশীলতা সবচেয়ে বেগবান হয়েছিল লাতিন আমেরিকায়। উদাহরণত, ১৯৭৮ সালে লাতিন মহাদেশে গণতান্ত্রিক দেশ ছিলো মাত্র ৩টি (কলম্বিয়া, কোস্টা রিকা ও ভেনেজুয়েলা); পক্ষান্তরে ১৯৯৫ সালে ঐ মহাদেশে অ-গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ২টিতে (কিউবা ও হাইতি)।

স্যামুয়েল হান্টিংটনের এই কাল বিন্যাস নিয়ে তিনটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, গণতান্ত্রিক ঢল নির্ণয়ে খুবই সংকীর্ণ ধারণাকে আশ্রয় করেছেন তিনি। কাল-বিভাজনের ক্ষেত্রে 'ভোটের অধিকার'-এর সূচককেই তিনি প্রধান বিবেচনা করেছেন। এবং এক্ষেত্রে তার মূল বিবেচ্য ছিলো শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার। যদি নারীদের ভোটাধিকার বিবেচনায় নেয়া হয়, তাহলে 'প্রথম' বা 'দ্বিতীয় ঢেউ' কোনো পর্যায়কেই আর আলাদা করে সনাক্ত করা যাবে না। যেমন, সুইজারল্যান্ডকে প্রথম ঢলের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু কেবল মাত্র ১৯৭১ সালে এসেই সুইস নারীরা ভোটাধিকার পায়। প্রথম ঢেউয়ের প্রথমেই বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কথা। কিন্তু ১৯১৯ (বা র‍্যাটিফিকেশন ধরলে ১৯২০) সালের আগে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিলো না। আর যদি অ-শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর অধিকার বিবেচনায় নেয়া হতো, তাহলে ঢেউ খুঁজে পাওয়া আরো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। বলে রাখা দরকার, কেবল মাত্র ১৯৬৫ সালে এসে আমেরিকার অ-শ্বেতাঙ্গ নারীরা সরকারিভাবে ভোটের অধিকার পায়। এর আগে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী ১৮৭০ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী বলে যদিও কালো মানুষদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা কেবল প্রযোজ্য ছিলো কালো পুরুষ মানুষদের ক্ষেত্রেই। শেষোক্তরা আপাত দৃষ্টিতে ভোটাধিকার পেলেও কালো পুরুষদের সকলে এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারত না। অনেকটা এরিস্টটলের 'শিক্ষিত গণতন্ত্র' ও জন স্টুয়ার্ট মিলের 'মাধ্যমিক-পাশের' মানদণ্ডের অনুবর্তী হয়েই ১৮৭৬ সালের মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ('ইউনাইটেড স্টেটস বনাম রিজ' মামলা, ১৮৭৬) রায়ে ভোট প্রয়োগের পূর্বশর্ত হিসেবে 'লিটারেসি টেস্ট'-এর পূর্বাপর ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখা হয়। যদিও এই 'টেস্ট' সাদা-কালো সকল বর্ণের পুরুষ মানুষের জন্যই প্রযোজ্য ছিলো, কিন্তু কালো মানুষেরা আর্থ-সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর থাকার কারণে অধিকাংশ রাজ্যেই (বিশেষত আমেরিকার দক্ষিণের একদা দাস-প্রথার স্টেট-গুলোয়) ভোট দিতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, হান্টিংটনের 'সংকীর্ণ' ভোটাধিকার সূচকে একথা স্পষ্ট হয় যে গণতন্ত্রের পক্ষে একটি জোয়ার এসেছিল 'তৃতীয় ঢেউ'-এর কালে। সারা বিশ্বে মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫, তার মধ্যে ল্যারি ডায়মন্ডের হিসেব অনুযায়ী ২০০৫ সালে 'গণতান্ত্রিক' দেশের সংখ্যা ছিলো ১১৬। কিন্তু যদি জনসংখ্যাকে গুরুত্বের সাথে বিচার করি, তাহলে বিশ্ববাসীর মধ্যে 'গণতান্ত্রিক' দেশের অনুপাত প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবে। আর

যদি সংকীর্ণ ভোটাধিকারের সূচকের বাইরে গণতন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাই তাহলে গণতন্ত্রের ঢেউ আর ঢেউ থাকে না। সেটা বরং ঢেউ নয়, এক বদ্ধ জলায় ঢিল এসে পড়ার পর সাময়িক যে-আন্দোলন সৃষ্টি হয় তার সাথেই তা বরং তুলনীয়। যেমন, নিজের দেশে 'গণতন্ত্র' রেখে অন্য দেশকে উপনিবেশে পরিণত করে বা অগণতান্ত্রিক প্রভাব-বলয়ের মধ্যে অন্য দেশের স্বাধীন বিকাশকে রুদ্ধ করলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদি-প্রতিশ্রুতি মেনে চলা হয় কি? যদি না হয়, তবে 'প্রথম ঢেউ'-এর প্রায় কোন দেশই (যাদের প্রতিটিরই ছিলো নানা মহাদেশে একাধিক উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ) কি আদৌ গণতন্ত্রের পর্যায় ভুক্ত হতে পারে? বা সেই সারিতে তাদের (অভ্যন্তরীণ ভোটাধিকারের কারণে) ফেললেও সেই গণতন্ত্রকে পূর্ণ বা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বলা যায় কি? আর যদি 'মিশ্র গণতন্ত্র' হিসেবেই এই গণতান্ত্রিক ঢেউয়ের দেশগুলোকে দেখি, তাহলে এটাও তো স্পষ্ট করা দরকার– এই মিশ্রণের মধ্যে কত ভাগ গণতন্ত্র, আর কত ভাগ অ-গণতন্ত্র মিলে-মিশে আছে? কথাটা কষ্ট কল্পনা বলে মনে হতে পারে। যেহেতু হান্টিংটন বা তার ভাবশিষ্য ল্যারি ডায়মন্ডরা 'সংখ্যাতাত্ত্বিক' ভাবেই গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী, সেহেতু গণতন্ত্র এবং অ-গণতন্ত্র এই দুটি উপাদানের তুলনামূলক গুরুত্ব (Weight) কতটা এইসব তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' দেশে সেটাও পরিসংখ্যানগত ভাবে তুলে ধরা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় বৈকি। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করব যে হান্টিংটন তার শ্রেণিবিন্যাসে 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' ও 'লিবারেল ডেমোক্রেসি'– এ দুই মৌলিকভাবে ভিন্ন ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। যেমন, বর্তমান বিশ্বে (২০১৭ সালের পরিসংখ্যান) ১১৪ থেকে ১১৯টি দেশে কোন-না-কোন ধরণের 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' রয়েছে, কিন্তু এদের খুব অল্প সংখ্যকের মধ্যেই লিবারেল গণতন্ত্রের চর্চা দেখা যায়।

তৃতীয়ত, হান্টিংটনের ঢেউ-এর হিসাবে কতগুলো দেশ অ-গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের দিকে এগুচ্ছে, আর কতগুলো দেশে অ-গণতান্ত্রিকতা জয়যুক্ত হচ্ছে– এই দুই প্রবণতাকে তুলনা করা হয়। যখন গণতন্ত্রের দিকে পাল্লা ভারী হয় তখনই ঢেউ-এর লক্ষণ দেখা দেয়। এধরনের আলোচনা থেকে এটা অনুমান করা চলে যে হান্টিংটন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা যেমন, তেমনি গণতন্ত্রের 'পশ্চাৎগমনকেও' তার বিশ্লেষণী কাঠামোর কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন। তবে পিছু-হটার কার্য-কারণ, মাত্রা বা সূচক তিনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেননি। পভার্টি ডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে যেমন, ডেমোক্রেসি ডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রার কারণ ও পিছু-হটার কারণ একই সমস্যার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সূত্রে বাঁধা না-ও হতে পারে। পভার্টির ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, 'Ascent is not the mirror image of the Descent'; এটি গণতন্ত্রের পিছু-হটার জন্যও প্রযোজ্য। এই কাজটিই করতে এগিয়ে আসেন ল্যারি ডায়মন্ড, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, স্টিভেন লেভিটস্কি, ডানিয়েল জিবলাত, ডেভিড রানসিমেন, টিমোথি স্নাইডার, এডোওয়ার্ড লুচে, লিজ ফেকেতে প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সম্প্রতি এই বিশ্লেষণে যোগ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদেরাও– ডেরেন আসেমগলু ও জিম রবিনসনের পরে ডানি রডরিক। 'পিছু-হটা' সম্পর্কীত এই লিটারেচার ইতিমধ্যেই বেশ বিস্তৃত ও নানা মাত্রার বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ (এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন প্রবন্ধ বা বই যোগ হচ্ছে এতে)। আমি সংক্ষেপে এর মূল বক্তব্য তুলে ধরেছি।

ল্যারি ডায়মন্ড যখন ২০০৮ সালে তার পূর্বে উল্লেখিত 'ডেমোক্রেটিক রোল-ব্যাক' প্রবন্ধে গণতন্ত্রের পিছু-হটার প্রসংগ তুলে ধরেন তখন তিনি এরিস্টটলের, টোকভিলের বা জন স্টুয়ার্ট মিলের সম্ভাব্য বা আদর্শ গণতন্ত্রের রূপরেখার সাথে সাম্প্রতিকের গণতন্ত্রের তুলনা করেননি। অথবা তিনি পিছু-হটাকে অষ্টাদশ-উনিশ শতকের 'গণতন্ত্রের' সাথেও তুলনা করেননি। কেননা, তিনি ভালো করেই জানতেন যে হান্টিংটনের প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের বেশির ভাগ দেশেই 'আধুনিক' অর্থে গণতন্ত্র ছিলো না। যাকে বলতে পারি 'ইউটিলিটারিয়ান ইল-লিবারেলিজম' (Utilitarian Illiberalism) তার মধ্যে বেন্থাম, মিলের মতো মনীষীরাও যে পড়েন সেটাও তিনি জানতেন। বহুকাল পর্যন্ত 'এনলাইটেন্ড ডেসপটিজম' ইউরোপের রাষ্ট্র-চিন্তায় এক প্রাধান্যশীল ধারণা হিসেবে বিরাজ করেছে তা তার অজানা ছিলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের (হান্টিংটন কথিত 'দ্বিতীয় ঢেউ') দুই দশকে নতুন করে যেসব দেশ গণতন্ত্রের সারিতে নাম লেখায়, তাদের বেশির ভাগই ছিলো বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন দেশ। এখানে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজ করছিল 'জাতি-রাষ্ট্র' নির্মাণের সমস্যা। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানাদির নির্মাণ ছিলো আরো পরের কাজের মধ্যে– করণীয় তালিকার অনেক নীচে। ফলে 'জাতি-গঠন' বনাম 'গণতন্ত্র' এই দ্বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রত্যাশিত চেহারা দেখা যায়নি তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশেই। তাহলে ল্যারি ডায়মন্ডরা যে পিছু-হটার কথা বলছেন, সেটা কোন গণতন্ত্রের পিছু-হটা, এবং কোন অর্থে পিছু হটা?

২০০৮ সালের উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটিতে ল্যারি ডায়মন্ড গণতন্ত্রের পিছু-হটার প্রসংগটি তুলেছিলেন স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'তৃতীয় ঢেউ'-এর প্রেক্ষিতে। গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা হান্টিংটন গত শতকের ৭০ দশক থেকে ৯০ দশক জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই আশাবাদী উচ্ছাসকে ২০০০ সালের পর প্রথম দশকে (এবং দ্বিতীয় দশকে) ক্রমশ নির্বাপিত হতে দেখে তিনি 'ডেমোক্রেটিক রিসেশন' টার্মটি উদ্ভাবন করেছিলেন। যেটা ২০০৮ সালের দিকে ছিলো 'রিসেশন' (recession), সেটা ১০-র দশকে এসে পরিণত হয়েছে 'ব্যাক স্লাইডিং' (back sliding) ধারণায়। প্রথম দিকে কেবল সদ্য গণতন্ত্রে আসা দেশগুলোয় গণতন্ত্রের পিছু-হটার সমস্যা আলোচিত হলেও পরের দিকে মাঝারী ও উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলোতেও এই প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। এক অর্থে, আমরা বলতে পারি যে ২০০০-র প্রথম দশকের শেষে এসে দুটি ভিন্ন ধারার 'রিসেশন' এক মোহনায় এসে মিশেছিল। এর একটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (২০০৭/০৮ সালের 'ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস' রূপে যা পরিচিত); আর আরেকটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক মন্দা যা ২০০৬ সালের পর থেকে গণতন্ত্রের পিছু-হটা রূপে অভিহিত হয়ে আসছে। এই শেষের মন্দায় আক্রান্ত 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলোর সংখ্যা কতগুলো? ল্যারি ডায়মন্ড ২০১৫ সালে জার্নাল অব ডেমোক্রেসি-র একটি প্রবন্ধে এর একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব দেন। তার দৃষ্টিতে চারটি নিরিখে এই 'পিছু-হটাকে' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, অনেকগুলো একদা-গণতন্ত্রের দেশে গণতন্ত্র ভেঙে পড়ছে। ১৯৭৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ২৯ শতাংশ গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র 'ভেঙে পড়ছে' (democratic breakdown)। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৩৫ শতাংশ। এই 'ভেঙে পড়ার হার' প্রতি

দশকেই বাড়ছে: ১৯৮৪-৯৩ পর্বে ছিলো এটা ৮ শতাংশ; ১৯৯৪- ২০০৩ পর্বে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ শতাংশে; আর সম্প্রতি কালে ২০০৩-১৬ পর্বে উন্নীত হয়েছে ১৬ শতাংশে। এই 'ভেঙে পড়ার' পেছনে ক্যু-জাতীয় ঘটনা যেমন আছে, তেমনি আছে গণতান্ত্রিক অধিকার বা বিধি-ব্যবস্থার ক্রমাবনতি। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের গুণাবলী (বা গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব-কাল) কমে যাচ্ছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইমার্জিং-মার্কেট ইকনমিতে (ভারত, থাইল্যান্ড, ইউক্রেন, জর্জিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী)। তৃতীয়ত, নিরাপত্তা স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু দেশে 'আধিপত্যবাদী' (authoritarian) প্রবণতা গভীরতর হচ্ছে (এর মধ্যে পড়বে রাশিয়া ও তুরস্ক)। চতুর্থত, প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশে– যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে– গণতন্ত্র আর তেমন দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে না। বহির্বিশ্বে নির্ভরযোগ্যতার সাথে গণতন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার মতো ইচ্ছা, মনোবল ও সামর্থ্য উন্নত দেশগুলো হারিয়ে ফেলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রেক্সিটের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে স্বল্প-মেয়াদী অর্থনৈতিক সুবিধে পাওয়ার ইচ্ছে ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে 'জাতীয়তাবাদী' উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইউরোপের সদস্য- রাষ্ট্র হয়ে ব্রিটেন নিজের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ব্রাসেলস্-এর কাছে খাটো করতে দিতে রাজি নয়।

এই বিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন করা চলে। এতে পিছু-হটার ঘটনা বুঝার জন্য যে বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর দরকার তার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনী গণতন্ত্রের পিছু-হটা, নাকি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (Liberal Democracy) পিছু-হটা অথবা উভয়েরই পিছু-হটা এই জরুরি প্রশ্নটিও উত্থাপন করা হয়নি। আমার বিবেচনায়, এরকম একটি কাঠামোর সন্ধান করা খুবই প্রয়োজন। মার্কস বলেছিলেন, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। এটি যেমন আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে, তেমনি এটাও ভাবতে হবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দাবি আজ আর কেবল একটি অর্থনৈতিক শ্রেণির স্বার্থ-রক্ষার দাবি নয়। এর মধ্যে সকল মানুষ রাষ্ট্রজীবনে তার অংশগ্রহণকে, স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্বাহের অধিকারকে রাজনৈতিকভাবে ব্যক্ত করতে চায়, তা সেই ইচ্ছা যতই অসংস্কৃত শোনাক্ না কেন। যেমনটা Pseudo Xenophon-র ভাষ্যে আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। এসব বিচার করে ডানি রডরিকের বিশ্লেষণ কাঠামোকে আমার প্রচলিত কাঠামোগুলোর মধ্যে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। শুধু এর সাথে আমি 'সুষম ভাবে' বিকাশের ধারণাকে যুক্ত করেছি এরিস্টটল ও মার্কসের ক্রিটিককে মনে রেখে।

রডরিকের প্রস্তাবটি নিম্নরূপ– তার মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে তিন ধরনের রাজনৈতিক অধিকারকে রক্ষা করার বিষয়। প্রথমটি হচ্ছে, সম্পত্তির অধিকারসমূহ (Property Rights) যা মূলত এলিটদের রাজনৈতিক দাবি; দ্বিতীয়টি হচ্ছে নির্বাচনী গণতন্ত্রের বা ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির 'রাজনৈতিক অধিকারসমূহ' (Political Rights) যা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বা অবস্থানের স্বার্থ সংরক্ষণ করে; এবং তৃতীয়টি হচ্ছে 'নাগরিক অধিকারসমূহ' (Civil Rights)। এই শেষোক্তটি হচ্ছে লিবারেল ডেমোক্রেসির প্রকৃত ধারক ও বাহক। লিবারেল ডেমোক্রেসিতে অন্য দুই অধিকারও থাকে, কিন্তু যে গণতন্ত্রে সিভিল রাইটস নেই, সেই গণতন্ত্রে উদারনৈতিকতা নেই।

আর ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে উদারনৈতিকতা না থাকলে গণতন্ত্র অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব ধারণায় পর্যবসিত হয়। নাগরিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে এটি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল সামাজিক গ্রুপ, বর্গ বা ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করে। রাষ্ট্র এইসব সামাজিক 'মার্কার'-এর ওপরে ভিত্তি করে কোন বঞ্চনামূলক নীতি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে 'এক মানুষ এক ভোট' ব্যবস্থার অধীনে সংখ্যাগরিষ্ঠর মত ভোটে জয়ী হয়। কিন্তু সিভিল রাইটস-এর ক্ষেত্রে কোন জয়-পরাজয় নেই– সেখানে সকল মত ও সকল পক্ষেরই সমান অধিকার, সমান গুরুত্ব ও সমান মর্যাদা, এবং সেই অর্থে সেখানে সকলেই জয়ী, নিজের নিজের জায়গায় সবাই রাজা। বলা দরকার ঐতিহাসিকভাবে সিভিল রাইটস-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সব ধরনের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। কোন দেশের নাগরিক অধিকার কতটা তা বিচার করার প্রধান মানদণ্ড হলো সে দেশের সংখ্যালঘু সামাজিক বর্গ কতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে তা দেখা। এক্ষেত্রে জন রাউলস্-এর 'ম্যাক্সিমিন প্রিন্সিপল' ('সবচেয়ে বঞ্চিতদের সবচেয়ে বেশি সুবিধে দিতে হবে') শত ভাগ প্রয়োজ্য।

এই তিন ধরনের অধিকারের কোন একটি না থাকলেই গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। যেমন, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় (সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান) ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত 'সম্পত্তির অধিকার' ছিলো, কিন্তু 'রাজনৈতিক অধিকার' ছিলো না। বোৎসোয়ানা অনেক কাল পর্যন্ত আফ্রিকায় প্রবৃদ্ধিমুখী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিলো, কিন্তু সেখানে 'রাজনৈতিক অধিকার' ছিলো সীমিত পরিসরে এবং গোত্র-বিশেষে 'সামাজিক অধিকার'ও ছিলো না। এই গ্রুপ-ভুক্ত দেশের সংখ্যা পাল্লায় ভারী হবে ঐতিহাসিকভাবে। আবার, ভারতে 'রাজনৈতিক অধিকার' রয়েছে, সম্পত্তি-সংক্রান্ত 'অর্থনৈতিক অধিকার'ও অটুট, কিন্তু নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অবনতি ঘটেছে। ফরিদ জাকারিয়া তার ২০০৭ সালের এক লেখায় 'ইললিবারেল ডেমোক্রেসি'-র দলে যেসব দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তাদের প্রতিটিতেই একধরনের নির্বাচনী গণতন্ত্র আছে (এবং সম্পত্তির 'অর্থনৈতিক অধিকার'ও আছে) ঠিকই, কিন্তু সিভিল রাইটস খুবই দুর্বল বা ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে পড়ছে চাভেজের ভেনেজুয়ালা, এভা মরালেসের বলিভিয়া, এরদোয়ানের তুরস্ক ও পুতিনের রাশিয়া (এদের কোন কোনটিতে পরে শাসকের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থার চারিত্রে বদল হয়নি)। চীনে সম্পত্তি-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অধিকার কম-বেশি দেওয়া আছে, কিন্তু বহু-দলীয় নির্বাচনী রাজনৈতিক অধিকার নেই। চীনের সিভিল রাইটসের রেকর্ডও খুব ভালো নয়, বিশেষত ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। নিজেদের দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রের অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য চীন গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন সফলতা নিজে থেকে কখনো দাবি করেনি তার 'চৈনিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রের' কাঠামোয়।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা মনে রেখে আমরা যদি ডানি রডরিকের বিশ্লেষণধর্মী কাঠামো প্রয়োগ করি তবে দেখতে পাবো যে, তিন ধরনের অধিকারই আছে এমন

দেশ গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে অনেকটা এগিয়ে। এই তিনের মধ্যে সবচেয়ে 'কমন' হচ্ছে সম্পত্তি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অধিকার– যা গণতন্ত্র-অগণতন্ত্র নির্বিশেষে যেকোন সফল দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রতীকী অর্থে 'রাজনৈতিক অধিকার' আছে এমন দেশে সিভিল রাইটস বা নাগরিকের 'সামাজিক অধিকার' পাওয়া না-ও যেতে পারে। এমনকি শুধু প্রতীকী অর্থে নয়, দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এরকম দেশেও (সেটা পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, শ্রীলঙ্কা, ভারত, এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে-ই হোক না কেন) সামাজিক বা সিভিল রাইটস ব্যাহত হতে পারে বিভিন্ন সময়ে। উদাহরণত, মানব-উন্নয়নের সূচকে শ্রীলংকা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবথেকে এগিয়ে; দারিদ্র্যের মাত্রাতেও এটি এই অঞ্চলে সর্বনিম্নে; নির্বাচনও মোটামুটি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে দেশটিতে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে এটির গণতন্ত্রের প্রথম সারিতে থাকার কথা। অথচ সিভিল রাইটস-এর বিবেচনায় শ্রীলংকা ভালো করে উঠতে পারেনি। গত তিন দশকে দারিদ্র্য কমলেও সিনহালা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং তামিল হিন্দু (ও মুসলিম) সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'এথনিক কনফ্লিক্ট' জাতিবৈরীতায় রূপ নিয়েছে। গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে মাহিন্দ্রা রাজপক্ষের সরকারের বিরুদ্ধে জাফনায় তামিল টাইগার নির্মূল অভিযান পরিচালনার কালে।

এমন দেশ কি পাওয়া সম্ভব যেখানে অর্থনৈতিক ও নাগরিক সামাজিক অধিকার আছে কিন্তু রাজনৈতিক বা নির্বাচনী অধিকার সেভাবে নেই বা স্বল্প পরিমাণেই আছে? প্রাচীন ও মধ্যযুগে এরকম উদাহরণ আছে– যার কিছু উদাহরণ আমি 'এনলাইটেন্ড ডেসপটিজম' আলোচনার সময় দিয়েছি কিছু আগেই। তবে আধুনিক কালের প্রেক্ষিতে এ নিয়ে আরো সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা দরকার। তর্কের খাতিরে বলি একদা-সমাজতন্ত্র অভিমুখীন দেশগুলো প্রথম দিকে এমন ধারাতেই চলছিল। নিউ ইকনমিক পলিসি চলাকালীন রাশিয়ায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অধিকার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল; সে সময়ে (স্তালিনের শুদ্ধি অভিযান নেমে আসার আগে পর্যন্ত) সিভিল রাইটস বা সামাজিক স্বাধীনতার চৌহদ্দিও সংকুচিত ছিলো না জার আমলের তুলনায় (মধ্য-এশিয়ার পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উত্থান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'-তে উচ্ছাস আছে)। তবে, ধারণা করি যে, সাধারণভাবে রাজনৈতিক অধিকার তথা ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ছাড়া সিভিল রাইটস তথা লিবারেল ডেমোক্রেসি আছে এমন দেশের উদাহরণ আধুনিক কালে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। সিভিল রাইটস নেই, কিন্তু প্রতীকী অর্থে হলেও পলিটিক্যাল রাইটস বা ইলেকটরাল রাইটস আছে এমন উদাহরণ বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য।

এবার আমরা গণতন্ত্রের পিছু-হটার একটি বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর দিকে এগুতে পারি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের যেকোন একটিতে ঘাটতি হলেই আমরা গণতন্ত্রের 'পিছু-হটা' দেখতে পাবো। অর্থনীতিতে যদি গরিব-মুখী উন্নয়নের ধারা কমে আসে, যদি বৈষম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে, যদি দুর্নীতি এবং অন্যান্য নিয়ম-লঙ্ঘনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা উদ্যোক্তা প্রবণতাকে

ক্ষুণ্ন করা হয়, তবে Property Rights-র গ্যারান্টি সে দেশে আর থাকে না। এই Property Rights-র মধ্যে আছে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রতি উদার দৃষ্টিভংগী গ্রহণ ও উৎসাহ দান। নিদেন পক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা কারো প্রতি তা তার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক মতাদর্শ যা-ই হোক না কেন (অবশ্যই রাউলস-এর 'রিজনেবল প্লুরালিজমের' মধ্যে থেকে)। সম্পত্তির অধিকারসমূহের মধ্যে আছে প্রথমেই সম্পত্তিকে রক্ষা করার অধিকার (Right to Protect)। যাতে করে কেউ চাইলেই সম্পত্তি সংক্রান্ত মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে অথবা নানাভাবে হয়রানী করে মালিকের থেকে তা ছিনিয়ে নিতে না পারে। সংখ্যালঘুরা অনেক ক্ষেত্রে এই হয়রানীর বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হয় (যেমন হয়েছে এ দেশে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে) মাৎসন্যায়– বড় মাছ যেভাবে ছোট মাছকে গিলে ফেলার অধিকারকে স্বাভাবিক মনে করে– সেরকমটা যেন না হয় সমাজে। সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনা যেন সুশাসনের অভাবের কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারের মধ্যে পড়ে 'Right to Income-র' মতো অধিকারও। অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যখন আয়ের সুযোগের সৃষ্টি হয়, তখন তাতে সর্বাগ্রে অধিকার থাকবে যিনি সম্পত্তির মালিক তারই। এই মৌলিক Incentive-র বিধি-ব্যবস্থা না থাকলে রাষ্ট্রায়ত্ব খাত, ব্যক্তিগত বা এনজিও খাত মুখ থুবরে পড়তে বাধ্য। এই অর্থনৈতিক অধিকার সমূহের কোন একটি ক্ষেত্রে যদি ধস নামে, তাহলে সে দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঝুঁকির সামনে পড়ে এবং গণতন্ত্রের পিছু-হটা এক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। একই যুক্তিতে যদি রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ক্ষুন্ন হয়– নির্বাচনগুলো যথাবিহিত সময় মেনে অনুষ্ঠিত না হয়, অথবা হলেও তাতে যদি ভোটারদের অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করা হয়, অথবা নির্বাচনের ফল গণনায় বা ঘোষণায় যদি অনিয়ম বা কারচুপি করা হয়– তাহলে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির গুণগত মান নেমে যায় এবং সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পিছু-হটার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সবশেষে, যদি 'অর্থনৈতিক অধিকার' ঠিকও থাকে কোন দেশে, এমনকি যদি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা যায় 'রাজনৈতিক অধিকার'ও ঠিকঠাক রয়েছে– নিয়মিতভাবে নির্বাচন হয়ে চলেছে বিশেষ কোন ঝুট-ঝামেলা বা নিয়মভঙ্গ করা ছাড়াই– তাহলেও গণতন্ত্র পিছু হটতে পারে সে দেশে। যদি দেশটির সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (যেভাবেই তা সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে; যদি দায়িত্বশীল মিডিয়ার বা সোশ্যাল মিডিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে থাকে (বিশেষ বা ব্যতিক্রমধর্মী কারণ ছাড়াই); যদি ব্যক্তিমানুষ তার প্রতিদিনের জীবন-চর্চায় 'সেলফ–সেন্সর' করতে থাকে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে; যদি নারীর বা নৃগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বাড়তে থাকে; যদি জংগীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে; যদি মাদকাশক্তি তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে; যদি দেশটির তরুণ সমাজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও 'এসপিরেশন' হারিয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়ে; যদি সৃষ্টিশীল কাজ ও পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা নিশ্চুপ হয়ে যায় বা 'ইনটিমিডেটেড' বোধ করতে থাকে; যদি অদৃশ্য বা 'ইন্টারনাল এক্সাইল'-এ থাকা মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে; যদি সামাজিকভাবে 'এলিয়েনেটেড' ও মানসিকভাবে 'আউটসাইডার' বোধ করা মানুষের সংখ্যা অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে না কমে বরং উর্ধ্বমুখী হয়, তবে সক্রিয় সিভিল

রাইটস-এর ক্ষেত্রে (অমর্ত্য সেন যাকে সক্রিয় Public Reason বলেছেন) সংকট দেখা দিতে পারে। এবং শুধুমাত্র একারণেও গণতন্ত্র পিছু হটতে পারে। এককথায়, শুধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বা নিয়মিতভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকেই– ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতাকেই– আমরা গণতন্ত্রের পিছু-হটার একমাত্র উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি না। সামাজিক স্বাধীনতা ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ও গণতন্ত্রকে পেছন দিকে ঠেলে দিতে পারে। আমি যুক্তি দিচ্ছি যে, সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে গণতন্ত্রের যে পিছু-হটা তা বিশেষ করে লিবারেল ডেমোক্রেসির জন্য ক্ষতিকর– আপাত দৃষ্টিতে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির জন্য হুমকি না মনে হলেও। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ওপরে লিবারেল ডেমোক্রেসির পতন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে (নির্বাচনী গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের চাইতেও)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গণতন্ত্রে উত্তরণের মধ্যে প্রত্যাশিত যে গভীর সংযোগ 'গ্রোথ লিটারেচারে' পাওয়া যায়নি, তার বড় একটি কারণ হচ্ছে ইলেকটরাল ও লিবারেল ডেমোক্রেসির মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার ব্যর্থতা। যাহোক, সেটা ভিন্ন আলোচনার বিষয়। এবারে গণতন্ত্রের পিছু-হটার উদাহরণগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক।

৫. দেশে দেশে গণতন্ত্রের উল্টোরথ

প্রথমেই আসব পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রের বিষয়ে। ফুকুয়ামার কথিত 'ইতিহাসের অবসান' তথা পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণার পর গত প্রায় তিন দশকে আশা করা গিয়েছিল যে গণতন্ত্র পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে স্থায়ী আসন গাড়বে। শুধু তা-ই নয়, প্রথাগত সমাজতন্ত্রের পতনের পর– পূর্বতন অভিজ্ঞতার কারণে– প্রত্যাশা ছিলো যে এসব দেশই সারা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গণতন্ত্রের 'রোল মডেল' হয়ে দাঁড়াবে। পতনের পর পরই চেক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন বিখ্যাত মানবাধিকার কর্মী, ভিন্ন মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকার ভ্যাকলাভ হাভেল। ১৯৯৩ সালে তিনি এক বক্তৃতায় গণতন্ত্রকে সব বিপদের থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র রক্ষাকবচ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীক ডেমোক্রেসির ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। পুরো উদ্ধৃতিটি তুলে দেওয়ার মতো:

'Today's world, as we all know is faced with multiple threats... The only way to save our world, as I see it, lies in a democracy that recalls its ancient Greek roots: democracy based on an integral human personality answering for the fate of the community.' স্পষ্টতই হাভেল নির্বাচনী গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে অন্য বৃহত্তর ধারণা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। আরেকজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ ইয়ানুশ কর্নেই হাঙ্গেরীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সোভিয়েত আমলেই 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা'কে সমালোচনা করে তিনি একাধিক বই লিখেছিলেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বইয়ের রুশ অনুবাদ 'ইকনমিক্স অব ডেফিসিট' একটি তুমল তর্ক-বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে

দাঁড়িয়েছিল ১৯৮১/৮২ সালে, মনে পড়ে। করনেই তার মত ও পথ থেকে অনেকটাই– বলতে গেলে ১৮০ ডিগ্রি– সরে এসেছেন সোভিয়েত ভাঙনের পরে। ২০১৮ সালের এক বক্তৃতায় তিনি লিখেছেন, গণতন্ত্রের মূল্য ভালোভাবে বুঝার আগেই গণতন্ত্র পূর্ব ইউরোপের কোলে এসে পড়েছে অনেকটা অযাচিত উপহারের মতো। যখন সত্যি সত্যি আমরা গণতন্ত্রের মুখোমুখি হলাম তখন তার অসম্পূর্ণতাগুলো আমাদের চোখে পড়তে লাগল। এর থেকে ফল পাওয়ার জন্য আমাদের আরো দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরতে হবে। পুরো উদ্ধৃতিটি আমাদের আলোচনার জন্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে:

'Eastern Europeans got democracy mainly as a gift... when transition to a free market started. We, the citizens of Eastern Europe, immediately adjusted to that, and started to be discontent with all the imperfections of democracy and began to say nasty words about all politicians. The historical period of democracy started with a certain disappointment in democracy. And it is only now, in the last few years, when we are losing democracy, that at least a part of the Hungarian population has started to feel what the genuine value of freedom is. Therefore, I suggest that everyone who is not Eastern European should study the recent Eastern European experience, should study what is going on in Hungary, what is going on in Poland. These are two remarkable countries, which could serve as laboratories demonstrating the procedure for liquidating the great achievements of democracy.'

১৯৯৩ সালে ভ্যাকলাভ হাভেল কর্তৃক প্রকাশিত আশাবাদ ২০১৮ সালে এসে ইয়ানুশ করনেই-এর বক্তৃতায় উদ্বিগ্ন উচ্চারণে পর্যবসিত হয়েছে। পোলান্ডে ও হাঙ্গেরীতে কীভাবে গণতান্ত্রিক অর্জনসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি। স্পষ্টতই তার গলায় যে সুর বাজছে তা নৈরাশ্যের। কিন্তু এই পরিবর্তন কেন ঘটল পূর্ব ইউরোপে? একদা ধারণা করা গিয়েছিল যে, ক্লিনটনের নির্দেশিত ফর্মূলা 'ফ্রি মার্কেট উইথ ডেমোক্রেসি'-এর হাত ধরে পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে প্রগতির রথের ঘোড়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে কেবল ছুটতেই থাকবে। কিন্তু এর পরিবর্তে বিপরীত ফল এলো কীভাবে? সাম্প্রতিক বছর গুলোয় এনিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। তার মধ্যে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করব Liz Fekete-এর 'ইউরোপ'স্ ফল্ট লাইনস্', আর Ivan Krastev-এর 'ইস্টার্ণ ইউরোপ'স্ ইললিবারেল রিভোলিউশন' লেখা দুটির কথা।

ক্রাস্তেভ অনেকটা ফরিদ জাকারিয়ার 'অনুদার গণতন্ত্রের' ধারণা নিয়েই এগিয়েছিলেন। তার মূল বক্তব্য হল, ৯০'র দশকে গণতন্ত্রের অভিমুখে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে, তা এখন পিছু হটছে প্রবলভাবে। হাঙ্গেরী ও পোলান্ডে 'পুরো মানসিকতাই' বদলে গেছে; অচিরেই চেক প্রজাতন্ত্র ও রুমানিয়া

এদের পথ অনুসরণ করবে। পুরো উদ্ধৃতিটি আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসংগিক:

'Huntington died in 2008, but had he lived, even he would probably have been surprised to see that liberal democracy is now under threat not only in countries that went through democratic transitions in recent decades, such as Brazil and Turkey, but also in the West's most established democracies... Perhaps the most alarming development has been the change of heart in Eastern Europe'.

'হৃদয়ের বদল' বলতে কী বুঝাতে চেয়েছেন ক্রাস্তেভ? বলতে চেয়েছেন যে, নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলেও লিবারেল ডেমোক্রেসি আসলে পরাজিত হয়েছে: 'Two of the region's poster children for postcommunist democratization, Hungary and Poland, have seen conservative populists win sweeping electoral victories while demonizing the political opposition, scapegoating minorities, and undermining liberal checks and balances'. এবং এটা করা হচ্ছে কোন রাখঢাক না করেই। ২০১৪ সালের এক বক্তৃতায় হাঙ্গেরীর নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আর যা-ই হোক উদারনৈতিক গণতন্ত্র তারা চান না। তার মতে, 'গণতন্ত্রকে লিবারেল ধারার হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উদার নীতি অনুসরণ করছে না বলেই যে সেটা গণতন্ত্র নয় সেকথা বলা যায় না।... আমাদেরকে টিঁকে থাকতে হলে লিবারেল ধারা পরিত্যাগ করতে হবে।' কট্টর ডানপন্থী তাক্তিকের মতো করে বলেছেন, 'we have to abandon liberal methods and principles of organizing a society', এবং এটা শুধু হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এ নিয়ে সারা বিশ্বেই একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে অনুদার গণতন্ত্রের ধারাকে ঠিকঠাক মতো এগিয়ে নেওয়া যায়। পারলে, ভিক্টর ওরবান হয়তো 'Illiberal International'ই গঠন করার প্রস্তাব দিতেন!

হাঙ্গেরীর মতো দেশে ভিক্টর ওরবান এতো খোলামেলাভাবে 'অনুদার গণতন্ত্রের' পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন এর ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। বার্লিন দেয়ালের পতনের পরে পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের পক্ষে একধরনের জোয়ার নেমেছিল, বা নামাটাই খুব স্বাভাবিক ঠেকেছিল সে সময়ে বাইরের পর্যবেক্ষকদের কাছে। কেননা, এসব দেশে 'লৌহ-বেষ্টনীর' ইকনমির ভেতরে আস্তে আস্তে হলেও একটা বড় আকারের 'মিডল ক্লাস' জন্ম নিয়েছিল। এরা শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না। সেসব দেশে যেটার অভাব ছিলো সেটা (যেমন কনজিউমার গুডস-এর চাহিদা) তখন পূরণ হতে পারেনি বাজার অর্থনীতির অনুপস্থিতির কারণে। কিন্তু চিন্তা-চেতনায়, পড়াশোনায় এবং জীবনযাত্রার ধরনে এরা পাশ্চাত্যের উদার গণতান্ত্রিক সমাজের মানদণ্ডকেই উন্নত জীবনধারার আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড বলে মেনে নিয়েছিলেন। ফলে এরা কেন এক-পর্যায়ে ওরবানের মতো কট্টর দক্ষিণপন্থী জাতীয়বাদী রাজনীতিককেই 'নেতা' হিসেবে নির্বাচন করবেন, সেটা একরকম

ধাঁধার মতই মনে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সেইমুর লিপসে (Seymur Lipset) ১৯৫৯ সালের একটি নতুন পথ-দেখানো প্রবন্ধে দাবি করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণের প্রবণতা বাড়বে। এক্ষেত্রে তিনি মার্কসের সাথে মডার্নাইজেশন তত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে (শিক্ষার সাথে সাথে গণতন্ত্রের চাহিদা বাড়তে থাকে); শ্রেণি-কাঠামোতে পরিবর্তন আসে (প্রলেতারিয়েতের পরিবর্তে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' জনসংখ্যার প্রধান গ্রুপ রূপে আবির্ভূত হয়); রাষ্ট্র ও সমাজ এদের মধ্যকার সম্পর্কে পরিবর্তন আসে (রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় তথা গণতন্ত্র রক্ষায় সমাজের দায়-দায়িত্ব বেশি করে অনুভূত হয়); এবং 'সিভিল সোসাইটি'-র ভূমিকা বাড়তে থাকে (টোকভিল-এর মতো লিপসেও ভাবতেন যে গতিশীল নাগরিক আন্দোলন-সংগঠনের সংখ্যা/গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে 'ক্ষমতা' শুধু প্রথাগত রাজনৈতিক বলয়ের মধ্যেই সীমিত থাকে না)। নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, শ্রেণি, সম্পর্ক ও সিভিল সোসাইটি– এই চারটি উপাদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কিছু আগে বা পরে রাজনৈতিক ধারাকে অনিবার্যভাবে গণতন্ত্রের পথে চালিত করে। মার্কস ও টকভিলকে আশ্রয় করে লিপসে আজ থেকে ষাট বছর আগে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, তা পরীক্ষা করার বড় একটি ল্যাবরেটরি ছিলো পোস্ট-সোভিয়েত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো।

কিন্তু বাস্তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারা লিপসের ধারাভাষ্যকে সমর্থন করেনি। শুধু হাঙ্গেরীতেই নয়, অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশও কম-বেশি গণতন্ত্রের ধারা থেকে পিছু হটে এসেছে। ২০১৫ সালে দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট দল 'ল এন্ড জাস্টিস পার্টি' (পোলিশ ভাষায় সংক্ষেপে PiS) সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করে। সেটা দেখে সে দেশের একজন উদারনৈতিক চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক ও লেখক এডাম মিশনিক (Michnik) একরূপ বিমর্ষ মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, "কখনো কখনো কোন অব্যাখ্যাত নিয়মে সুন্দরী রমনীরও পদস্খলন ঘটে, এবং সে একজন বেজন্মার সাথে ঘর করতে শুরু করে।' পূর্ব ইউরোপে যা ঘটেছে, তাকে ওরকম চিত্তবৈকল্যের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। হাঙ্গেরীতে ভিক্টর ওরবানের দক্ষিণপন্থী ফিদেজ (Fidesz) পার্টি পর পর দু-বার সংসদ নির্বাচনে জিতেছে; পোলান্ডে PiS জিতেছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে। মনে হচ্ছে, পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে সুন্দরীদের পদস্খলন ঘটছে।

কেউ বলতে পারেন যে এই পিছু-হটার মূল কারণ অর্থনৈতিক। প্রথাগত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের গত তিন দশকেও এই পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। অথচ লিপসে-র মূল যুক্তিই ছিলো যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে গণতন্ত্রের পথে অব্যাহত চলার ক্ষেত্রে (বা অ-গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে) প্রধান পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিকভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললে– লিপসের লজিক মেনেই– গণতন্ত্র যে হোঁচট খাবে এতে আর বিস্ময় কী! যুক্তিটা আংশিকভাবে সত্য। ওরবান প্রথমবারের মতো হাঙ্গেরীতে বিজয়ী হন ২০১০ সালে; তার আগে ২০০৯ সালে দেশটিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ঋণাত্মক। এর

থেকে অর্থনৈতিক দুর্গতির সাথে গণতন্ত্রের পিছু-হটার একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পোলান্ডের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা খাটে না। ২০০৭ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে পোলান্ডের প্রবৃদ্ধি হার ছিলো ইউরোপের মধ্যে সবার উপরে। এই প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিকভাবে দেখলে সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যেও সীমিত ছিলো না। যাকে বলে, বিশ্ব ব্যাংকের ভাষায় 'Shared Prosperity'– সেটি পোলান্ডে ঘটছিল, মানে 'সামাজিক ঊর্ধ্বমুখী সচলতা' হচ্ছিল। ২০১৭ সালের নির্বাচনে চেক প্রজাতন্ত্রেও দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট জাতীয়তাবাদী ধারার দলগুলোর আসন বৃদ্ধি হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। অথচ চেক প্রজাতন্ত্রে বেকারত্বের হার ইউরোপের মধ্যে খুবই নীচুতে। একইভাবে, স্লোভাকিয়াতেও ক্রমাগত জাতিগত বৈরীতা ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশটি মোটামুটি সফলতার মুখ দেখে চলেছে।

এই দেশগুলোয় দক্ষিণপন্থি জনতুষ্টিবাদী শক্তির উত্থানের সাথে গণতন্ত্রের পিছু-হটার একটি যোগাযোগ রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের ঢল যখন নেমেছিল, তখন উদারনৈতিক রাজনীতিবিদেরা রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ছিলেন। সে সময় তারা সমস্বরে জাতিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্যভাবে চিহ্নিত 'সংখ্যালঘুর' স্বার্থ-রক্ষার কথা বলতেন। এখন কট্টরপন্থীরা রাষ্ট্রক্ষমতায়– তারা 'জনগণের স্বার্থরক্ষার' কথা বলছেন; 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার' কথা বলেছেন বিশেষ জোরের সাথে। পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে 'চরম জাতীয়তাবাদের' বিকাশ ঘটেছে। বাজার অর্থনীতিকেও 'জাতীয়তাবাদী ধারায় পরিচালনা করার ইচ্ছা' ব্যক্ত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কখনো চীন, কখনো রাশিয়া, কখনো ব্রেক্সিট, কখনো ট্রাম্পের আমেরিকার উদাহরণ দিচ্ছেন তারা– যখন যেটা তাদের কাজে লাগে। চেক প্রজাতন্ত্রের নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অন্দ্রেই বেবিস (Andrei Babis) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি 'একটি কোম্পানির মতো করে রাষ্ট্রকে' পরিচালনা করতে চান। বুঝাই যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার থেকে সরে এসে চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত এক মেরুতে আশ্রয় নিয়েছে এসব দেশের সরকার। আর এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জাতি-বৈরীতা ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ২০১৫ সালের পর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত অভিবাসীদের ঢেউ এসে পুরো ইউরোপের মনস্তত্ব ও সমাজব্যবস্থাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। এক দীর্ঘ অভিযাত্রার পর অভিবাসীরা গ্রীস-ইতালী হয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে পশ্চিম ইউরোপে গেছে। এদের বেশির ভাগেরই স্থান হয়েছে জার্মানীতে (ও কিছু পরিমাণে ফ্রান্সে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোয়)। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো কোন অভিবাসীকেই গ্রহণ করেনি– না হাঙ্গেরী, না পোলান্ড, না চেক প্রজাতন্ত্র, না বুলগেরিয়া, না রুমানিয়া, না স্লোভাকিয়া, না সার্বিয়া। এই আত্মরতি, এই স্বার্থপরতা, এই বিশ্ববিমুখতা পূর্ব ইউরোপের নব-জাগ্রত দক্ষিণপন্থী জাতীয়বাদের প্রধান লক্ষণ। এসব দেশ এখন জাতীয়তাবাদী ধারায় নিজেদের ইতিহাসও নতুন করে লিখছে। 'ইহুদীদের নিধনের পেছনে পোলান্ডের কাউকে দায়ী করা যাবে না'– এই মর্মে আইন পাশ হয়েছে দেশটিতে (উদাহরণত, ইউরোপের হলোকাস্টের একটি বৃহৎ অংশ সংঘটিত হয় নাজীবাদ অধিকৃত পোলান্ডে)। অনুদার গণতন্ত্রের পেছনে উত্তপ্ত উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রবলভাবে ইন্ধন দিচ্ছে, সন্দেহ নেই। এর একটা কারণ হতে পারে, বার্লিন

দেয়ালের পতনের পরের এক দশকে সবচেয়ে দক্ষ ও সবচেয়ে উদার মনস্ক লোক-জন পূর্ব ইউরোপ ছেড়ে পশ্চিম ইউরোপে বা আমেরিকা-কানাডায় চলে গেছে। যারা পড়ে রয়েছে, তারা মাত্রাতিরিক্তভাবে রক্ষণশীল ও উগ্র জাতীয়বাদী মনোভাবের। দুঃখের বিষয়, এর মধ্যে রয়েছে তরুণ সমাজও– যাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিজ দেশের থেকে ভিন্ন সংস্কৃতির, ভাষার বা ধর্মের কোন অভিবাসীকে তারা গ্রহণ করতে নারাজ। এর একটি কারণ হতে পারে এসব দেশের 'নিঃসঙ্গ ইতিহাস'। উদাহরণ স্বরূপ, হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে আমরা প্রতিতুলনা করতে পারি। হাঙ্গেরীতে ঐতিহাসিকভাবেই 'বিদেশি ভাষাভাষী' জনগোষ্ঠীর সংখ্যা খুব কম ছিলো। বর্তমানেও সমগ্র হাঙ্গেরীর জনসংখ্যার মধ্যে বিদেশি নাগরিকদের অনুপাত ২ শতাংশের মতো; পাশের দেশ অস্ট্রিয়ায় বিদেশি নাগরিকদের অনুপাত ১৫ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস 'শক হুন দল পাঠান মোগল' নিয়ে গড়া; এমনকি রাশিয়ার ইতিহাস শতাধিক নৃগোষ্ঠী ও ভাষা-বর্গ দিয়ে গড়া; সেরকমটা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো আজও কল্পনা করতে পারে না। মিশ্রতা তাদের রক্তে ও রাজনৈতিক চিন্তায় নেই। সমসত্ত্বতার ফাঁদে পড়ে বন্দি হয়ে আছে পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্র। বুলগেরিয়ার সেন্টার ফর লিবারেল স্ট্রাটেজিস্– এর প্রধান ইভান ক্রাস্তেভ নির্মোহভাবে বলেছেন: 'In the eastern European political imagination, cultural and ethnic diversity are seen as an existential threat, and opposition to this threat forms the core of the new illiberalism'. ফরাসী বিপ্লবের স্লোগানে লিবার্টি ও ইগালিটি (যার অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতা)-এর সাথে ফ্রেটারনিটি-র বা ভ্রাতৃত্বের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা গৃহীত হয়নি পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রে। জ্যাক দেরিদা ও ইমানুয়েল লেভিনা (Levinas) নির্যাতীত অভিবাসীদের কথা মনে রেখে নিদেন পক্ষে 'আতিথেয়তা' (hospitality) দেখানোর কাজটিকে গণতন্ত্রের জন্য জরুরি মনে করেছিলেন। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর গণতন্ত্র 'ভ্রাতৃত্ব' দূরে থাক্, সহায়-সম্বলহীন অভিবাসীদের কিছু কালের জন্য 'আতিথেয়তা' দেখানোরও সৌজন্যতা বোধ করেনি।

পূর্ব ইউরোপ ছেড়ে এবার আসা যাক হান্টিংটনের থার্ড ওয়েভ-র উপজীব্য নব্য-গণতন্ত্রের (Re-democratization) ল্যাবরেটরি লাতিন মহাদেশে। আশির ও নব্বইয়ের দশকে এখানে দেশে দেশে সামরিকতন্ত্র পিছু হটছিল এবং গণতন্ত্র তার জায়গা করে নিচ্ছিল। চিলি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, পেরু, কলম্বিয়া, সালভাদর, হন্ডুরাস, পানামা সব কটিতে একের পর এক সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকারের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। বহুকাল ধরে সামরিক শাসনের অধীনে ঘটতে থাকা মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে বিচার-কার্য শুরু হয়েছিল এবং এসব দেশের নাগরিকেরা আগের চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করেছিলেন। ২০০০-র প্রথম দশকজুড়ে এসব দেশের কোন কোনটিতে এমনকি সামাজিক গণতন্ত্র বা Social Democracy ধারার বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান দেখা দিতে শুরু করে। ব্রাজিলের লুলা (Luiz Inacio Lula da Silva),

আর্জেন্টিনার ক্রিস্টিনা কিরশ্নের (Cristina Fernandez de Kirchner), ইকুয়াডরের রাফায়েল করিয়া (Rafael Vicente Correa Delgado), ভেনেজুয়েলার হুগো চাভেজ, বলিভিয়ার এভা মরালেস (Juan Evo Morales Ayma), চিলির মিশেল বাশলে (Michelle bachelet), এরা সবাই অনুপ্রেরণা জাগানোর মত একেকটি নাম। তারা সামরিক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শুধু নির্বাচনী গণতন্ত্র বা ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি আনেননি। তারা নিজ নিজ দেশে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'সামাজিক স্বাধীনতা'-র অধিকার এনে দিয়েছিলেন। এবং এই অর্থে 'লিবারেল ডেমোক্রেসির' প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, এরা নিজ নিজ দেশে গরীব জনগোষ্ঠীর জন্যে নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও মানব-উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন, যার ফলে কিছুকালের জন্যে হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে আয়-বৈষম্য কিছুটা কমে গিয়েছিল। এদের এই সাফল্যগুলোকে 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসির' লাতিন আমেরিকার মডেল বলে মনে হতে পারে। লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের এই 'বাম দিকে মোড় ফেরা' (ও পরবর্তীতে এর 'সংকট') একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি রাখে। সেটা আগামীর জন্য তোলা রইল। আপাতত যেটা লক্ষ্য করব তাহলো, পূর্ব ইউরোপের 'ডানপন্থি পপুলিস্ট উত্থানের' বিপরীতে লাতিন আমেরিকায় এটা ছিলো 'বামপন্থি পপুলিস্ট উত্থান'। এবং এখানেও দেখতে পাবো গণতন্ত্রের দিকে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এসব দেশের কোন কোনটিতে গণতন্ত্রে এখন পিছু-টান দেখা দিচ্ছে (যেমন ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ায়)। আবার বেশ কটিতে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি থাকলেও জন্ম নিচ্ছে 'ইলেলিবারেল ডেমোক্রেসির' (যেমন ব্রাজিলে)। আবার বেশ কিছু দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার-বদল হচ্ছে ঠিকই– বাশলে ও কিরশ্নের ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন– কিন্তু জন-অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে মাঝে মাঝেই এবং পুনরায় দক্ষিণপন্থার (এমনকি সামরিকতন্ত্রের) পক্ষের শক্তির ক্ষমতা-গ্রহণের আশংকা দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের তুলনায় লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের ধারা অনেক বেশি চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর পিছু-হটার দিকটি চোখে পড়ার মতো।

কেন হচ্ছে এমন? লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রের পিছু-হটার পেছনে পূর্ব ইউরোপের ধরনের কোন 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' কাজ করছে না, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এর পেছনে তিনটি প্রভাবক কাজ করছে বলে মনে হয়। প্রথমটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনার সাথে জড়িত; দ্বিতীয়টি এই অঞ্চলে সামরিক-তন্ত্রের প্রচ্ছন্ন প্রভাবের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত; আর তৃতীয়টি হচ্ছে এসব দেশে অতি-মাত্রার অর্থনৈতিক (আয়) বৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য। এই তিনটি উপাদানই গণতন্ত্রের পিছু-হটাকে সক্রিয়ভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রভাবকের সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ঐতিহাসিকভাবে লাতিন মহাদেশের প্রায় সব দেশেই সামরিক শাসন দীর্ঘকাল ধরে চলেছে (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)। এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য নানাভাবে

সামরিক শাসনকে সাহায্য-সহযোগিতা করে একটা 'ভয়ের সংস্কৃতি' চালু রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্যের মিত্ররা। এর ফলে যখন অভ্যন্তরীণ জনমতের চাপে কোথাও কোথাও গণতান্ত্রিক ঝোঁক দেখা গিয়েছে– যেমন চিলিতে সালভাদর আয়েন্দে নির্বাচিত হয়ে আসার পরে– সেখানেও তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। চিলির ক্ষেত্রে সরাসরি মার্কিন সমর্থনে জেনারেল পিনোশে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। উরুগুয়ের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হুয়ান বরদাবেরির (Bordaberry) সরকার সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেয় এবং সংসদসহ সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ বা বন্ধ করে দেয়। চিলির মতো এখানেও যুক্তি ছিলো যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থেই– যেন বামপন্থিরা ক্ষমতা দখল না করতে পারে– আপাতত গণতান্ত্রিক অধিকার মুলতুবী রাখতে হবে। সেই থেকে নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত এসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রথা সেভাবে কাজ করতে পারেনি। সরাসরি 'মিলিটারি ডিক্টেটরশীপ' ও 'অথোরেটিরিয়ান ডেমোক্রেসি'– এই দুইয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল লাতিন মহাদেশ। এই প্রলম্বিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের একটি দীর্ঘমেয়াদী ছায়া ২০০০-র প্রথম দশকের গণতান্ত্রিক শাসনের আমলেও রয়ে যাবে, এটা কল্পনা করা কষ্টকর নয়।

তৃতীয় প্রভাবকের অবদানের কথাও এখানে খাটো করে দেখা যাবে না। লাতিন মহাদেশে উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক শাসনের একটি প্রতিফল ছিলো প্লানটেশন ইকনমি ও বৃহৎ খামার ব্যবস্থার (Latifundia) উদ্ভব। ইউরোপের আদলে এখানে 'সামন্ততন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল; এর ফলে জমির মালিকানার বণ্টন ছিলো খুবই বৈষম্যমূলক। এতে করে আদিবাসীরা যেমন জমি হারিয়েছে, তেমনি ক্ষুদ্র জোতের কৃষকরা জমি চাষ না করতে পেরে পরিণত হয়েছে প্লানটেশনের কৃষি-শ্রমিকে। এই অবস্থায় জমি বণ্টনের প্রবল বৈষম্য অতি-দ্রুত আয়ের চরম বৈষম্যের রূপ নেয়। উদাহরণত, লাতিন মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই মাথা পিছু আয়-বণ্টনের মাত্রা তথা জিনি সূচক (Gini Index) ঐতিহাসিকভাবে ৫০ শতাংশের বেশি ছিলো। ২০০০-র প্রথম দশকে বিভিন্ন বণ্টনমূলক কর্মসূচির কারণে কয়েকটি দেশে এই মাত্রা কমে আসলেও কখনোই ৪০ শতাংশের নীচে নামেনি (মূলত ৪৫-৫০ শতাংশের মধ্যেই অবস্থান করছিল সাম্প্রতিক বছর গুলোতেও)। এর বিপরীতে, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় সাম্প্রতিক বাড়ার প্রবণতা সত্ত্বেও জিনি সূচক কখনো লাতিন মহাদেশের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করেনি। আসেমগলু (Daren Accmoglu) ও রবিনসন (Jim Robinson) তাদের একটি পথ-প্রদর্শক গবেষণাপত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছেন যে লাতিন মহাদেশের এই অতি-মাত্রার আয়-বৈষম্যের পেছনে 'রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক' কারণই দায়ি। কার্য-কারণের বিতর্ক বাদ দিয়ে আপাতত শুধু এটুকু লক্ষ্য করব যে, উচ্চ মাত্রার আয়-বৈষম্য সূচক সমাজে নাগরিকদের মধ্যে 'জনকল্যাণ' সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী অভিপ্রায় বা Preference-র জন্ম দেয়; তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধন (Trust) দুর্বল করে, এবং সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) ক্ষতিগ্রস্ত করে; কোন কোন ক্ষেত্রে চরম বৈরী (গৃহযুদ্ধ) পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব-উন্নয়নের ওপরে বিভিন্নমুখী অভিপ্রায়,

বিশ্বাসহীনতা, সামাজিক পুঁজির অবক্ষয়, এবং লাগাতার দ্বন্দ্বসংঘাতের ঝুঁকির দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রতিফল নিয়ে গত দুই দশকে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এরকম অস্থির পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের ভিত তোলা বা পাকা করা খুবই কঠিন।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা সামরিক তন্ত্রও শুরু থেকেই চলে আসা সুউচ্চ আয় বা সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য– এ দুটিই দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা। লাতিন মহাদেশের অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক পিছু-হটা এদিয়ে শুধু ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং এখানেই চলে আসে প্রথম প্রভাবকটির গুরুত্ব: অর্থনৈতিক পরিচালনায় সবিশেষ ব্যর্থতা। এই বিষয়টির প্রতি আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, বামপন্থিরা বণ্টন-বিষয়ে যতটা সংবেদনশীল, অর্থনৈতিক বিষয়-আশয়ের সুদক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে ততটাই অদক্ষ (চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া)। বাস্তব বিবেচনাবোধ (Pragmatism) বামপন্থিদের অর্থনৈতিক শাসনামলে প্রায় নেই বললেই চলে। এর প্রথম উদাহরণ ১৯৫০-পরবর্তী 'স্তালিনীয় সমাজতন্ত্র' (১৯৯০-৯১ সালের ভাঙনের পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশ তার ধ্রুপদী উদাহরণ)। এর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের একদা 'সমাজতন্ত্র-অভিমুখীন' পর্বের দেশগুলো (তানজানিয়া, এঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, নিকারাগুয়া, মোজাম্বিক, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি)। এসব দেশ যখন 'সমাজতন্ত্র-অভিমুখীন' নীতিমালা হাতে নেয়, তাতে পুঁজিবাদের বিকল্প-খোঁজার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু অর্থনীতি পরিচালনায় দক্ষতা ও দায়িত্বশীল বিবেচনার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এর সর্বশেষ তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে, লাতিন মহাদেশের বাম-গণতান্ত্রিক ধারার দেশগুলো, যাদের সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নবতর সংস্করণ ভেবে আমরা প্রথম দিকে দারুণভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। পরবর্তীতে ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ায় যেভাবে অর্থনৈতিক ধস নেমে এলো, তার মূল কারণ নিহিত বামধারার জনতুষ্টিবাদী (Populist) অর্থনীতির ভেতরে। অর্থশাস্ত্রের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের সুলভ্যতা/প্রাচুর্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে (Resource-Curse হিসেবে যেটা পাঠ্য বইয়ে পড়ানো হয়)। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের হারে অতি-মূল্যায়ন (Over-valuation) দেখা দিতে পারে; রপ্তানীর গতি শ্লথতর হতে পারে; হঠাৎ-পাওয়া প্রাকৃতিক সম্পদজনিত আয়-বৃদ্ধির ফলে মাত্রাতিরিক্তভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ বেড়ে যেতে পারে; 'ইন্টারনাল' ও 'এক্সটারনাল' ব্যালেন্সের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মূল্যস্ফীতির লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি হতে পারে; বৈদেশিক পুঁজির প্রবাহ কমে যেতে পারে ও অভ্যন্তরীণ পুঁজি দেশের বাইরে চলে যেতে পারে; এসবের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগে মন্দা, কর্মসংস্থান-হানি এবং মূল্যস্ফীতি এই ত্রিবিধ চাপে জনগণের জীবনে নেমে আসতে পারে চরম দুর্যোগ, এর পরিণামে সৃষ্টি হতে পারে তীব্র রাজনৈতিক অসন্তোষ। এরকম পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের পিছু-হটা অনিবার্য হয়ে পড়ে বৈকি। ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, এমনকি অতি সাম্প্রতিকের চিলিতেও আমরা দেখতে পেয়েছি স্মার্ট অর্থনৈতিক চিন্তার তুলনামূলক অনুপস্থিতি। কেন বাম-গণতান্ত্রিক সরকারগুলো লাতিন আমেরিকায় 'সোশ্যাল

ডেমোক্রেসি'র শক্তিশালী চেহারা উপহার দিতে পারল না তার মূলে রয়েছে অর্থবহ (Sensible) অর্থনৈতিক পলিসি গ্রহণে ধারাবাহিক ব্যর্থতা। 'হৃদয় তপ্ত, কিন্তু মাথা শান্ত' ধরনের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক নেতৃত্ব দাঁড় না করাতে পারলে লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্র কখনোই ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির চৌকাঠ পেরিয়ে লিবারেল ডেমোক্রেসিতে উন্নীত হতে পারবে না। সোশ্যাল ডেমোক্রেসি তো দূরে থাক। বাম এবং ডান এই উভয়বিধ জনতুষ্টিবাদই গরীব-অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সাময়িক কালের জন্য উপকারী হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা অকল্যাণই বয়ে আনে। এতে করে অ-গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়ে আরো ভয়ংকর অলিগার্কি বা এমনকি প্লুটোক্রেসির দিকে এগিয়ে যেতে পারে গোটা ব্যবস্থা, যেটা এরিস্টটল আশংকা করেছিলেন।

লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পিছু-হটার যে প্রবণতার কথা বললাম তা আফ্রিকার ক্ষেত্রে শত ভাগ প্রযোজ্য। এখানে গণতন্ত্র পিছু হটবে কি ঠিক মতো সেখানে ডানাই মেলতে পারেনি। সাব-সাহারা অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানাকে বাদ দিলে গণতন্ত্র সেভাবে কোথাও শক্ত আসন গাড়তে পারেনি। মুসেভেনির (Yoweri Museveni) উগান্ডা 'আধিপত্যবাদী গণতন্ত্র' থেকে ক্রমশ 'ডেসপটিক স্বৈরতন্ত্রে' পর্যবসিত হয়েছে। ২০০৫ সালের দিকে 'টার্ম লিমিট' এবং ২০১৭ সালে 'বয়সের সীমা' দূর করে আজীবন 'প্রেসিডেন্ট' থেকে যাবেন, এ-ই জেনারেল মুসেভেনির ইচ্ছে। ২০০০-র প্রথম দশকের শুরুতে বেশ কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল কীভাবে এই মুসেভেনির উগান্ডাকে ব্রিটিশ এইড ও অন্যান্য দাতা সংস্থারা আফ্রিকার 'নতুন ভরসা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। রুয়ান্ডার ১৯৯৪ সালের গণহত্যার পর আরেক সামরিক নেতা পল কাগামে যখন ক্ষমতায় এলেন তখন হুটু ও টুটসিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হলো, এবং সেদেশে 'শান্তি' ফিরে এলো। সেরকম পরিস্থিতিতে কাগামেকে পাশ্চাত্যের চোখে মনে হয়েছিল 'খুবই আকর্ষণীয়' নেতা হিসেবে। এরপর প্রায় ২৫ বছর কেটে গেছে। এখনো তাকে খুবই 'নির্ভরযোগ্য' নেতা বলে মনে করা হয়। তবে এর সাথে অন্য বিশেষণও যুক্ত হচ্ছে। আফ্রিকার 'সবচেয়ে দমনমূলক' নেতাদের একজন ধরা হয় তাকে এখন। ২০১৭ সালের আগস্টের নির্বাচনে '৯৯ শতাংশ' ভোট পড়ে তার পক্ষে! তৃতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কাগামে। এর জন্যে অবশ্য তাকে ২০১৫ সালে একটি রেফারেন্ডাম করাতে হয়েছিল 'দুই টার্মের লিমিট' বাতিলের জন্য; যথারীতি সেখানেও 'টার্ম লিমিট' বাদ করার পক্ষে ৯৮ শতাংশ 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছিল। বলা দরকার, রুয়ান্ডায় প্রেসিডেন্টের একেকটি টার্ম বা মেয়াদ ৭ বছর। সেই হিসেবে কাগামে ইতিমধ্যে ২০ বছর শাসন করছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। মুসেভেনির সামরিক বাহিনীতে তার অধীনে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কাগামে; রাজনীতিতেও তিনি ওস্তাদের পথ ধরেই হাঁটছেন।

এখানে বোৎসওয়ানার প্রসংগটি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকার পাশের হীরক-সমৃদ্ধ এই ছোট্ট দেশটি একটি 'দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশ' হিসেবে পরিচিত। ১৯৬৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত যদি মাথা-পিছু জাতীয় আয়ে (GDP) প্রবৃদ্ধির হিসেব করা যায় তাহলে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরে তৃতীয় নামটি হবে

বোৎসোয়ানার। কীভাবে সম্ভব হলো এত দ্রুত প্রবৃদ্ধি এই দেশে– এনিয়ে লেখাজোখা হয়েছে বিস্তর। আসেমগলু-রবিনসন তাদের 'হোয়াই নেশনস্ ফেইল' বইতে বোৎসায়ানাকে প্রায় 'আইকনিক' মর্যাদা দিয়েছেন। সাংবিধানিক ভাবে বোৎসোয়ানার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার বহু-দলীয় গণতন্ত্রের ধারা। কৃষ্ণাঙ্গরা 'মেজোরিটি' হলেও এখানে শ্বেতাঙ্গ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা মুক্তভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। গণতন্ত্রের পিছু-হটার বিপরীত বলয়ের উদাহরণ হিসেবে বরং বোৎসোয়ানাকে তুলে ধরা যায় অনায়াসে, এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এখানেও চিড় ধরেছে গণতন্ত্রে, এবং বহু দিন থেকেই এটা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি এটা একটা বড় ফাটলের রূপ নিয়েছে। যা হতে পারে একটি দীর্ঘ আলোচনা তা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

বহুদলীয় ব্যবস্থা সংবিধানে থাকলেও ১৯৬৫ সাল থেকে একটি দলই শাসন করছে বোৎসোয়ানায়। এর নাম বোৎসোয়ানা ডেমোক্রেটিক পার্টি (BDP)। তবে শাসক দল এক হলেও সরকার-বিরোধীরা এখানে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন না, যেরকমটা হয়েছিল মুগাবের জিম্বাবুয়েতে ও অন্যত্র। একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন সর্বোচ্চ 'দুই টার্ম' পর্যন্ত। কিন্তু এক হিসেবে, শাসনব্যবস্থা দীর্ঘকাল এক পরিবারের মধ্যেই সীমিত হয়ে রয়েছে। BDP-র প্রতিষ্ঠাতা সেরেৎসে খামা (Seretse Khama) প্রায় ১৪ বছর প্রেসিডেন্ট থাকার পর ২০০৮ সালে দেশটির চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হন তারই ছেলে ইয়ান খামা (Ian Khama)। এর আগের দশ বছর ইয়ান খামা আবার দেশটির 'ডেপুটি প্রেসিডেন্ট' ছিলেন। অবশ্য ১৯৮০ থেকে ২০০৮ সাল অবধি প্রেসিডেন্ট এসে ছিলেন খামা-পরিবারের বাইরে থেকে: প্রথমে Quett Masire ১৮ বছর ধরে, তারপর Festus Mogae ১০ বছর ধরে; অতপর ইয়ান খামা শাসন করেছেন ১০ বছর ধরে ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর Mokgaweetsi Masisi প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন। কিন্তু নেপথ্যে কল-কাঠি নাড়ছে কে? দেখা গেছে, 'রাষ্ট্রের ভেতরের রাষ্ট্র' বা Deep State বোৎসোয়ানার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বড় ভূমিকা পালন করছে দীর্ঘকাল ধরেই। ইয়ান খামার সময়েই বিচার-ব্যবস্থার ওপরে হস্তক্ষেপ করা হয়– বিচারকদের ভয় দেখিয়ে, বরখাস্ত করে, তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অপরাধ দমন ব্যুরোর (ডাইরেক্টরেট অন করাপশন এন্ড ইকনমিক ক্রাইম, সংক্ষেপে DISS)-র সহায়তায় বিরোধী দলীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য হুমকি-ধামকি, গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা হয়। কিন্তু বোৎসায়ানার গণতন্ত্রের মূল সমস্যা অন্যত্র নিহিত। দেশটির সবচেয়ে বড় হীরক উত্তোলনের কোম্পানি হচ্ছে DeBeers: গত ৫ দশক ধরে এই কোম্পানিটির সাথে BDP পার্টির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'পাবলিক প্রাইভেট' পার্টনারশীপের মাধ্যমে DeBeers-BDP আঁতাত বোৎসোয়ানার রাজনীতিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ শতাংশই আসে হীরক খনি থেকে। সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসই হচ্ছে DeBeers নিয়ন্ত্রিত হীরক খনি খাত। এর বিনিময়ে নানাবিধ অবৈধ সুবিধে ভোগ করে থাকে DeBeers কোম্পানি। একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টে লেখা হয়েছে:

'Long before the famous capture of the South African state by the Gupta Brothers, it is widely known that DeBeers was appointing ministers and senior public officials in the Botswana government. The relationship between the BDP government and DeBeers may raise serious questions... Whilst these ties provide some stability, the blurring of corporation, state, and the party may be costing the nation hundreds of millions of dollars in lost tax revenue every year and has created an opaque system that involves the country's most critical resourceÑdiamonds'. এই বিবরণী পাঠে মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না কীকরে আসেমগলু-রবিনসন বোৎসোয়ানাকে আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের সামনে 'প্রাতিষ্ঠানিক অভিনবত্বের' একটি রোল-মডেল রূপে চিহ্নিত করলেন? সুস্পষ্টতই, বোৎসোয়ানার বহু-দলীয় গণতন্ত্র এতকাল ধরে নির্বিঘ্নে কাজ করছে এক অঘোষিত সরকারি-বেসরকারি কর্পোরেট এলায়েন্সের মাধ্যমে– একধরনের 'ম্যানেজড্ ডেমোক্রেসির' কাঠামোয়। একে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ধরে বেশি নম্বর দিলেও লিবারেল ডেমোক্রেসির নিক্তিতে কম নম্বর দিতেই হচ্ছে।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি। আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ' ভারতের কথা। ভারতে যে গণতন্ত্র ভালো অবস্থায় নেই তা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। আমি সেই রাজনৈতিক সাহিত্যের নিকট বিশ্লেষণ করতে যাবে না। শুধু প্রথমেই বলব, এই অধঃপতন প্রকট হয়েছে সাম্প্রতিক কালে যদিও, কিন্তু এর শুরু প্রাগ্-মোদি পর্বেই। উদাহরণ হিসেবে আমি পার্থ চ্যাটার্জী-র সহ-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'Anxieties of Democracy' বইটির কথা উল্লেখ করতে পারি। বইটি ২০১২ সালে প্রকাশিত এবং এর উপ-শিরোনাম ছিলো: 'Tocquevillean Reflections on India and the United States'। এরকম উপ-শিরোনামের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সুদীপ্ত কবিরাজ– বইটির প্রথম প্রবন্ধটিতে। টোকভিলের গণতন্ত্র বিষয়ক চিন্তাকে তিনি দুই-স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা সীমিত থাকছে 'গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা' (Democratic Government) নিয়ে; দ্বিতীয় স্তরে আলোচনা নিবদ্ধ হচ্ছে 'সমাজের গণতান্ত্রায়ন'-এর (Democratic Society) প্রতি। টোকভিল তার Democracy in America বইটির প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছেন প্রথম স্তরটি নিয়ে; এ বইয়ের তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত দ্বিতীয় খণ্ডে মনোযোগ পড়েছে দ্বিতীয় স্তরের ওপরে। টোকভিল হয়ত বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র-পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা চলতে চলতে একসময় এমন অবস্থায় পৌঁছানো যাবে যে রাজনৈতিক সমতার গণতন্ত্র সামাজিক গণতন্ত্রেরও সৃষ্টি করবে– মার্কসের সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁকুনি ছাড়াই। সে যাহোক, ভারতের গণতন্ত্র আলোচনার ক্ষেত্রে 'গণতান্ত্রিক সরকার' ও 'গণতান্ত্রিক সমাজ' এই পার্থক্য-নির্দেশটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হতে পারে। যদি প্রথমটি 'ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির' মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টির অর্জন অনেকটাই নির্ভর করছে 'লিবারেল ডেমোক্রেসির' সাফল্যের ওপরে। সেদিক থেকে দেখলে ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা তথা ইলেকটরাল

ডেমোক্রেসি মোটামুটি বিতর্কের উর্ধ্বে থাকলেও সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়নি। জাত-পাতের ভেদাভেদ তো পূর্বাপর ছিলই, এর সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্ম-নিয়ে ভেদবুদ্ধি, ধর্ম-ভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদ ও হানাহানি। ইউরোপ এনলাইটেনমেন্টের কালে একভাবে যুক্তি ও বিশ্বাসকে মিলিয়েছিল– ইমানুয়েল কান্ট 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' গ্রন্থে স্মরণযোগ্যভাবে বলেছিলেন, 'I therefore had to annul knowledge in order to make room for faith'। টোকভিলের মতে, আমেরিকা এই কাজটি আরো ভালোভাবে পেরেছিল। সমস্ত ডলারের গায়ে যেমন লেখা থাকে 'ইন গড উই ট্রাস্ট', তেমনি বিশ্বাসকে আধুনিক বাণিজ্যের ভেতরে মুদ্রিত করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সময়ে ১৯৫৬ সালে প্রতিটি ডলারের গায়ে এই আস্থার বাণী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু টোকভিল যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সমীকরণের ক্ষেত্রে মার্কিন অসাধ্যসাধনাকে অনেক আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য: আমেরিকার সংস্কৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে '[it combined] two distinct elements, which in other places have been in frequent disagreement, but which the Americans have succeeded in incorporating to some extent one with the other and combining admirably. I allude to the spirit of religion and the spirit of liberty'। টোকভিল আরো বলেছিলেন যে নৈতিক জগতে মার্কিনীরা ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল। আবারো মূলের উদ্ধৃতিতে ফিরে যাই: '...in the moral world everything is classified, systematized, foreseen and decided beforehand: in the political world everything is agitated, disputed and uncertain.' দুঃখের বিষয়, টোকভিলের এই মন্তব্যগুলো American Exceptionalism-র উদাহরণ হিসেবেই পড়তে হচ্ছে আমাদের।

ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি, উদ্ভাবনী ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এসবের মধ্যে মেল বন্ধন ঘটানো যায়নি বা সম্ভব হয়নি। ধর্ম এখানে সমাজকে ধারণ করতে পারেনি; মুক্তির সাধনার সাথে ধর্মের সাধনা প্রথম দিকে (উনিশ শতকের কথা বলছি) যা-ও বা একসাথে চলার উপক্রম হয়েছিল, পরে তেমন আর থাকেনি। ১৮৭০-র দশকের পর থেকে (নির্দিষ্ট করে বললে 'চৈত্রমেলা' যেদিন থেকে 'হিন্দুমেলা' বলে চিহ্নিত হলো) ধর্মের রথ আর প্রগতির রথ ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে গেলো। এখন তো দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান আরো চরমে পৌঁছেছে– শুধু ভারতে নয়, টোকভিলের আদর্শস্থানীয় গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকাতেও। গত কয়েক বছরে ভারতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা গ্রহণের পর নতুনভাবে হিন্দুত্বকে আরো উগ্র আরো রক্ষণশীল ধারায় ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। টোকভিলের নির্দেশিত 'গণতান্ত্রিক সরকার' ও 'গণতান্ত্রিক সমাজ'– এ দুইয়ের পার্থক্য চরমে উঠেছে। এরকম অবস্থায় ভারত যে গণতন্ত্রের সূচকে পিছু হটবে তাতে আর বিস্ময় কী! বিবেকবান মানুষ মাত্রই প্রশ্ন করছেন– কী হচ্ছে ভারতবর্ষে? সংবিধান দেখিয়ে প্রতিবাদী মানুষেরা রাস্তায় নামছেন এবং বলছেন যে এটা তো হওয়ার কথা ছিলো না। অথবা, হয়ত এদিকেই অনিবার্যভাবেই গড়িয়ে যাচ্ছিল ভারত বহুদিন ধরে।

শশী থারুর ভারতে গণতন্ত্রের পিছু হটার একটি ব্যাখ্যা খুঁজতে চেয়েছেন তার একটি সাম্প্রতিক লেখায়। হঠাৎ করে এমনটা ঘটেনি। তিনি মনে করেন এটা গত তিন দশকের ভারতের রাজনীতিতে উপসর্গ হিসেবে বাড়তে বাড়তে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। তার নির্দেশিত সবগুলো কারণের সাথে সহমত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু তার তোলা তর্কটা শোনা জরুরি। শশী থারুর মনে করেন যে, ভারতে 'লিবারেল সেক্যুলারিজম'-এর যে-ধারা আমরা দেখতে পাই গত শতকের ৫০, ৬০, ৭০ কিংবা ৮০-র দশকে, তার মূলে ছিলো বৃহৎ শহর-ভিত্তিক ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত/এলিটদের তরফে গোটা সমাজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ। ১৯৮৯ সালের 'মণ্ডল কমিশন' গঠনের পর থেকে পশ্চাৎপদ জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গুলো বিভিন্ন 'সংরক্ষণ'-র সুবিধা পেয়ে সামাজিকভাবে সচল হতে শুরু করে। হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, যাদের তেমন শিক্ষা-দীক্ষা নেই, বা যারা মফস্বলের ছোট শহরের অধিবাসী, তারা রাজনৈতিকভাবে 'ক্ষমতাবান' হয়ে ওঠে গত তিন দশকে। এরা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের পশ্চাৎপদতার কারণেই এক ভিন্ন ধরনের মানসিকতাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় করতে থাকে যা এলিটিস্ট 'লিবারেল সেক্যুলারিজম'-এর মনোভঙ্গির থেকে অনেকটাই আলাদা। তালিকার দুই নম্বরে শশী থারুর রেখেছেন গ্লোবালাইজেশনের কারণে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া বা backlash against cultural globalization-কে। কসমোপলিটান সেক্যুলার এলিটরা ভারতে নির্বিচারে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন, স্টাইল, রুচি ইত্যাদি আমদানী করছে। এতে করে সনাতনী ভারতীয় মূল্যবোধ মার খেয়ে যাচ্ছে বা আহত হচ্ছে। বলিউডের ছবি, টিভির চ্যানেল, নেটফ্লিক্স, আমাজন এসে এমন সব 'কালচারাল কমোডিটি' উপস্থাপন করছে যাতে করে ভারতীয় সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়ছে। একে প্রতিহত করার জন্য দেশীয় টিভি চ্যানেলে 'সনাতনী মূল্যবোধকে' আদর্শ করা সিরিয়াল-গুলো জনপ্রিয় হচ্ছে স্থানীয় দর্শকদের কাছে। একান্নবর্তী পরিবারের মূল্যবোধ, ধর্ম-ভাবাপন্ন বা ধর্মীয় মোটিফের সিরিয়াল, আধুনিকতা বনাম ট্রাডিশনের লড়াইয়ে ট্রাডিশনের বিজয় লাভ ইত্যাদি প্রাধান্য পাচ্ছে। যেখান শ্রমের বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত, সেখানে নারীরা কল সেন্টারে কাজ করার পর রাতের বেলায় ঘরে ফিরছে– এদৃশ্য রক্ষণশীল বা সনাতনী মূল্যবোধের কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকছে না। তৃতীয়ত, লিবারেল সেক্যুলার এলিটদের ইমেজেও অধঃপতন হয়েছে উদারীকরণের গত তিন দশকে। বড় শহরের উচ্চ-মধ্যবিত্তের লোভ (Greed) এমনই মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা বা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল নেতা বা সেলিব্রেটিরা বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি বা স্ক্যান্ডালের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। যা তাদের লিবারেল ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এদের দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণেই ২০১১ সালে গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের প্রতিবাদ-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। যার রাজনৈতিক ফায়দা নিয়েছে ২০১৪ সালের নির্বাচনে মোদির বিজেপি: 'অচ্ছে দিন' এবং 'দুর্নীতিমুক্ত সরকার' প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে তারা লিবারেল সেক্যুলারদের দল/জোটকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করে। চতুর্থত, বিশ্বজুড়েই লোকদেখানো ধর্মপালনের দিকে ঝোঁক পড়ছে তা তার সাথে প্রকৃত ধর্মের পথে চলার প্রবণতার সম্পর্ক থাকুক বা না-ই থাকুক। ভারতেও বারো মাসে তেরো পার্বণ এখন আরো বেশি ঘটা করে পালিত হচ্ছে; কোন কোন

ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধর্মোৎসবের আমদানী করা হচ্ছে। সব ধর্মের মধ্যেই ধর্মাচার অনুষ্ঠান বাড়ছে এবং আগের চেয়ে বেশি হারে লোক-সমাগম হচ্ছে সেসব অনুষ্ঠানে। পঞ্চমত, ভারতে ৩৫ বছরের নীচে জনসংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ৬৫ শতাংশ। এই বিপুল পরিমাণ তরুণ জনগোষ্ঠী পুরোনো ধারার রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এমন একজন আত্মনির্ভরশীল, নিজেকে জাহির করতে সক্ষম, 'জাতীয়তাবাদী' নেতা খুঁজছে যিনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারবেন। কংগ্রেসের লিডারশীপের মধ্যে তারা এটা পায়নি। সবশেষে, সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বময় উপস্থিতির কারণে মানুষ তার সব যুক্তিরহিত তর্ক, কুসংস্কার, ভুল ধারণা ও ভুল তথ্য অবলীলায় জনসমক্ষে পেশ করতে পারছে তাতে করে কট্টরপন্থী রক্ষণশীল মতবাদের দ্রুত প্রচার ও প্রসার সম্ভবপর হচ্ছে। যেটা আগের আমলের রাষ্ট্র ও কর্পোরেট মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমের (পত্র-পত্রিকা, রেডিও বা টিভি চ্যানেল) সুবাদে সম্ভবপর ছিলো না। এসব কিছুর ফল-পরিণামে ভারতে 'অর্থনৈতিক প্রগতির' সাথে সাথে 'রাজনৈতিক অবনতি হচ্ছে'। যে সম্ভাবনার কথা ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি সেমিনারে আমি উত্থাপন করেছিলাম। শশী থারুর যেটা লিখেছেন এই প্রবণতা অন্যান্য দেশেও পরিদৃষ্ট হয়। বলা যেতে পারে যে, একটা রক্ষণশীল উগ্র জাতীয়বাদী মানসিকতার উত্থান দেখছে সারা বিশ্বই। এর মূলে হয়তো আছে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগের সংকোচন, বাণিজ্যিক গ্লোবালাইজেশনের পিছু-হটা, স্থানে স্থানে যুদ্ধ ও প্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধপীড়িত এলাকা থেকে বড় আকারে অভিবাসনের প্রবণতা। কিন্তু এই উত্থানের পেছনে পূর্বতন লিবারেল ডেমোক্রেটিক ব্যবস্থার পদস্খলনেরও ভূমিকা কম নয়। লিবারেলদের দুর্নীতি, অপশাসন, 'মুখে এক, কাজে আরেক' নীতিমালা প্রভৃতি অনভিপ্রেত পদক্ষেপও কম দায়ী নয় রক্ষণশীলদের বা Illiberal Democrats দের হাত পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে।

এখন আমরা দেশে দেশে গণতন্ত্রের পিছু-হটার আলোচনার একটি পরিসংখ্যানগত সার-সংক্ষেপের দিকে এগুতে পারি। পরিশিষ্টের সারণী ২-তে এরকম একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি ইতোপূর্বে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ও লিবারেল ডেমোক্রেসির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিলাম, সারণীটিতে সেরকম একটি ভেদরেখা টানা হয়েছে এ-দুইয়ের ভেতরে। আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসংগিক হবে এমন ৬৩টি দেশ এখানে বেছে নিয়েছি।

প্রথমত, স্বাভাবিকভাবেই উন্নত ও অনুন্নত গণতন্ত্রের মধ্যে 'গণতন্ত্রের স্কোরে' পার্থক্য থাকবে এবং তা এখানেও রয়েছে। যেকোন নিরিখেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো– যেমন নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি– গণতন্ত্রের স্কোরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। তবে এই গ্রুপে লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশ কিছু তৃতীয় বিশ্বের বা একদা-তৃতীয় বিশ্বের দেশও প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, কোস্টা রিকা (যেখানে বহু আগেই সামরিক বাহিনী

আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল), উরুগুয়ে, চিলি, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশও এখানে স্থান পেয়েছে– স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার তাহলো, এই সর্বোচ্চ গণতন্ত্রের গ্রুপেও 'পিছু-হটা' পরিলক্ষিত হচ্ছে। চেক প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানীতে গণতন্ত্রের সূচকে লক্ষ্যণীয় অধঃপতন হয়েছে। সুইডেনেও এই সূচকে সামান্য অবনতি দেখা যায় (উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের তথ্য– আরো অনেক দেশের মত– এই সারণীতে নেই, কিন্তু সেখানেও গণতন্ত্রের সূচকে স্থবিরাবস্থা বিরাজ করছে)। উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলোতেও গণতন্ত্রের পিছু-হটার এই পরিসংখ্যানগত প্রবণতা ইতোপূর্বে আলোচিত এডোয়ার্ড লুচে-র Retreat from Western Liberalism-র থিসিসকে সমর্থন করে। বিশেষ করে ট্রাম্প শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকের পতন হয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। উন্নত দেশে উদারনৈতিকতার পিছু হটার ব্যাখ্যা মেলে এসব দেশে জাতি-বিদ্বেষ, অভিবাসন বিরোধী মনোভাবের দ্রুত উত্থান, দক্ষিণপন্থি জাতীয়তাবাদী (এমনকি নাজীবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক) দল ও গোষ্ঠীর তাৎপর্য্যপূর্ণ শক্তি সঞ্চয় এসবের আলামতে। এর ফলে লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে চাপ পড়তে বাধ্য। স্টিভেন লেভিটস্কি ও ডানিয়েল জিবলাট তাদের ২০১৮ সালের 'How Democracies Die' বইতে যুক্তরাষ্ট্র সহ এসব দেশে গণতন্ত্রের মূল্যবোধজনিত বিপর্যয় সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা এই সারণীর তথ্য-উপাত্তের সাথে মিলে যায়।

দ্বিতীয়ত, উন্নত গণতন্ত্রের পরিসর টানা হয়েছে লিবারেল ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে যখন গণতন্ত্রের সূচক থাকে ০.৭০ এবং ০.৯০-র ভেতরে। এটি প্রথম গ্রুপ। দ্বিতীয় গ্রুপে বা মাঝারী গণতন্ত্রের দেশসমূহে সূচকটি থাকছে ০.৫০ এবং ০.৬৯-র এর ভেতরে। তৃতীয় গ্রুপে বা নিম্ন-মাঝারী গণতন্ত্রের সূচকটি ০.১০ এবং ০.৫০-র এর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে। আর চতুর্থ গ্রুপে বা সবচেয়ে কম গণতন্ত্রে উক্ত সূচক থাকছে ০.১০-র নীচে। উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলো বাদ দিলে আমরা যা পাই, তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্নমুখী সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পর্যায়ে উন্নত গণতন্ত্রের স্তরে নিজেদের উঠিয়ে নিতে পেরেছিল। কিন্তু সিংগাপুরের ক্ষেত্রে সেটা খাটেনি। দেশটিতে গণতন্ত্রের সূচক চীনের মতো 'সর্বনিম্ন স্তরে' না হলেও থাকছে বেশ নীচুতেই অর্থাৎ তৃতীয় গ্রুপে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেগবান হলেই বা মধ্য-আয়ের দেশে পৌঁছালেই গণতন্ত্রের মান উন্নত হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতে ৭-৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতে লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পতন হয়েছে। পোলান্ড ও হাংগেরীর অর্থনৈতিক বিকাশ গণতন্ত্রের সূচকে তাদের দ্রুত পিছু-হটাকে রোধ করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের মহাশক্তিধর রাষ্ট্র ইসরায়েলকে ঐ এলাকার 'প্রাগসর গণতন্ত্র' বলে কেউ কেউ এখনো মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু সেখানেও উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী গণতন্ত্রের লক্ষ্যণীয় অবনতি হচ্ছে। মালয়েশিয়া মডেলের কথা আমাদের দেশে ইদানীং অনেককে বলতে শোনা যায় (তার হয়ত একটি কারণ, এদেশের এলিটদের একাংশ এখন মালয়েশিয়াকে 'দ্বিতীয় জন্মভূমি' হিসেবে বেছে নিয়েছেন)। মালয়েশিয়ায়

গণতন্ত্রের সূচকে সাম্প্রতিক কালে কিছুটা উন্নতি হলেও তা এখনো তাকে মাঝারী গণতন্ত্রের তালিকায় প্রবেশ করাতে পারেনি। পাকিস্তানে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির নিক্তিতে অতি-সাম্প্রতিকে লক্ষ্যণীয় উন্নতি দেখা দিলেও আমাদের মূল নির্দেশক লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে অধোগতি হয়েছে আগের চেয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলংকা (ভারতের মতই) মাঝারী আয়ের ও মাঝারী গণতন্ত্রের দেশ। ভারতের মতই শ্রীলংকাতেও লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে তাৎপর্যপূর্ণ অধোগতি দেখা গেছে। উগ্র সিনহালা জাতীয়তাবাদের উত্থান, তামিল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা-অভিযান, ধর্মগত বিভেদ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে 'মানব-উন্নয়ন' সূচক-খচিত দেশটির লিবারেল গণতন্ত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আমরা ইতোপূর্বে আফ্রিকার 'পোস্টার-বয়' রুয়ান্ডার কথা বলেছিলাম। সেখানেও শ্রীলংকার মতই লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটেছে– পল কাগামের সুশাসন-খ্যাতি সত্ত্বেও। ইথিওপিয়ায় সম্প্রতি কালে গণতন্ত্রের সূচকে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সেখানে লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচক ২০১৬-র দিকে খুব বেশি নীচে নেমে গিয়েছিল। ফলে এই উন্নতিকে 'পুনরুদ্ধারের চেষ্টা' বলতে হয়– এর বেশি কিছু নয়। প্রত্যাশিতভাবে, তুরস্কের লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকে পতন অব্যাহত রয়েছে– এরদোয়ানের একনায়কসুলভ অবস্থানের সাথে যা সংগতিপূর্ণ। 'আরব বসন্ত' নতুন গণতন্ত্রের সূচনা করতে পেরেছে কেবল তিউনিসিয়ায় (যেটি মাঝারী গণতন্ত্রের দেশ এবং সেখানে সূচকের উন্নতি হচ্ছে)। অন্যত্র, যেমন মরক্কোয়, সূচক হয় আটকে আছে নিম্ন-মাঝারী গণতন্ত্রে; অথবা দ্রুতই সূচক নীচে নেমে যাচ্ছে, যেমন এটা ঘটেছে শোচনীয়ভাবে মিশরে ও আলজেরিয়ায় প্রত্যাশিতভাবে। পুতিনের রাশিয়া গণতন্ত্রের সূচকে স্থবির হয়ে আছে; যেমন এটা হচ্ছে ইরানে– সাম্প্রতিক বছরগুলোয়। উদার অর্থনীতির দেশ থাইল্যান্ড: গণতন্ত্রের সূচকে নিম্ন-মাঝারী গণতন্ত্রের একেবারে নীচের সারিতে অবস্থান করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরেকটি দেশ ইন্দোনেশিয়ায় যেখানে ২০১৮ সালে লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচক ছিলো ০.৫০৫, থাইল্যান্ডে তার মান ছিলো মাত্র ০.১০২। দ্রুত-প্রবৃদ্ধিশীল ভিয়েতনামে গণতন্ত্র ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। আর, চীন বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের দ্বি-বিধ সূচকেই সবচেয়ে অনুন্নত গণতন্ত্রের দেশ! এক্ষেত্রে চীনের নিকটতম তুলনা কেবল বুরুন্ডি, সৌদি আরব ও উত্তর কোরিয়া– প্রথাগত সমাজতন্ত্রীদের এনিয়ে দুর্ভাবনার কিছু কারণ রয়েছে বৈকি। অর্থনৈতিক দ্রুত অবনতির সাথে সাথে ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্রের দ্রুত পতন হয়ে চলেছে; মাঝারী গণতন্ত্রের দেশ বলিভিয়ায় ও ইকুয়েডরে নিকট ভবিষ্যতে কী হয় তা এখন দেখার বিষয়। মোট কথা, গণতন্ত্রের পিছু-হটার (বা উন্নয়নের) পেছনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর বা প্রবৃদ্ধি কোনটাই নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে না। বেশির ভাগ দেশেই গণতন্ত্র পিছু হটছে।

তৃতীয়ত, লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচকের মান সাধারণভাবে ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির সূচকের মানের চেয়ে কম। এই সম্ভাবনার কথা লেখাটির গোড়ার দিকে ব্যক্ত করা হয়েছিল এবং এই অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যাপক ডানি রডরিকের লেখার সূত্র ধরে বলার চেষ্টা হয়েছিল যে গণতন্ত্রের প্রকৃত সূচক ইলেকটরাল

ডেমোক্রেসি নয়; লিবারেল ডেমোক্রেসির উপস্থিতিকেই প্রধান বিবেচনা করতে হবে। সারণী-২ থেকে এই দুটো সূচকের মধ্যে ব্যবধান বা Divergence-র প্রবণতাও বের হয়ে আসে। প্রথম গ্রুপের উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলোর জন্য 'লিবারেল' ও 'ইলেকটরাল' ডেমোক্রেসির সূচকের মানে ব্যবধান কম; কিন্তু পরবর্তী গ্রুপ-ভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই ব্যবধান পর্যায়-ক্রমে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ যত কম স্তরের গণতন্ত্র, লিবারেল ডেমোক্রেসি ও ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির সূচকের মধ্যে 'ডাইভারজেনস্' সেখানে তত বেশি (মোটা দাগে, 'প্রবণতা' হিসেবে এটা বলছি, কেননা এনিয়ে আরো পরিসংখ্যানগত হিসেব-নিকেশ করতে হবে)। প্রথম গ্রুপের দেশগুলোর তুলনায় দ্বিতীয় গ্রুপে এই ব্যবধান আরো বেশি; তৃতীয় গ্রুপের দেশের জন্য এই ফারাক আরো বেশি চোখে পড়ে; আর চতুর্থ গ্রুপের অধিকাংশ দেশের জন্য এই ব্যবধান বা প্রতি-তুলনা আরো প্রকট। উদাহরণত, প্রথম গ্রুপের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে (২০১৮ সালে) ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির সূচক ছিলো ০.৮৩৪ এবং লিবারেল ডেমোক্রেসির সূচক ছিলো ০.৭৪১; অর্থাৎ ব্যবধানের পরিমাণ ছিলো ১২ শতাংশ। একইভাবে, ফ্রান্সের জন্য এই ব্যবধান ছিলো ১০ শতাংশ। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপের দেশ আর্জেন্টিনায়, শ্রীলংকায় ও ভারতে এই দুই সূচকে ব্যবধান ছিলো যথাক্রমে ২১ শতাংশ, ৩৯ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ। তৃতীয় গ্রুপভুক্ত দেশ ফিলিপাইনে এই ব্যবধান ছিলো ৬২ শতাংশ; কেনিয়ায়– ৫০ শতাংশ, পাকিস্তানে– ৬০ শতাংশ; রুয়ান্ডায়– ৫৮ শতাংশ; তুরস্কে– ১৫১ শতাংশ; এবং রাশিয়ায়– ১২৯ শতাংশ (বাংলাদেশে এই ব্যবধান ১৬০ শতাংশ)। চতুর্থ গ্রুপভুক্ত দেশ ভেনেজুয়েলায় লিবারেল ডেমোক্রেসি ও ইলেকটরাল সূচকের মধ্যকার ব্যবধান পৌঁছেছে ১৫৯ শতাংশে; কম্বোডিয়ায় তা এসে দাঁড়িয়েছে ২২১ শতাংশে; এবং নিকারাগুয়ায় প্রায় ২৯৫ শতাংশে! এ থেকে এরকম অনুমান করা শক্ত নয় যে, যে দেশের রাজনৈতিক কাঠামো যত দুর্বল– বা ল্যারি ডায়মন্ডের (২০১৫) ভাষায় গণতন্ত্রের স্তর যত দুর্বল– সেদেশেই নির্বাচনী গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে ফারাক তত বেশি, এবং সেদেশেই লিবারেল ডেমোক্রেসির নিক্তিতে গণতন্ত্রের পিছু-হটার সম্ভাবনাও তত বেশি। এর একটি পদ্ধতিগত অনুসিদ্ধান্ত এই যে, গণতন্ত্র বিচারের ক্ষেত্রে 'লিবারেল ডেমোক্রেসি' সূচকটিকেই বেশি প্রাধান্য (Weight) দেওয়া উচিৎ, কেননা 'ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি'র সূচকটি প্রায়শ গণতন্ত্র সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়ে থাকে বা দিতে পারে।

এই পর্বের সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই গণতন্ত্র পিছু-হটছে। এটা শুধু দুর্বল গণতন্ত্রের দেশে হচ্ছে না; প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশেও ঘটছে। এই পিছু-হটার ক্ষেত্রে নির্বাচন সুষ্ঠভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটাকে অর্থাৎ ইলেকটরাল ডেমোক্রেসিকে আমরা মানদণ্ড হিসেবে ধরিনি। জোর দিয়েছি সেদেশে গণতন্ত্র কতটা উদারনৈতিক ধারার অর্থাৎ লিবারেল ডেমোক্রেসি কতটা চর্চিত হচ্ছে তার ওপরই। সেই নিক্তিতে ৬৩টি দেশের নমুনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৩১টি দেশে লক্ষণীয়ভাবে গণতন্ত্রের সূচকে অবনতি হয়েছে এবং আরো ১২টি দেশে কোন উন্নতি হয়নি বা স্থবিরাবস্থা বিরাজ করছে। এই দুটো মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে ৬৮ শতাংশ দেশেই গণতন্ত্র হয় পিছু হটছে, নয় স্থবির হয়ে আছে। এরকম

পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো দুর্বল গণতন্ত্রের দেশে কতটুকু কী করা সম্ভব? পরবর্তী অধ্যায়ে এসম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখছি।

৬. বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্য

উপরের আলোচনা থেকে দুটো প্রবণতা বেরিয়ে আসে। এক, যেসব দেশে গণতন্ত্র ছিলো, তার গুণগত মান নেমে যাচ্ছে বা সরাসরিভাবে রাখ-ঢাক না করেই অ-গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। দুই, উনিশ শতকেও প্রকৃত অর্থে কোথাও 'উদারনৈতিক গণতন্ত্র' ছিলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কিছু দিনের জন্য 'উদারনৈতিক গণতন্ত্র' আসলেও প্রায়-সর্বত্র উদার নীতিমালা থেকে পিছু হটছে এখন এই দেশগুলো। পাশ্চাত্যের লিবেরালিজমের এই 'রিট্রিট' চলতি শতকের দশের দশকে ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ দেশেই এখন স্পষ্ট প্রবণতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। চলতি শতকের বিশের দশকে লিবারেল ডেমোক্রেসির এই পতনের ধারা আরো ত্বরান্বিত হবে। এমনকি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোয় যেখানে শুধু লিবারেল ডেমোক্রেসি নয়, এর চেয়েও আরো ভালো সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ধারা বজায় ছিলো, তাতেও হোঁচট খাওয়ার অনেকগুলো 'এপিসোড' আমরা সাম্প্রতিক কালে দেখেছি। বিশেষত ইমিগ্রেশন ওয়েভ-র কালে এটা দেখেছি বড় আকারে যা আমাদের ব্যথিত ও বিস্মিত না করে পারেনি। তাছাড়া এই দেশগুলো নিজেদের সোস্যাল ডেমোক্রেসি দাবি করার পরও মারণাস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে এখনো লজ্জিত নয়। সুইডেন বিশ্বের অস্ত্র-বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগান দাতা, যা বিক্রি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকায় (মুখে শান্তির কথা বলে, অস্ত্রের বাজার দখলের লড়াই কোনভাবেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়)। তারপরও এটা চলছে রাখ-ঢাক না করেই 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা' তত্ত্বের শিখণ্ডীকে সামনে রেখে। অর্থাৎ বলতে চাইছি যে এডোয়ার্ড লুচে ঠিকই বলেছেন, পাশ্চাত্য তার নিজেরই প্রচারিত লিবারেল মূল্যবোধ থেকে সরে আসছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে যদিও এখনো ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি টিকে আছে, কিন্তু সেসব নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান বা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে কথা উঠেছে। উদারনৈতিক মূল্যবোধের ধস নামার কারণে লিবারেল ডেমোক্রেসির পতন হচ্ছে। তাতে করে (আমরা যে সংজ্ঞায় কাজ করছি) আর গণতন্ত্র থাকে না; জন্ম নেয় হয় Illiberal Democracy অথবা Competitive Authoritarianism-এর।

বিশ্বজোড়া উপরোক্ত দুটি প্রবণতা থেকে বাংলাদেশ বাদ থাকতে পারে না; চাইলেও একে এড়ানোর সার্মথ্য নেই দেশটির। সুতরাং 'মিশ্র গণতন্ত্রই' (Mixed Democracy) আমাদের আসন্ন ভবিতব্য। একটি অন্তবর্তীকালীন পর্যায় পর্যন্ত এই মিশ্র গণতন্ত্রকেই সম্ভাব্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হতে পারে। এমনিতেই এখানে গণতন্ত্রের বয়স বেশি দিনের নয়। তার উপর প্রতিকূল আঞ্চলিক ঘটনা-প্রবাহ (মোদির ক্ষমতায় ফেরা, মায়ানমারের আধা-সামরিক শাসনতন্ত্র, জঙ্গীবাদের উত্থান) সব সময় একটা নিরাপত্তাজনিত চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাছাড়া দেশের ভেতরে অনেক বছর ধরেই চলছে টান টান

উত্তেজনা: সামান্য স্ফুলিঙ্গ এখানে দ্রুতই অগ্নিকান্ডের রূপ নেয় যখন তখন। ইতিহাস নিয়ে বৃহৎ দুটি দলের এলিটদের মধ্যে এখনো ঐকমত্য আসেনি। যুদ্ধাপরাধের বিচার এখনো অসমাপ্ত। জেল-হত্যার বিচার হয়নি, একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলারও বিচার হয়নি। প্রতিদিনের 'ল এন্ড অর্ডার' সামলে দেশকে স্থিতিশীল রাখাই একটি বড় কাজ। এক-এগারোর তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনো দগ দগে। ডগলাস নর্থ ও তার সহযোগীরা তাদের লেখায় এলিটদের মধ্যে ন্যূনতম ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা– অন্তত একে অপরকে প্রাণে না মেরে ফেলার প্রতিশ্রুতি– গণতন্ত্রের জন্য একটি পূর্বশর্ত হিসেবে দেখেছিলেন। এরকম 'পলিটিসাইডের' ঝুঁকির ভেতরে গণতন্ত্রকে গভীরতর করা কঠিন। ফলে এতে করে বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের পিছু-হটার প্রবণতার মধ্যে বাংলাদেশেও যে গণতন্ত্রে পিছুটান অনিবার্য ভাবে দেখা দেবে তা অপ্রত্যাশিত নয়। বস্তুত এরকম গণতান্ত্রিকভাবে অস্থির সময়ে সুস্থ অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া রীতিমত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। সংগত কারণেই এখানে আত্মহত্যা না করতে চাইলে সাময়িক কালের জন্যে হলেও হয় গণতন্ত্রকে কম অনুদার আচরণ করতে হবে (Illiberal Democracy-র কাছাকাছি কিছু) অথবা আশ্রয় করতে হবে সরাসরি প্রতিযোগী আধিপত্যবাদী শাসনের (Competitive Authoritarianism-র কাছাকাছি কিছু)। যদি 'অর্থনৈতিক অধিকারকে' (রডরিকের প্রথম গ্রুপের Property rights) সম্প্রসারিত করা যায় এবং সামাজিক স্বাধীনতাকে (রডরিকের তৃতীয় গ্রুপে Civil rights) সুরক্ষিত করা যায়, তবে 'রাজনৈতিক অধিকার' কিছুটা ক্ষুন্ন হলেও দেশ এগুতে পারবে। যতক্ষণ-না পর্যন্ত পরিস্থিতি আবার পূর্ণতর গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী হয়ে উঠছে। কোন ধরনের উদ্বেগ থেকে ১৯৭৫ সালে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক মোড় ফেরার জন্য– সাময়িক কালের জন্যে হলেও– অন্তবর্তী কালের জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে 'বাকশাল' প্রবর্তন করা হয়েছিল তা এর থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। কিন্তু একুশ শতকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বছরের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা এই ইতিহাসের শিক্ষার মধ্যে আটকে থাকব কেন? এখানেও সৃষ্টিশীল কিছু করার সুযোগ রয়ে গেছে আমাদের। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই চলছে অপূর্ণ বা মিশ্র গণতন্ত্র– কিন্তু তার রয়েছে নানা রূপ, নানা ধরনের কার্যকারিতা। আমাদের দেশের মিশ্র গণতন্ত্রকে অর্থনীতি ও সমাজের জন্য মধ্য মেয়াদে কী করে আরো গতিশীল করা যায় সেটাই আমাদের জন্য একটি বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক চ্যালেঞ্জ। আজকের যুগে এরিস্টটল-প্লেটো থাকলে তাদের একাডেমিতে বসে এই আলাপকে ঘিরেই আরেকটি 'রিপাবলিক' রচনা করতেন।

ক্লাসিকদের রচনার আলোকে আমি এখানে শুধু একটি দক্ষ মিশ্র গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য 'বিল্ডিং ব্লক'-এর প্রসংগ উত্থাপন করতে পারি। প্রথমত, 'উদারনৈতিক ধারাকে' ধরে রাখা এবং তাকে আরো অগ্রসর করে নেওয়া জরুরি। রাজনৈতিক নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, লিবারেল ডেমোক্রেসির মূল কথাই হলো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, মত ও চিন্তাকে ফুকোর প্যাস্টোরাল পাওয়ার (Pastoral Power)-এর মতো করে লালন করা। এক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা

ও মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি থাকাটাই একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। যেটা পাশের দেশ ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উদাহরণ দিয়ে একটু আগে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিদিনের অনুশীলনের দ্বারাই 'নবায়িত' করতে হয়; নইলে তাতে মরচে ধরে যায়। অতি-সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মাজাহাব ও ধর্মমতের স্বাধীনতা নিয়ে একটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধান যোগ্য (প্রথম আলো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে উদ্ধৃত):

'আমি ভালো মুসলমান, না উনি ভালো মুসলমান, এটা বলার দায়িত্ব তো আল্লাহ কাউকে দেয়নি, এটা বিচার করার অধিকারও কাউকে দেয়নি। আল্লাহ তো বারবার বলেছে, কোরআন শরিফেও বলা আছে, শেষ বিচার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করবেন। সে ধৈর্যটা থাকবে না কেন? কারও ধর্মীয় মতে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না। সূরা কাফিরুনে স্পষ্ট বলা আছে, "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" যার যার ধর্ম তার কাছে। যার যার ধর্ম সে পালন করবে।' এখানে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা সাংবিধানিক ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থকে সমৃদ্ধ করেছে। ইউরোপের থেকে ধার-করা যুক্তিতে এখানে তর্ক করা হয়নি। যুক্তি ও বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়া এ দেশের মূল্যবোধের ওপরে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য উত্থাপন করা হয়েছে, যা 'ধর্মনিরপেক্ষতা-উত্তর সমাজ' গঠনের ইংগিত দেয়। দার্শনিক হাবেরমাস– ইউরোপের প্রেক্ষিতে– আসন্ন 'পোস্ট-সেক্যুলার' যুগ ইতোপূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মোট কথা, ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা– যা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ– তাকে যক্ষের ধনের মতো রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির মধ্যকার সম্পর্কে 'পুনর্বিন্যাস' করা প্রয়োজন। যারা সিভিল সোসাইটির ছদ্ম-আবরণে পোলিটিক্যাল সোসাইটির অংশীদার হতে চায়, বা যারা ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চায় রাজনৈতিক পরিচয় না নিয়েই, আমি এখানে তাদের কথা বলছি না। তাদেরকে আমি Political Party হিসেবে দেখি। আমি এখানে বলছি, জ্ঞান-উৎপাদক শ্রেণির কথা। চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের যুগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে 'জ্ঞান' (knowledge)-এর ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জ্ঞানের 'উৎপাদনকারী' ও 'ব্যবহারকারীর' মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। প্লেটোর একাডেমি এথেন্স থেকে অনেকটাই দূরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনীতির ক্ষমতা ভাগাভাগিতে মাথা না গলালে সেই একাডেমির কাজে রাষ্ট্র-পর্যায় থেকে হস্তক্ষেপ করা হতো না। আমাদের জ্ঞানকেন্দ্রগুলোকেও সেভাবেই দেখতে হবে, যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান এসব একেকটি প্রাণচঞ্চল জ্ঞান-পিপাসু 'একাডেমিতে' পরিণত হয়। এটা যে এখন হচ্ছে না এর জন্য 'নিয়ন্ত্রক' ও 'নিয়ন্ত্রিত' উভয়েই দায়ি। মিশ্র-গণতন্ত্র হয়েও বাংলাদেশ বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে যদি এর নালন্দা-তক্ষশীলাগুলো জ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হতে পারে। আমলাতন্ত্রে মেরিটক্রেসির প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে এ-ও দেখা জরুরি হতো যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে মেরিটক্রেসির চর্চা হচ্ছে কিনা। তাছাড়া শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যানুপাত বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়। 'অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত' শ্রেণি যাতে করে 'আলোকিত মধ্যবিত্ত'

শ্রেণী হয়ে ওঠে, সেটা প্লেটোর রিপাবলিকের একটি মুখ্য স্তম্ভ ছিলো। বাংলাদেশের অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রের মধ্যে থেকেও তেমন একটি আলোকিত মধ্যবিত্তকে লালন-পালন ও বিকাশসাধন সম্ভব।

তৃতীয়ত, সন্দেহাতীতভাবে অর্থনীতিই হচ্ছে বাংলাদেশের অসম্পূর্ণ মিশ্র গণতন্ত্রের 'একিলিস হিল'। চীনের প্রবৃদ্ধি যেমন সেখানকার শাসক ও শাসিতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়, তেমনি বাংলাদেশেও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা ও তাকে বেগবান করা এদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা ও গভীরতর করার জন্য সবচেয়ে দরকারি কাজ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গরিব জনগোষ্ঠীর 'উপরে-ওঠার' ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে; জন-অসন্তোষ দেখা দেবে: রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে; গ্রাস করবে সামরিক শাসনের ছায়া। এখানে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পারফরম্যান্সই সরকারের জন্য 'প্রধান বিরোধী দল'। এই 'পারফরম্যান্স' বাধাগ্রস্ত হতে পারে নানা কারণে। তার মধ্যে অর্থনৈতিক সুশাসনের ঘাটতি হচ্ছে একটি কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতির চালিকাশক্তিগুলো ঠিক মতো কাজ করছে ততক্ষণ এই মিশ্র-গণতন্ত্রের তরণী উজান বেয়ে চলবে। যতক্ষণ বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহ, রপ্তানী সূত্রে প্রাপ্ত আয়, কৃষি খাতের বিকাশের ধারা, আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে, এদেশের গণতন্ত্র লাতিন আমেরিকার মতো (বা 'এক-এগারোর' মতো) কোন ঝুঁকিতে পড়বে না।

সুশাসনের দুর্বলতার কারণে এসব খাতে যেসব সম্ভাব্য ঝুঁকি ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে তাকে রোধ করতে হবে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋণের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া এবং বিদেশে পুঁজির পাচার সর্বাগ্রে যেকোন মূল্যে রোধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দ্রুত প্রবৃদ্ধিকামী পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সুশাসনের ঘাটতি ছিলো, দুর্নীতিও ছিলো (এবং এখনো আছে); কিন্তু সেখানকার বিজনেস এলিটরা অন্যত্র 'সেকেন্ড হোম' করেনি। পুঁজি সেখানে দেশ ছেড়ে যায়নি। বিনিয়োগ দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বৈষম্য বাড়লেও যত বেসরকারি বিনিয়োগ তা দেশের ভেতরেই হয়েছে। 'লুটেরা পুঁজির' পাশাপাশি 'দেশ-ছাড়া পুঁজি' এদেশের সাম্প্রতিককালে বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি-র আনুপাতিক হারে) না বাড়ার মূল কারণ। এ নিয়ে অন্যত্র প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং হবে। কিন্তু এখানে আমার মূল কথা হলো যে, অর্থনীতিই হচ্ছে এদেশের মিশ্র-গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এবং তাকে আরো জনকল্যাণমুখী করার প্রধান রক্ষাকবচ। একে সমস্ত রাজনৈতিক সতর্কতা দিয়ে রক্ষা করতে হবে।

চতুর্থত, ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির দুর্বলতা সত্ত্বেও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ (রাশিয়ার স্থান হচ্ছে অষ্টম)। এর থেকেই এদেশে বিকেন্দ্রীভবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। উদাহরণত, গণতন্ত্রের স্কোরে সর্বনিম্ন স্তরে থাকা চীন (সারণী-২ দ্রষ্টব্য) কিন্তু বিকেন্দ্রীভবনে অনেক ধনবাদী দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। চীনের অর্থনৈতিক সাফল্যেরও

অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীভবন। এটি বাংলাদেশে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে এই শতকের বিশের দশকে। এতে করে মিশ্র গণতন্ত্রের জনকল্যাণমুখীনতা আরো বাড়বে।

পরিশেষে বলব যে, এই প্রবন্ধে মূলত ইলেকটরাল ও লিবারেল ডেমোক্রেসির মধ্যেই গণতন্ত্রের আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে। যেহেতু মূল বিষয়বস্তু ছিলো বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের পিছু-হটা নিয়ে। ইচ্ছে করেই 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসির' আলোচনায় প্রবেশ করা হয়নি। অবশ্য এই আলোচনা থেকেও দেখা গেছে যে, সোশ্যাল ডেমোক্রেসির স্থান এদের মধ্যে সবার উপরে। ইলেকটরাল ডেমোক্রেসির তুলনায় লিবারেল ডেমোক্রেসি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু লিবারেল ডেমোক্রেসির তুলনায় ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিজম ধারার 'লিবারেল সোশ্যাল ডেমোক্রেসি' শ্রেষ্ঠতর (একে অবশ্য 'সমাজতন্ত্র' বলা ভুল)। কিন্তু তারপরও এই ব্যবস্থাকে কেন ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালি– বৃহত্তর অর্থে পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ– গ্রহণ করল না? কেন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি নির্দিষ্ট দ্রাঘিমার উপরের স্ক্যান্ডিনেভিয়াতেই আটকে থাকল গত একশো বছর ধরে? এসব প্রশ্ন আগামীর জন্য তোলা রইল।

সারণী ১

লাতিন আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯০০-২০০৬

দেশ	অভ্যুত্থানের বছর
১। আর্জেন্টিনা	১৯৩০, ১৯৪৩(৩), ১৯৪৪, ১৯৫৫(৩), ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭৬
২। বলিভিয়া	১৯২০, ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৬৪, ১৯৮৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৮, ১৯৭৯(২), ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২
৩। ব্রাজিল	১৯৩০, ১৯৪৫, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৬৯
৪। চিলি	১৯২৪, ১৯২৫(২), ১৯২৭, ১৯৩১(২), ১৯৩২(৪), ১৯৭৩
৫। কলম্বিয়া	১৯০০, ১৯০৯, ১৯৫৩, ১৯৫৭
৬। কোস্টা রিকা	১৯১৭, ১৯১৯
৭। ডোমিনিকান রিপাবলিক	১৯০২, ১৯০৪(২), ১৯০৬, ১৯১১, ১৯১৫, ১৯৩০, ১৯৬৩, ১৯৬৫
৮। ইকুয়াডর	১৯০৬, ১৯১১(৩), ১৯২৫, ১৯৩১, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪৪, ১৯৪৭(২) ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৭২, ২০০০(২)
৯। এল সালভাদর	১৯৩১, ১৯৪৪, ১৯৪৮, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৭৯
১০। গুয়েতমালা	১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৪৪(২), ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬৩, ১৯৮২, ১৯৮৩
১১। হন্ডুরাস	১৯০৩, ১৯০৭, ১৯১১, ১৯১৯, ১৯২৪, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৬৩, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৮০
১২। মেক্সিকো	১৯১৩, ১৯১৪, ১৯২০
১৩। নিকারাগুয়া	১৯১১,১৯২৫, ১৯৩৬, ১৯৪৭
১৪। পানামা	১৯৪১, ১৯৪৯, ১৯৫১, ১৯৬৮, ১৯৮২, ১৯৮৪,১৯৮৮, ১৯৮৯
১৫। প্যারাগুয়ে	১৯০২, ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৮, ১৯১১, ১৯১২, ১৯২১, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৪০, ১৯৪৮, ১৯৪৯(৩), ১৯৫৪, ১৯৮৯
১৬। পেরু	১৯১৪, ১৯১৯, ১৯৩০(২), ১৯৩১, ১৯৩৩, ১৯৪৮, ১৯৬২(২), ১৯৬৮, ১৯৭৫
১৭। উরুগুয়ে	১৯৪২, ১৯৭৩
১৮। ভেনেজুয়েলা	১৯০৮, ১৯৪৫, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৮

উৎস: Lehoucq and Perez-Linan (2014)। একাধিক ক্যু একই বছরে হলে সেটা বন্ধনীর ভেতরে নির্দেশিত হয়েছে।

সারণী ২

ডেমোক্রেসি সূচক : অতি সাম্প্রতিকের প্রবণতা

উন্নত/অনুন্নত গণতন্ত্র	লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স		ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স	
	২০১৬	২০১৮	২০১৬	২০১৮
(ক) ০.৭০-০.৯০				
১। নরওয়ে	০.৮৫৪	০.৮৬৭	০.৮৯২	০.৯১৩
২। সুইডেন	০.৮৭৩	০.৮৬৫	০.৯০৮	০.৯০৩
৩। ডেনমার্ক	০.৮৪৪	০.৮৪৬	০.৮৮১	০.৮৮৮
৪। কোস্টা রিকা*	০.৮৪৪	০.৮৩২	০.৮৯৭	০.৮৯৬
৫। দক্ষিণ কোরিয়া	০.৬৬৯	০.৮০০	০.৭৫৮	০.৮৬৭
৬। উরুগুয়ে	০.৭৮২	০.৭৮৩	০.৮৭০	০.৮৮৪
৭। জার্মানী**	০.৮০৮	০.৭৭৪	০.৮৫৯	০.৮৩৮
৮। স্লোভেনিয়া*	০.৭৯০	০.৭৭৩	০.৮৬০	০.৮২৪
৯। ফ্রান্স ***	০.৮৭৪	০.৭৭৩	০.৯২৫	০.৮৫০
১০। চিলি	০.৭৫২	০.৭৭১	০.৮২৮	০.৮৫২
১১। যুক্তরাষ্ট্র**	০.৭৮৫	০.৭৪১	০.৮৪৩	০.৮৩৪
১২। স্লোভাকিয়া	০.৭০০	০.৭১১	০.৭৯৮	০.৮২৪
১৩। চেক প্রজাতন্ত্র***	০.৭৮০	০.৭০২	০.৮৬০	০.৮২২
১৪। তাইওয়ান	০.৬৮৫	০.৭০০	০.৮০২	০.৮০১
(খ) ০.৫০-০.৬৯				
১৫। আর্জেন্টিনা	০.৬৩৬	০.৬৭৬	০.৭৬০	০.৮১৯
১৬। তিউনিসিয়া	০.৬৫৯	০.৬৭৬	০.৭৪৪	০.৭৪৩
১৭। পেরু	০.৫৮২	০.৬২১	০.৭৩৭	০.৭৫৩
১৮। পানামা	০.৫৮৬	০.৬০৮	০.৭৪৯	০.৭৮৮
১৯। বোৎসোয়ানা	০.৫৭৭	০.৫৮৬	০.৬৮৫	০.৬৯৭
২০। দক্ষিণ আফ্রিকা***	০.৬২৫	০.৫৭৫	০.৭৪৪	০.৭১৭
২১। ইসরায়েল**	০.৫৯০	০.৫৬৮	০.৭৩৩	০.৬৯৮
২২। ব্রাজিল	০.৫৫৫	০.৫৬৩	০.৭১৮	০.৭৪২
২৩। সেনেগাল**	০.৫৮৫	০.৫৫৮	০.৭২৬	০.৭৩৩
২৪। পোলান্ড ***	০.৫৭৪	০.৫৪৮	০.৭০৭	০.৭০৮

উন্নত/অনুন্নত গণতন্ত্র	লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স		ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স	
	২০১৬	২০১৮	২০১৬	২০১৮
২৫। ঘানা**	০.৫৫৩	০.৫৩১	০.৬৮২	০.৬৪৮
২৬। ভূটান	০.৪৫১	০.৫২০	০.৫৪৪	০.৬০৩
২৭। ইন্দোনেশিয়া	০.৫০৬	০.৫০২	০.৬৬৭	০.৬০০
২৮। ইকুয়েডর	০.৩৩১	০.৪৭২	০.৬২৫	০.৬৭৩
২৯। শ্রীলংকা**	০.৫০৯	০.৪৬২	০.৬৫৮	০.৬৪৪
৩০। নেপাল	০.৪৬৪	০.৪৫৮	০.৫৯৩	০.৬০৭
৩১। হাংগেরী***	০.৫৫৩	০.৪৪১	০.৬৭৭	০.৫৩৬
৩২। নাইজেরিয়া*	০.৪৪৯	০.৪৩৫	০.৬০৮	০.৫৭৭
৩৩। ভারত***	০.৪৮৮	০.৪১৭	০.৬৪৮	০.৫৫৭
৩৪। বলিভিয়া	০.৪০৭	০.৩৯৯	০.৬১৩	০.৬৪১
(গ) ০.১০-০.৫০				
৩৫। সিংগাপুর*	০.৩৩৮	০.৩২৬	০.৪৪৮	০.৩৯৭
৩৬। ফিলিপাইন***	০.৩৯৯	০.৩২৪	০.৫৬৬	০.৫২৫
৩৭। কেনিয়া***	০.৩৮২	০.২৯৭	০.৫৩৫	০.৪৪৭
৩৮। মালয়েশিয়া	০.২১৩	০.২৯২	০.৩৪০	০.৩৭২
৩৯। উগান্ডা	০.২৭৫	০.২৬৯	০.৩৪২	০.৩৭৫
৪০। পাকিস্তান	০.২৬৫	০.২৫৯	০.৪২৭	০.৪১৫
৪১। মরক্কো	০.২৪৪	০.২৫৫	০.৩১৩	০.২৯৯
৪২। মায়ানমার**	০.২৭২	০.২৫০	০.৪০৬	০.৩৬০
৪৩। আফগানিস্তান	০.২৩৩	০.২৩৩	০.৩৫৫	০.৩৬৭
৪৪। মালদিভ	০.১৮৫	০.১৭৮	০.৩৯১	০.৩৭৮
৪৫। রুয়ান্ডা**	০.২০৩	০.১৬৪	০.২৬৬	০.২৬০
৪৬। ভিয়েতনাম**	০.১৯৭	০.১৬৯	০.২৫৭	০.২২৪
৪৭। ইথিওপিয়া	০.১১৩	০.১৫৪	০.২৫৪	০.২৮৭
৪৮। মিশর**	০.১৭৭	০.১৪১	০.২১৭	০.২১১
৪৯। তুরস্ক**	০.১৫৯	০.১৩৯	০.৩৪৫	০.৩৪৯
৫০। আলজেরিয়া***	০.১৮৯	০.১৩৯	০.৩৭৯	০.৩০৫
৫১। বাংলাদেশ**	০.১৬৩	০.১৩১	০.৩৬৭	০.৩৪১
৫২। ইরান**	০.১৫৩	০.১৩১	০.২৩০	০.২০৫

উন্নত/অনুন্নত গণতন্ত্র	লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স		ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স	
	২০১৬	২০১৮	২০১৬	২০১৮
৫৩। রাশিয়া	০.১২৪	০.১২৪	০.২৭৮	০.২৮৫
৫৪। সোমালিয়া	০.০৯৫	০.১০৮	০.১৭২	০.১৭৯
৫৫। থাইল্যান্ড	০.১০৩	০.১০২	০.১৪৯	০.১৬০
(ঘ) ০.০১-০.০৯				
৫৬। ভেনেজুয়েলা***	০.১৪৯	০.০৯৩	০.৩৫৭	০.২৪১
৫৭। লাওস**	০.১০৭	০.০৮২	০.০৯৮	০.১২০
৫৮। কম্বোডিয়া**	০.১১৯	০.০৭৯	০.৩০৪	০.২৫৪
৫৯। নিকারাগুয়া***	০.১৫৭	০.০৫৮	০.৩৬১	০.২২৯
৬০। চীন	০.০৫৬	০.০৫৬	০.০৯৬	০.০৯০
৬১। বুরুন্ডি	০.০৫৭	০.০৫০	০.১৯০	০.১৭৯
৬২। সৌদি আরব**	০.০৬০	০.০৪০	০.০২৭	০.০২৮
৬৩। উত্তর কোরিয়া	০.০১৪	০.০১৩	০.০৯৭	০.০৯২

References

Abdullah, A. and Sen, B. (1997). "25 years of Bangladesh: An Optimistic Perspective", Bangladesh Unnayan Shomikhya, Vol. 14, pp. 1-14 (in Bengali).

Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Profile Books, London.

Ahmed, I. (2006). Understanding Terrorism in South Asia: Beyond Statist Discourses, Manohar, New Delhi.

Bates, Robert H. (2006). "The Role of the State in Development" in The Oxford Handbook of Political Economy (eds. by B. R. Weingast and D. A. Wittman), Oxford, pp.708-722.

Chatterjee, P. and Katznelson, I. (2012). Anxieties of Democracy: Tocquevillean Reflections on India and the United States, Oxford University Press, New Delhi.

Chomsky, N. and Foucault, M. (2006). The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature, The New Press, New York.

Chotiner, I. (2019). "Amartya Sen's Hopes and Fears for Indian Democracy: The New Yorker Interview", New Yorker, October 6.

Crick, B. (2002). Democracy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York.

Detienne, M. (1979). Dionysus Slain, Johns Hopkins Press, Baltimore.

Diamond, L. (2008). "The Democratic Rollback-the Resurgence of the Predatory State", Foreign Affairs, 87, 36.
Diamond, L. (2015). "Facing up to the Democratic Recession", Journal of Democracy, 26(1), 141-155.
Fekete, L. (2018). Europe's Fault lines: Racism and the Rise of the Right, Verso, London.
Friedman, B. (2005). Moral Consequences of Economic Growth, Alfred Knopf, New York.
Huntington, S. P. (1991). The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman and London.
Islam, N. (2019). From October Revolution to Fourth Industrial Revolution and the Future of Communism, Eastern Academic Centre, Dhaka (in Bengali).
Islam, T. (2017). "Soviet Democracy: Exploring the Roots of Failure", Samaj, Arthaniti and Rashtra, Vol. 10, pp. 183-220 (in Bengali).
Kant, I. (1996). Critique of Pure Reason, Hackett Publishing, Cambridge.
Karim, S. F. (2019). Plato's Republic, Mowla Brothers, Dhaka (in Bengali).
Khan, A. R. (2019). My Socialism: Rise, Fall and Future of Socialism, Prothoma Prokashan, Dhaka (in Bengali).
Krastev, I. (2018). "Eastern Europe's Illiberal Revolution", Foreign Affairs, Vol. 97, No. 3, pp. 49-59.
Lehoucq, F. and Perez-Linan, A. (2014). Regimes, Competition, and Military Coups in Latin America, Comparative Political Studies, July Issue, accessed at www.researchgate.net.
Levitsky, S. and Ziblatt, D. (20189). How Democracies Die, Crown Publishing, New York.
Lipset, S. M. (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy", American Political Science Review, 53(1), 69-105.
Luce, E. (2017). The Retreat of Western Liberalism. Atlantic Monthly Press, Boston.
Mahmud, W. (2008). "Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges", Indian Journal of Human Development, Vol. 2, No. 1, 2008.
Mounk, Y., & Foa, R. S. (2018). "The End of the Democratic Century: Autocracy's Global Ascendance", Foreign Affairs, Vol. 97, No. 3, pp. 29-38.
North, D., J. J. Wells, B. Weingast (2009). Violence and Social Orders, Cambridge University Press, New York.
Mukand, S., & Rodrik, D. (2015). The Political Economy of Liberal Democracy (No. w21540). National Bureau of Economic Research.
Runciman, D. (2018). How Democracy Ends, Basic Books, New York.
Sen, B. (2014). "How Political Culture Matches 'Poor Economics'," Daily Star, March 15.
Snyder, T. (2018). The Road to Unfreedom, Tim Duggan Books, New York.
Tharoor, S. (2020). "What Happened to India?", Syndicated Column for the Project Syndicate, accessed at www.project-syndicate.org/commentary on January 7, 2020.
Wolin, S. S. (2016). Fugitive Democracy and Other Essays, Princeton University Press, New Jersey.
Zakaria, F. (2007). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and A broad (Revised Edition). WW Norton & company.
Zakaria, F. (1997). "The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs, 76, 22.
Bardhan, P. (2017). "Understanding Populist Challenges to the Liberal Order", Boston Review, May 11, 2017.
Bardhan, P. (2020). "The Achilles Heel of Liberal Democracy", 3 Quarks Daily, February 17, 2020.

নোট:

১। দেশগুলোতে ২০১৮ সালের 'লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স' অনুযায়ী সাজানো হয়েছে: যার যত স্কোর, সেখানে গণতন্ত্র তত বেশি উন্নত;

২। 'লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স' ও 'ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স'-এর পার্থক্য নির্দেশ করা এই সারণির লক্ষ্য;

৩। 'লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স' ২০১৬-১৮ সালের মধ্যে যাদের পতন হয়েছে অন্তত ১ পয়েন্টের মতো তাদেরকে 'গণতন্ত্রের পিছু-হটা' উদাহরণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে এবং একটি * দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং যাদের পতন ২ পয়েন্টের বা তার বেশি তাদেরকে ** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং যাদের ক্ষেত্রে পতন অন্তত ৫ পয়েন্ট বা তার বেশি তাদেরকে *** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪। সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে গণতন্ত্র পিছু হটছে এটা এই সারণী থেকে বের হয়ে আসে। ৬৩টি দেশের এই নমুনায় ৩১টি দেশে লক্ষণীয়ভাবে গণতন্ত্রের সূচকের অবনতি হয়েছে এবং ১২টি দেশে কোন উন্নতি হয়নি। এই দুটো মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে ৬৮ শতাংশ দেশেই গণতন্ত্র হয় পিছু হটেছে, নয় স্থবির হয়ে আছে।

উৎস: V-Dem.Net-এ প্রদত্ত উপাত্ত থেকে লেখক কর্তৃক হিসেবকৃত।

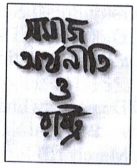

পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগ

গৌতম রায়

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরেও বেশ কিছুকাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অবিভাজিত ছিল। বিষয়টি আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। রীতি অনুযায়ী, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বি-বিভক্ত নাকি ত্রি-বিভক্ত হবে তা নিয়ে পার্টি কংগ্রেসে ছাড়া কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব নয়। সেই সময় দেশভাগজনিত কারণে দুই দেশেই কিঞ্চিৎ অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, শেষ পর্যন্ত '৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার মোট ১২৫ জন প্রতিনিধি ওই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।১

প্রসঙ্গত, সেখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তাহল, এতদিনের পি.সি. যোশী লাইন দক্ষিণপন্থী ও সুবিধাবাদী বলে নিন্দিত হয় এবং পরিবর্তে পার্টির আর এক শীর্ষনেতা বি.টি. রণদিভের লাইন সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে অনুমোদিত হয়। বস্তুত, দীর্ঘদিন ধরে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী মাত্রেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই কারণে রণদিভের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় প্রবল উৎসাহের সঙ্গে। উল্লেখ করা যায়, এর মধ্যে তেভাগা আন্দোলন-খ্যাত রংপুরের প্রবীণ নেতা মণিকৃষ্ণ সেন কংগ্রেসের সভায় রণদিভের লাইনের সমালোচনা করে তিরস্কৃত হন। শাস্তি হিসেবে পার্টি তাকে জেলায় ফিরে যাওয়ার বদলে কলকাতার সদর দপ্তরে কাজ করার নির্দেশ দেয়।২ সেই কারণে '৪৮-৪৯ সালে তেভাগা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রংপুরে অনুপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, রণদিভের থিসিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ছিল এই যে, চতুর্দিকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলে যে কলরব করা হচ্ছে তা আসলে মেকি বা ঝুটা। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। কংগ্রেস ও লিগের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই এখনও বৃটিশ পুঁজি ও আধিপত্য অটুট রয়ে গেছে। অর্থাৎ এই উপমহাদেশে বহাল রয়েছে বৃটিশের পরোক্ষ শাসন।

এই থিসিসের অনুসঙ্গ হিসেবে উঠে আসে একটি স্লোগান, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'।

যেহেতু পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলিম তখন পাকিস্তানের আঙ্গিকে একটি ইসলামি স্বর্গরাজ্যের মায়ায় মোহাচ্ছন্ন ছিল তাই এই স্লোগানের প্রতিক্রিয়া ভারতে যত না হয়েছিল, ওপার বাংলায় হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রসঙ্গত, '৪৮ সালের শেষ দিকে বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইল চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে এক রেল শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে পাক সরকারের জনবিরোধী নীতির সমালোচনা করেন এবং লিগ সরকারকে উৎখাতের জন্যে আহ্বান জানান। তখনি কয়েকজন রেল শ্রমিক সভার মধ্যে সমস্বরে প্রতিবাদ করে বলেন, 'আমরা আমাদের পাকিস্তানের ক্ষতি হতে দেব না। আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার ডাকে আমরা সাড়া দেব না'। মহম্মদ ইসমাইল থমকে গেলেন। তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে বলে যান 'জনগণের মনোভাব আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না'।৩

সেই সময়ের অন্যতম নেতা খোকা রায় লিখেছেন, '৪৭ সালে পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলায় সবমিলিয়ে পার্টি সদস্য ছিলেন ১২ হাজার। তাছাড়া শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত ও নারী সমাজের মধ্যে পার্টির হাজার হাজার সমর্থক ও দরদী ছিল। খোকা রায় লিখেছেন, 'পার্টি বিশেষ শক্তিশালী ছিল দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই ৫টি জেলায়। যশোর, খুলনা ও বরিশালে ধীরে ধীরে দলের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল, কেবল রাজশাহী, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ায় পার্টির গণভিত্তি ছিল দুর্বল। এরমধ্যে আবার তেভাগা ও টংক আন্দোলনজনিত কারণে দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলায় পার্টি সভ্যদের অধিকাংশ ছিল কৃষক, তেমনি ঢাকায় শ্রমিক এবং চট্টগ্রামে মধ্যবিত্ত। যে জেলাগুলিতে দলের সংগঠন শক্তিশালী ছিল সেখানে সদস্যদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। প্রসঙ্গত, এই সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। বলতে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির সামাজিক ভিত্তি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ'।

খোকা রায় আরও লিখেছেন, দেশভাগের পরে দাঙ্গার কারণে হিন্দুদের অবিরল দেশত্যাগের ফলে পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে '৪৯ সালে পূর্ববঙ্গে আর ৩-৪ শত সক্রিয় সদস্যও ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি স্বীকার করেছেন, পার্টি সদস্য, দরদী ও সমর্থকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পরিবারের সন্তান-সন্ততি ছিলেন খুব কম।৪ অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে পার্টির সংগঠন ছিল অতি দুর্বল। বলাবাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে রণদিভের লাইন অনুযায়ী 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' গোছের শ্লোগান দিতে গিয়ে পার্টি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে। উল্লেখ্য, কলকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরের দিন, ৬ মার্চ, শহরের ডেকার্স লেনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উপস্থিত প্রতিনিধিরা একত্রে একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করেন। প্রাথমিকভাবে ৯ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। সদস্যরা হলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাজ্জাদ জহীর (সম্পাদক), মহম্মদ আতা, জামালুদ্দিন বুখারি ও শ্রমিকনেতা ইব্রাহিম এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে মণি সিংহ, নেপাল নাগ, মনসুর হবিব (হবিবুল্লাহ), কৃষ্ণবিনোদ রায় ও খোকা রায়। ওই দিনই ৩০ সদস্যের পূর্ব বাংলার একটি প্রাদেশিক কমিটিও গঠন করা হয় যার

সদস্য ছিলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, ফণী গুহ, বারীন দত্ত, মনসুর হবিব, কৃষ্ণবিনোদ রায়, অনিল মুখার্জী, অমূল্য লাহিড়ী, রবি নিয়োগী, আলতাব আলি, ইয়াকুব মিঞা প্রমুখ এবং প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক মনোনীত হন খোকা রায়।৫

প্রসঙ্গত, রণদিভের দলিলে বলা হয় পার্টির নেতৃত্বে পেটি বুর্জোয়াদের প্রাধান্য থাকায় তা বিপ্লবের কাজে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং শ্রমিক ও কৃষক সদস্যদের নেতৃত্বে তুলে নিয়ে এসে দলের সর্বস্তরে পুনর্গঠন আশু প্রয়োজন।

এই পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় '৪৯ সাল থেকে। প্রথমে ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির যুক্ত বৈঠকে বাতিল হয় দুটি স্বতন্ত্র কমিটি। বলা হয়, যখন স্বাধীনতা ও দেশভাগ আমরা মানি না তখন দুটি আলাদা পার্টিই বা থাকবে কেন। এখানে যেহেতু একটি দেশ সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটিও হবে একটিই। আশু বিপ্লবের দিকে লক্ষ্য রেখে এই কমিটিকে করা হয় ক্ষুদ্রাকার। পুরনো নেতৃত্বের অনেকেই শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি না হওয়ার কারণে নতুন কেন্দ্রিয় কমিটি থেকে বাদ পড়েন। ওপার বাংলার নবগঠিত প্রাদেশিক কমিটিতে সদস্য হন মাত্র ৩ জন রওশন আলি (সম্পাদক), আলতাব আলি এবং আবদুল বারি।৬ এইভাবে সংগঠনের খোলনলচে পাল্টাতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে পড়ে জেলা কমিটিগুলিও।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, '৪৮ সালের ৬ মার্চ রণদিভের থিসিসের অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা ছিল কার্যত তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মত। গোড়া থেকেই কমিউনিস্টরা ছিল লিগ সরকারের দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার। প্রথমত, প্রচার করা হয় কমিউনিস্টরা ধর্মদ্রোহী ও পাকিস্তান বিদ্বেষী। দ্বিতীয়ত, তারা কট্টর হিন্দু ও ভারতের চর। যেহেতু দেশভাগের পর হিন্দু বিতাড়নই হয়ে দাঁড়ায় ওপার বাংলার ব্যাপক মুসলিমের অন্যতম অভীষ্ট এবং কমিউনিস্টদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু তাই গোটা প্রদেশে হিন্দু ও কমিউনিস্ট হয়ে দাঁড়ায় সমার্থক।৭

প্রসঙ্গত, '৪৮ সালে ওপারবাংলার কমিউনিস্টরা উত্তরবঙ্গের নাচোল এলাকায় তেভাগা আন্দোলন, ময়মনসিংহে টংক ও সিলেটে নানকার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। পাল্টা লিগ সরকারও একদিকে যেমন তীব্র দমননীতি গ্রহণ করে তেমনি নানাবিধ অপপ্রচারের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করতেও সমর্থ হয়। বস্তুত, জঙ্গী কৃষক অভ্যুত্থান ঘটানোর অনুকূল পরিস্থিতি তখন ওপার বাংলায় কার্যত ছিল না। বহু নেতা ও কর্মী পুলিশের গুলিতে নিহত হন, কারাগারগুলি রাজবন্দীতে ভরে যায়, আন্দোলনকারী কৃষকরাও সরকারি প্রচারে বশীভূত হয়ে পিছু হঠতে শুরু করে। টংক আন্দোলনের অন্যতম নেতা মণি সিংহ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বিরাট এলাকা জুড়ে সংঘর্ষ হচ্ছিল, আমাদের লোক মারা পড়ছিল, পুলিশের লোক আহত হচ্ছিল। কোথাও কোথাও পুলিশও মারা পড়ছিল। ওই সংগ্রাম দেখে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হল। সরকার ও লিগের প্রতিক্রিয়াশীল পাণ্ডারা বুঝাল - টংক দিতে হয় না, লেভিও দিতে হয় না - এটা তো

খুবই ভাল। কিন্তু এই আন্দোলনে যে পাকিস্তানও ভেঙে যেতে পারে। তারা এই চিন্তায় বিমর্ষ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ...মুসলমান কৃষকেরা টংক ধান দিচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা হাজংদের মত জঙ্গী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছিলেন না'।৮

চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট নেতা শরবিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, 'রণদিভে লাইন আসার পর আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলাম। মাঝারি ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল বাড়িঘর আমাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হল। অথচ ইতিমধ্যেই গরিব কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের অবস্থান হয়ে পড়েছিল আগের তুলনায় দুর্বল ও অসংগঠিত। এর ফল দাঁড়াল এই যে সদস্যদের প্রায়ই অনাহারে, অর্ধাহারে কাটাতে হয়। কমরেডরা অনেকেই আশ্রয়স্থলের অভাবে এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াতে লাগলেন'।৯

সৌভাগ্যবশত এহেন অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। '৫০ সালের প্রথম দিকে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ত শহর থেকে কমিনফর্ম-এর মুখপত্রে প্রকাশিত এক নিবন্ধে রণদিভের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির তত্ত্ব খারিজ করে দিলে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বস্তুত, এই লাইনের বিরুদ্ধে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল, এইবার ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ। পারস্পরিক দোষারোপ, সমালোচনা ইত্যাদি শেষ হওয়ার পর রণদিভের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে গঠিত হয় নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। ওপার বাংলাতেও '৫০ সালেই নেপাল নাগকে সম্পাদক করে তৈরি হয় একটি সাংগঠনিক কমিটি এবং নেপাল নাগ ঘুরে ঘুরে জেলা কমিটিগুলি পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। এরপরে '৫১ সালে কলকাতায় পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক কমিটির এক বর্ধিত বৈঠকে ভারতের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় পার্টির দলিলটি ওপার বাংলার কমরেডদের সামনে পেশ করেন এবং বলেন, এই দলিল পূর্ববাংলার নেতাদের গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তারা নিজেদের দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের নীতি নিজেরাই প্রণয়ন করুন সেটাই কাম্য। অর্থাৎ ওই বৈঠকে দুই দেশের যৌথ কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল হয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার নেতারা স্বাধীনভাবে তাদের প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। কমিটির সম্পাদক হন মণি সিংহ, অন্য সদস্যরা হলেন নেপাল নাগ, শহিদুল্লাহ কায়সার, বারীন দত্ত, সুখেন্দু দস্তিদার, অনিল মুখার্জী, মন্টু মজুমদার, রওশন আলি, মীর্জা আবদুস সামাদ এবং শচীন বসু। প্রথম প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হিসেবে ভুল নীতির দায়ভার নিয়ে খোকা রায় নতুন কমিটিতে কোন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন, পরে তাকে প্রাদেশিক কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়। এছাড়া প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য হন ৩ জন মণি সিংহ, নেপাল নাগ ও বারীন দত্ত।১০

অর্থাৎ, '৪৭ সালে দুটি দেশ বিভাজিত হলেও কার্যত, আরও চার বছর পর '৫১ সাল থেকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে।

শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, '৫০ সালের শেষ দিকে চিৎসার জন্যে কলকাতায় গেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে প্রাদেশিক কমিটির দপ্তরে মুজফ্ফর আহমেদ, আবদুল

হালিম ও আবদুল মোমিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। দেখলাম, তারা পূর্ববাংলা সম্পর্কে জানতে খুব উৎসুক। আরও দেখলাম, সেখানকার পার্টির অবস্থা মুজফ্‌ফর আহমেদের নখদর্পণে। বিভিন্ন সময়ে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক থাকার কারণে তাকে পুরনো কমরেডরা সকলেই চিনতেন ও জানতেন। তিনি আমার বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন এবং বললেন, আপনারা কাজ করছেন এক ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। কাজেই আপনাদের থাকা প্রয়োজন সুচিন্তিত বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও সঠিক পার্টি লাইন। দীর্ঘ দুইবছর ভ্রান্ত লাইন অনুসরণের মাশুল আপনারা দিচ্ছেন। আমরাও দিয়েছি। তবে আমরা আমাদের শক্তি অচিরেই পুনরুদ্ধারে সক্ষম হব। আপনাদের বেশ সময় লাগবে। ...পূর্ববাংলার পার্টির অনেক সক্রিয় ক্যাডার আজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পার্টির একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে আপনারা বঞ্চিত হয়েছেন দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া কমরেডদের অভিজ্ঞতা ও সাহচার্য থেকে...' ।১১

দুই

'৪৮ সালের মার্চ মাসেই ঢাকার কাপ্তান বাজারে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক দপ্তর খোলা হয়। দপ্তরের কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্বে থাকেন খোকা রায়, নেপাল নাগ ও নিরঞ্জন গুপ্ত। তাছাড়া প্রাদেশিক কমিটির বাকি নেতারা যে যার জেলায় সংগঠনের কাজে ফিরে যান। প্রসঙ্গত, তখন হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে গোটা প্রদেশে সূতাকল শ্রমিক, রেলশ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠনগুলি হয়ে পড়েছিল খুবই দুর্বল। চাঁদার অভাবে পার্টির তহবিলও তখন কার্যত শূন্য হয়ে পড়েছিল।

বস্তুত, পূর্ববাংলার নেতা ও কর্মীদের কাছে সেটা ছিল খুব কঠিন সময়। নিদারুণ অর্থাভাব, পুলিশি নির্যাতন, অকারণ ধরপাকড় ইত্যাদি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। পরিস্থিতি ছিল এমন যে প্রকাশ্যে কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকায় ভাষা আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লিগের আশ্রিত গুণ্ডারা একবার পার্টি অফিস আক্রমণ করে, আক্রান্ত হয় কোর্ট হাউস স্ট্রিটে জেলা পার্টি অফিসও। এর মধ্যে পার্টির ওপর আসন্ন বিধিনিষেধের খবর পেয়ে নেতারা আগেভাগে আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয় '৪৮ সালের অক্টোবরে।

লক্ষ্য করার মত, প্রাদেশিক স্তরের প্রায় সব নেতাই তখন মুসলিম 'টেকনেম' ব্যবহার করতেন। অনেকে মুসলিমদের মত জামাকাপড় পরাও শুরু করেন। কারণ সেই সময় গোটা প্রদেশকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমনই কলুষিত করে ফেলেছিল যে হিন্দু পরিচিতি নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বাম-রাজনীতি প্রচার করা ছিল প্রকৃতই কঠিন। নীচে প্রদেশ নেতাদের ব্যবহৃত টেকনেমগুলি দেওয়া হলো–

মণি সিংহ - আজাদ ভাই
অনিল মুখার্জী - আমিন ভাই
অনিমা সিংহ (মণি সিংহের স্ত্রী) - নাজমা বেগম
শরদিন্দু দস্তিদার - শহিদ ভাই

খোকা রায় - আজিজ ভাই
অজয় রায় - শরিফ ভাই
জুঁইফুল রায় (খোকা রায়ের স্ত্রী) - আয়েশা আপা
সুখেন্দু দস্তিদার - বশির ভাই
বারীন দত্ত - সালাম ভাই
হেনা দাস - আমিনা বিবি
শান্তিলতা দত্ত (বারীন দত্তের স্ত্রী) - সিতারা বেগম
জ্ঞান চক্রবর্তী - করিম ভাই
নেপাল নাগ - রহমান ভাই
সুধাংশুবিমল দত্ত - কবীর ভাই
নিবেদিতা নাগ (নেপাল নাগের স্ত্রী) - রিজিয়া বেগম
সত্যেন সেন - সাজাহান ভাই

নিবেদিতা নাগ তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড নাগ আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে মুসলমানি আদব-কায়দাগুলি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। হটাৎ অসুবিধায় পড়লে 'ইয়া আল্লাহ' বলে ফেলা তার পক্ষে এতই স্বাভাবিক ছিল যে না শুনলে বিশ্বাস হবে না। তাছাড়া নামাজ পড়া, ওজু করা, আঙুলে আলতো করে তুলে না মেখে ভাত খাওয়া, সেলামের উত্তরে 'ওয়ালেকুম সালাম' বলার মত ছোটখাট অভ্যাসগুলি এত ভালভাবে রপ্ত করে ফেলেছিলেন তিনি যে তার প্রকৃত পরিচয় যারা জানতেন না, তারা তাকে মুসলমান ভদ্রলোক বলেই মনে করতেন। এমনকি নাগ দম্পতির ছেলেমেয়েরাও বাবা-মায়ের বদলে 'আব্বা ও আম্মা' সম্বোধন করতে শিখে গিয়েছিল' ।১২

কলকাতা থেকে পূর্ববাংলায় যাওয়া ছাত্রকর্মী মহম্মদ নবী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'একদিন খোকা রায় আমার অফিসে এলেন এক সুদর্শন যুবককে নিয়ে। তার নাম মতিন ভাই (শৈলেশ দাস)। খোকাদা বললেন পরের দিন মতিন বিকেলের দিকে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। যথাসময়ে সে এল। আমাকে নিয়ে রিকশায় বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ঘুরে পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি জায়গায় (যুগীনগর) এক পোড়ো বাড়ির সামনে এসে নামল। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেলো। বাড়িতে ঢুকতে মধ্যবয়সী ভারিক্কী এক লোক হাসিমুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে। মুখে বললেন, আমি মণি সিংহ, আসুন কমরেড নবী, ভিতরে আসুন। আপনাকে অন্য কমরেডদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই'। তিনি উঠোনে অপেক্ষারত কমরেডদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমে আজিজ ভাই (খোকা রায়) - আগে থেকে জানা, পরে আজিজ ভাইয়ের স্ত্রী কমরেড জুঁইফুল রায়, কমরেড নেপাল নাগ, কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার ও তার স্ত্রী শেলী দস্তিদার, কমরেড অনিল মুখার্জী, কমরেড আবদুল হক, কমরেড নলিনী দাশ, কমরেড রণেশ দাশগুপ্ত ও কমরেড হারুণ। গোপন পার্টির আত্মগোপনকারী শীর্ষ কমরেডরা এই বাড়িতে থাকেন। শেষে পরিচয় করালেন আরও দু-জনের সঙ্গে। তারা হলেন দাউদ ও জামান ভাই। আমার আগমন উপলক্ষে বিশেষ চা ও নাস্তা

আনা হল। দু-পিস টোস্ট ও এক গ্লাস করে চা। রাতে স্পেশাল খাবার - ভাত, ভাজি, ডাল আর একটা করে সিদ্ধ ডিম। যে ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল সেটা অনেক মালপত্রে ভর্তি গুদামের মত। সেই গুদামের কিছুটা খালি করে আমার আর মতিনের জন্যে একটা করে চৌকি পাতা হয়েছে। চৌকির ওপর একটা বেডশিট পেতে কোনো রকমে রাত কাটালাম। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলা অফিসে ফিরে গিয়ে নিজের মালপত্র নিয়ে এলাম।

মনে আছে, ওই বাড়িতে ঘর বেশি ছিল না, মাত্র চারটি। তার মধ্যে একটি গুদামঘর, যেটাতে আমি, মতিন আর দাউদ ভাই থাকতাম। অপর তিনটির মধ্যে একটায় থাকতেন খোকা রায় ও তার স্ত্রী জুঁইফুল রায়। তাদের ঘরে ছিল একটা মাত্র চৌকি, উপরে শীতল পাটি বিছানো, আসবাবপত্র বলতে একটি চেয়ার ও টেবিল। খোকা রায় ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং লেখালেখির কাজে দক্ষ। পার্টির সিদ্ধান্ত হোক বা দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই হোক - তিনি সহজ-সরল ভাষায় সুবোধ্য করে লিখতেন। লেখার সময় সিগারেট টানতেন খুব। অল্প দামের বগলা বা কাঁচি সিগারেট। লেখার পর তিনি আর আজাদ ভাই মিলে ডেন-এ রাখা সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে প্যাকেট করে পার্টি নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিতেন।

...অন্য ঘরে থাকতেন কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার ও তার স্ত্রী, তাদের শিশু মেয়েটিকে নিয়ে। অন্ধকার ঘর, দিনের অধিকাংশ সময় লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে হতো। বাড়িটায় বিজলি বাতি বা পৌরসভার পানির কল ছিল না। একটা কাজের মেয়ে বাইরের কোন কল থেকে রান্না ও খাবার পানি যোগান দিত। কাঁচা পায়খানা মেথর পরিস্কার করত। দস্তিদারদের জন্য ছিল একটা খাট, তাও জরাজীর্ণ। আর একটি ঘরে থাকতেন কমরেড রণেশ দাশগুপ্ত ও আবদুল হক। দু-জনে দুটো চৌকির ওপর শীতলপাটি পেতে শুতেন। যখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বা সেক্রেটারিয়েটের মিটিং হতো, তখন অন্য কমরেডরা ডেনে আসতেন। খুবই সমস্যা হতো তখন, রাতে মেঝেতে অনেকে শুতেন। মাঝে মাঝেই আসতেন নেপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগ। নেপাল নাগ তখন নারায়ণগঞ্জে কাজ করতেন শ্রমিকদের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টির এইসব সর্বসময়ের নেতা ও কর্মী মাসোহারা পেতেন যৎসামান্য । এতেই চলতেন। কোনদিন কারো কাছ থেকে কোন অভিযোগ শুনিনি। ডেনের দৈনন্দিন জীবন ছিল কৃচ্ছসাধনের। যখন মিটিং থাকত তখন নেতারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে চলত কয়েকদিন। অন্যদিনগুলোয় চলত পড়াশুনা ও তাত্ত্বিক এবং চলতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা। এটা গ্রুপ ভিত্তিতে চলত। আমাদের গ্রুপ চার জনের- জুঁইফুল রায়, শেলি দস্তিদার, মতিন ও আমি। ডেনের কর্তৃত্ব ছিল স্বয়ং মণি সিংহের হাতে। তিনি শৃঙ্খলার ব্যাপারে কোন ত্রুটি হতে দিতেন না। সন্ধ্যের অন্ধকারে কমরেডরা যে যার কাজে বেড়িয়ে যাবেন, ফিরবেন বেশ রাতে। খেতে হবে একসঙ্গে বারোটার মধ্যে। ঘরবাড়ি নিজেদের পরিস্কার করতে হবে, নিজের প্লেট নিজে ধুতে হবে, রান্নাঘর পরিস্কার করতে হবে, পালা করে ইঁদারা থেকে পানি তুলতে হবে, নিজের জামাকাপড় ধুতে হবে। পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিস্কার করতে হবে- এই হল কমিউনের জীবনযাত্রা।

নবী লিখেছেন, 'মাঝে মাঝে অবসরে মণি সিংহ ও খোকা রায় দাবা খেলতেন। তাদের দাবার লড়াই, পরস্পরকে আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ বেশ একটা মজার ব্যাপার ছিল। হতো তাস খেলাও। রাত্রে খাওয়ার আসরে বসার পিঁড়ে পড়ত ১২/১৪টা। সবাই গোল হয়ে বসতাম। মাঝখানে থাকত ভাতের পাতিল, ডাল ও তরিতরকরি। ক্ষুধা কাকে বলে তা খাওয়া দেখে বুঝতাম। ডালে ফোড়ন দেওয়ার পর যে ভাজা মরিচ থাকত সেটা ছিল মণি সিংহের জন্য বিশেষ বরাদ্দ। তিনি ভাতের পাতে ডাল নিয়ে ভাজা মরিচ টিপে টিপে খেতেন। যেদিন ডিম রান্না হতো, সেদিন আবদুল হক সব খেয়ে কুসুমটা রেখে দিতেন এবং খাওয়ার পর সেটা মুখে পুরতেন। আমরা সবাই মজা দেখতাম।

...যেহেতু পার্টি তখন নিষিদ্ধ ছিল, তাই পার্টির নামে প্রকাশ্যে কাজ করা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। নেতারা সন্ধ্যেবেলা ডেন থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্থানীয় ও ঢাকার বাইরে থেকে আগত কর্মীদের সঙ্গে যোগযোগ করতেন এবং পার্টির লিথোগ্রাফ করা পত্রিকা 'শিখা' ও অন্যান্য দলিল বিলিবন্টন করতেন। কমরেডদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে ডেনে ফিরে আলোচনা করতেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার তা যথাস্থানে পাঠাতেন গোপনে। আবার আমার মত গোপন কমরেডদের ক্যুরিয়ার বলা হতো। এই ক্যুরিয়ারের কাজে বেশকিছু কমরেড নিয়োজিত ছিলেন- কেউ সার্বক্ষণিক- কেউ প্রয়োজনমাফিক কাজ করতেন। সেই সময় কত ঝুঁকি নিয়ে যে এরা কাজ করেছেন তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।'

নবী লিখেছেন, 'ডেনের নেতারা অধিকাংশই ছিলেন বৃটিশ যুগ থেকে খ্যাতিমান বিপ্লবী। কেউ বৃটিশ যুগে সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য, কেউ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অংশীদার, কেউ আন্দামান ফেরৎ আবার কেউ কেউ সশস্ত্র সংগ্রামের নেতা ইত্যাদি। এরা ধরা পড়লে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিশেষত, জেলে যে অত্যাচার হবে তা কল্পনাতীত। এসব সম্পর্কে সজাগ থেকেও জীবনকে উৎসবমুখর রাখতেন কমরেডরা। কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় দিকগুলির এটি একটি। এই পরিবেশ ভাল না লেগে উপায় নেই।১৩

আবার পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির আরও একটি ডেন তৈরি হয় ঢাকা শহরের প্রান্তে বর্তমান কমলাপুর রেলস্টেশনের কাছে। তখন ওই এলাকা ছিল খুবই অনুন্নত। প্রায় অনেকটা গ্রামের মত। পার্টির অভ্যন্তরে 'গোলামবাড়ি' বলে পরিচিত ওই বাড়িতে এক মুসলিম পরিবার ছিলেন। তাদের বাবা নেই, মা আছেন। ভাইরা আছেন গ্রাম ও শহর মিলিয়ে, তার মধ্যে ওই বাড়িতে ছিলেন দুই ভাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা আদিলুদ্দিন বা আদিল ভাই ছিলেন মূল অভিভাবক ও পার্টি সদস্য। তার ছোট ভাই দলিল ছিল পার্টির টেককর্মী বা অস্থায়ী ক্যুরিয়ার। আদিল ভাই সামরিকবাহিনীতে চাকরি করতেন, তাই তার বাড়িটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে ধরা হয়েছিল। পার্টিতে তার টেকনাম ছিল 'গোলাম'। এই বাড়িতে এক পর্যায়ে থাকতে শুরু করেন মণি সিংহ ও তার স্ত্রী অনিমা সিংহ, নেপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগ, বারীন দত্ত ও শান্তিলতা দত্ত, নিরঞ্জন গুপ্ত ও নিরুপমা গুপ্ত। জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা কোন

কাজকর্মে ঢাকায় এলে ওই বাড়িতে উঠতেন। যেমন আসতেন সিলেট থেকে রোহিনী দাস ও হেনা দাস, রাজশাহীর সত্য মৈত্র, কিশোরগঞ্জ থেকে অজয় রায়। হেনা দাস তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বাড়িটাতে বিভিন্ন ভিটেতে কাঁচামাটির ঘর ছিল। প্রকাণ্ড বড় একটা উঠোন ছিল। সারাদিন বাড়িতে যত শুকনো পাতা ও ডালপালা জমত সব বিকেলে ওই উনুনে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো হতো। এই ডেনটি ছিল অপেক্ষাকৃত গোছানো, কাজের মধ্যে একটা সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থা ছিল।১৪ নেতারা সকাল থেকে পড়াশুনা করতেন আর সন্ধ্যে হলেই নানাবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করে বেড়িয়ে পড়তেন যে যার কাজে। প্রতিবেশীরা জানতো, এই বাড়ির পুরুষেরা লোহার ব্যবসাদার।' আদিল ভাইয়ের কন্যা ফুলটুসি শিরীন জানিয়েছেন, 'সেই আমলে ওই বাড়ির ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। আমার বাবা বেতন পেতেন খুব সামান্য- বড়জোর ৬০/৬৫ টাকা। তাছাড়া বাইরে থেকে অর্থসাহায্য আসত, এমনকি আসত জামা-কাপড়ও। সকলে মিলে আমরা ছিলাম একটা পরিবার। শৈশবে আমার জানাই ছিল না এরা আসলে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট বিপ্লবী। জানতাম, এরা কেউ আমার চাচা, কেউ চাচী ইত্যাদি।' ৫৫ সালে এই ডেনেই সাদামাটাভাবে শুধুমাত্র মালাবদল করে বিবাহ করেন মণি সিংহ ও অনিমা সিংহ। শিরীন বলেছেন, সম্ভবত আমাদের বাড়িতে একপর্যায়ে গোপনে কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও রাখা হতো। যখনই পুলিশের সম্ভাব্য হানার খবর আসত তখনই আমার সাদা থান পরা বিধবা দাদী একটা পোঁটলা নিয়ে আমার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে যেতেন। সেদিন আমরা ফিরতাম অনেক রাত করে।

পরে ষাটের দশকে পার্টি ভাগাভাগির সময় আমার বাবা চিনপন্থী হয়ে যান। আমার মনে আছে, ওই বাড়ির মালিকেরই গোপীবাগের আর একটি বাড়ি বাবা কিনে নেওয়ায় আমরা সদলবলে সেখানে গিয়ে উঠেছিলাম। ওই গোপীবাগের ডেনে বসে ঝড়বৃষ্টির রাতে এক বন্ধ ঘরে মণি সিংহ ও আমার বাবার দলের নীতি নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতন্ডা হয়েছিল। কিন্তু বাবা ছিলেন তার সিদ্ধান্তে অটল। এই সময় বাবা কর্মসূত্রে বদলি হওয়ায় ঢাকা ছেড়ে যশোরোর আদি কসবা এলাকায় 'নিসর্গ' নামে আমাদের আর একটি বাড়িতে চলে যান। ক্রমশ ওই 'নিসর্গে' গড়ে ওঠে একটি বিকল্প ডেন। সেখানে যেতেন চিনপন্থী নেতারা যেমন আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ। এরপর ধীরে ধীরে কমলাপুর ডেনটি কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং বিরোধীপক্ষ হওয়ার কারণে মণি সিংহদের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ কমে আসে।

উল্লেখযোগ্য যে পার্টির ভাষা আন্দোলনে যোগদান, আওয়ামি লিগ বা মুজিবের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই এই কমলাপুর ডেনে বসে গৃহীত হয়েছিল।

তিন

প্রসঙ্গত, '৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতারা যখন কলকাতায় রণদিভের থিসিস নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখনই ওপার বাংলায় প্রোথিত হয় পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের বীজ। বীজটি রোপণ করেছিলেন কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ও দূরদর্শী

আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ওই বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাক গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তিনি উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে একটি সংশোধনী পেশ করলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ও মন্ত্রী গজনফর আলি তা খারিজ করে দেন এবং বলেন, উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, উর্দু হল মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক। এই সংবাদ ঢাকায় পৌঁছলে একই সঙ্গে সৃষ্টি হয় হতাশা ও অসন্তোষ। এর প্রতিবাদে ঢাকা শহওে সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র লিগ থেকে বিভাজিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লিগের সদস্যরা মার্চ মাসে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু করেন। ছাত্রদের এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালালে আহত হন ২০০ ছাত্র এবং গ্রেপ্তার হন ৭০০। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন কিছু মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ১৯ মার্চ ঢাকায় এসে জিন্নাহ ওই প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন। বলা বাহুল্য এর ফলে অতি স্পর্শকাতর এই বিষয়টি ক্রমশ গোটা প্রদেশে এক গণজাগরণের রূপ নেয়।

এদিকে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ধারাবাহিক দাঙ্গা, দুর্বৃত্তদের প্রতি লিগ সরকারের সরাসরি পক্ষপাত- বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের ক্রমাগত বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণে মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল অংশের ক্ষোভ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই মধ্যবিত্তেরাই দেশভাগের আগে মুসলিম লিগের পক্ষে পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্যে আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু এমন পাকিস্তান তারা চাননি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় লিগ ছাত্রদের প্রতি পুলিশের সাম্প্রতিক নির্যাতন। সেই সময়ের ছাত্রনেতা ও পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মুজিবর রহমান তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, 'আস্তে আস্তে সকল কিছুতেই ভাটি লাগল, শুধু সরকারের নীতির জন্য। তারা জানত না কী করে একটা জাগ্রত জাতিকে ব্যবহার করতে হয় এবং জাতিকে গঠনমূলক কাজে লাগানো যায়। ...এর একটা বিশেষ কারণ হল, যাদের কাছে ক্ষমতা এল, তারা জনসাধারণের উপর আস্থা রাখতে পারেন নাই। ...পরিবর্তে এরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে লাগলেন ইংরেজ আমলের আমলাতন্ত্রের উপর।' মুজিব লিখেছেন, 'জেল থেকেই আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ, বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে দেশে একনায়কতন্ত্রই চলবে।'১৫

শেষ পর্যন্ত '৪৯ সালের ২৩ জুন জনৈক লিগনেতা কাজী বশিরের আমন্ত্রণে তার স্বামীবাগের বাসভবন রোজ গার্ডেনে প্রায় ৩০০ বিক্ষুব্ধ লিগনেতা ও কর্মী সমবেত হয়ে আওয়ামী মুসলিম লিগ গঠন করেন। দলের সভাপতি হন আসামের প্রবীণ লিগনেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক। এছাড়া দুই যুগ্ম-সম্পাদক হন মুজিবর রহমান ও খন্দকার মুস্তাক আহমেদ। দলের সদর দপ্তর করা হয় ১৫০নং মুঘলটুলিতে, যেটি ছিল আগে ঢাকায় মুসলিম লিগের অফিস।১৬

উল্লেখ করা যায়, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট নেতারা এই ঘটনাক্রমের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। বিগত দু-বছর হিন্দুদের দেশত্যাগ ও রণদিভের হটকারী লাইনের

কারণে পার্টি কার্যত নিঃস্ব ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই মুহূর্তে এই ক্ষয় রোধ করে দলের পুনর্গঠনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধান কাজ। এই প্রসঙ্গে কিশোরগঞ্জের কমিউনিস্ট নেতা অজয় রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '৫১ সালে কলকাতায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত বৈঠকে গোপনে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে। তিনি ওপার বাংলার নেতাদের কাছে ওই প্রদেশের পরিস্থিতির বিস্তারিত শুনে বলেন, আপনারা এসব রণনীতি, রণকৌশল এখন বাদ দিন। বরং সমাজতন্ত্র কী- তা আপনারা যারা কমিউনিস্ট আছেন তারা বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রচার করুন। সেটাই হবে আপনাদের আসল করণীয়...।' উল্লেখ্য, বৈঠকে উপস্থিত পূর্ববাংলার নেতারা সকলেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।১৭

খোকা রায় লিখেছেন, যেহেতু নুরুল আমিন সরকারের কঠোর দমনীতির কারণে তখন কমিউনিস্ট পার্টির কোন সম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না, তাই '৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ কলকাতার বৈঠক থেকে ফিরে দলের প্রাদেশিক কমিটির এক গোপন সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে বিভিন্ন জেলার ও দলের গণফ্রন্টগুলি মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাময়িক রণকৌশল হিসেবে দলের সদস্য ও কর্মীদের নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রেখে আওয়ামি মুসলিম লিগে যোগ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রস্তাব দেন। বলা হয়, শুধুমাত্র মুসলিম রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যে এমন একটি দল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ঠিকই কিন্তু দলটির গৃহীত কর্মসূচীগুলি যেমন বন্দিমুক্তি, জমিদারি প্রথার অবসান, বাংলাভাষার স্বীকৃতি ইত্যাদি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং অসম্প্রদায়িক দাবি। সুতরাং এমন অনুমান ভুল হবে না যে প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নিতে চলেছে। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, সর্দার আবদুল হালিম প্রমুখ ঢাকা শহরের নেতৃস্থানীয় মুসলিম কমরেডরা ওই নামের কারণেই দলটিতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। খোকা রায় লিখেছেন, এর ফলে ওই পরিকল্পনাটি তখন কার্যকর করা যায়নি। মণিদা (মণি সিংহ) ও আমি বিষয়টি নিয়ে ওই নেতাদের সঙ্গে আরও বহুবার আলোচনা করি কিন্তু ওরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।১৮

প্রসঙ্গত, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ওই বছরই মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুব লিগ। এটি ছিল ওপার বাংলায় দেশভাগের পরে প্রথম অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। এই দলের সকলেই যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, তবে নেতৃত্বে এবং নীতি নির্ধারণে কমিউনিস্টদের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। জেলা ও মফঃস্বল থেকে বহু গণতন্ত্রমনা কর্মী এসে যুব লিগে যোগ দেন। বৈঠক বানচালের জন্যে পুলিশ আগে থেকেই নির্ধারিত ঢাকা বার-লাইব্রেরী দখল করে নেয়। কিন্তু অনমনীয় কর্মীরা বুড়িগঙ্গায় একাধিক নৌকো ভাড়া করে হ্যাজাকের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করে যুব লিগের কর্মসমিতি গঠন করে। যুব লিগের সভাপতি নির্বাচিত হন জনৈক অকমিউনিস্ট নেতা মাহমুদ আলি এবং সম্পাদক হন কমিউনিস্ট যুবক অলি আহাদ। আমূল ভূমিসংস্কার, বন্দিমুক্তি, বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন ইত্যাদি ছিল এই দলের ইস্তেহারে

প্রদত্ত দাবি। উল্লেখ্য, পরবর্তী ভাষা আন্দোলন ও প্রাদেশিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহে এই দলটির ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে করাচিতে '৪৮ সালেই ক্যানসার আক্রান্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হয় এবং অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। এর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঢাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন করাচিতে গিয়ে হন সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। নাজিমুদ্দিনের ক্ষমতালাভে পূর্ববাংলার আপামর হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণ বাংলা ভাষার সম্ভাব্য স্বীকৃতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু '৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং এর অন্যথা হবে না।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রদেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাত্র লিগ, যুব লিগ ও আওয়ামি মুসলিম লিগের নেতারা আলোচনাকরে গঠন করেন এক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হন আওয়ামি মুসলিম লিগ নেতা আতাউর রহমান খান এবং সম্পাদক ছাত্র লিগ নেতা ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আবদুল মতিন। তাছাড়া এই কমিটিতে ছিলেন আরও দুই অভিজ্ঞ ও পরিণত কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা এবং অলি আহাদ। ছিলেন আওয়ামি মুসলিম লিগের সভাপতি মৌলানা ভাসানী, শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ধীরে ধীরে, সুপরিকল্পিতভাবে এই আন্দোলনে জোয়ার আসতে শুরু করে। ৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট এবং সেদিনই ঠিক হয় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে। সরকারও আগাম সতর্কতা হিসেবে ওইদিন জারি করে ১৪৪ ধারা।

প্রসঙ্গত, এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা সরাসরি সামনের সারিতে না থেকে নেপথ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ও সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। বস্তুত, সেই সময়ে ভাষা সংগ্রাম কমিটির অনেক ছোট-বড় সিদ্ধান্তের পিছনেই ছিল কমিউনিস্টদের প্রভাব ও পরিকল্পনা। নিবেদিতা নাগ লিখেছেন, 'আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ কমরেডরা যেমন মণি সিংহ, খোকা রায়, বারীন দত্ত, নেপাল নাগ, আলতাব আলি প্রমুখ দিনের বেলাতেই অকুতোভয়ে ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে ছোট ছোট সভা সংগঠিত করে তাদের বক্তব্য পেশ করতেন। কে কখন আসবেন, যাবেন, খাবেন কি খাবেন না- কোন কিছুরই ঠিক নেই। আমরা আস্তানায় (কমলাপুর ডেন) বসে রাতদিন টেনসিল কাটতাম- গোপন ইস্তেহার গোপনে ছাপিয়ে ছাত্রদের বিলি করার জন্য দেওয়া হতো। পার্টি তার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করল। ছাত্ররা ঘন ঘন খবর পাঠাতেন নানাধরনের রসদ পাঠানোর জন্যে। ...আমাদের সংগঠনের কাজও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো।'১৯

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতারা ২০ ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে ১৪৪ ধারা অমান্য না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু পরে আবদুল মতিনের প্রস্তাব মতো ঠিক হয় পরের দিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আমতলায় ছাত্রসভা হবে। সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের মতামতের ভিত্তিতে নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

বলা বাহুল্য, ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই আমতলা ছিল সরগরম। ছোট ছোট মিছিলে স্কুল-কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা জড়ো হতে থাকে। ওই সময় গাজীউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তাব দিলে তা সমর্থিত হয় প্রবল উৎসাহে। প্রথমে পাঁচজন করে ছাত্রদের ছোট ছোট মিছিল এক স্মারকপত্র জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন পরিষদ ভবনের দিকে রওয়ানা হয় এবং বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তারও করা হয়। পরে এক পর্যায়ে ছাত্ররা যখন দলে দলে বেরোতে শুরু করে তখনই গুলিবর্ষণ করে পুলিশ।

সেই সময়ের পার্টি ক্যুরিয়ার মহম্মদ নবী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বেলা বারোটার দিকে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ক্যাম্পাসে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লো। এক পর্যায়ে আমি আমতলা আর মেডিকেল কলেজের ধ্বসে পরা দেওয়াল পেরিয়ে মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়লাম। ওখানে দেখি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের বয়-বেয়ারারা পুলিশের উপর ইঁট-পাটকেল ছুঁরছে এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হচ্ছে। দুপুরের দিকে হঠাৎ বাইরে তিনজন পুলিশ এসে কোন ওয়ার্নিং শট না দিয়েই গুলি ছুঁরলো। লুঙ্গি পরা একজন সাধারণ লোক, নামটা জানা নেই, তবে কুমিল্লার তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল - গুলি তার ডান পায়ে লাগলো। সে পড়ে গেলো। গুলিবর্ষণ থামলে তাকে ধরাধরি করে আউটডোরে নিয়ে গেলাম। এদিকে সদ্যপরিচিত বরকত গুলিতে নিহত হয়েছে। গুলির পর আন্দোলন তুঙ্গে উঠে গেলো।'২০

সেই সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অজয় রায় পরবর্তীকালে তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

'২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় লক-আপ হয়ে গেছে। বদলি সেপাই তালা টেনে দেখে গেলো ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা। পরে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে সেদিনের ঘটনার খবর দিল। বলল, কতজন মারা গেছে তার ঠিক নেই। বুঝলেন কমরেড, পাখির মত গুলি করেছে ...।

আবার পরদিন ভোর থেকেই চাপা উত্তেজনা। গুলির খবর সারা জেলে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন দুপুরে কোনরকম কাটাছেঁড়া ছাড়াই আমরা পত্রিকা পেলাম। সাধারণত সংবাদপত্রে রাজবন্দিদের জন্যে আপত্তিকর কোন সংবাদ থাকলে তার ওপর সেন্সরের নামে কালি লেপটে দেওয়াই ছিল জেলখানার রীতি। পরে শুনেছি, কারা কর্তৃপক্ষের অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন, সেদিন সেন্সর করা চলবে না। সেন্সর করলে তো পুরো পত্রিকাতেই কালি লেপে দিতে হয়- এটাই ছিল যুক্তি। সেই জন্যে আমরা সেদিনের কাগজ পেলাম অক্ষত অবস্থায়-

অজয় রায় লিখেছেন-

'কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জেলা সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী অর্থাৎ জ্ঞানদা গ্রেপ্তার হয়ে আমাদের জেলে এলেন কিছুদিন পরে। তার কাছ থেকেই প্রথম শুনি ভাষা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলির বিবরণ। কীভাবে গুলির পর সমস্ত ঢাকা শহর ভেঙে পড়েছিল মেডিকেল কলেজে। '৪৮ সালের সঙ্গে পার্থক্যটা স্পষ্ট। পুলিশ, প্যারামিলিটারির গুলি উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় মিছিল করেছে। গুলি লেগে পড়ে গেছে মিছিলকারী তবু অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়নি। জ্ঞানদা তার বিবরণ শেষ করলেন এই বলে যে এমন মূহূর্ত কোন জাতির জীবনে বড় একটা আসে না।'২১

এদিকে আমতলায় গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার সোজা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে চলে যান। কায়সার ছিলেন বহুদিনের পুরনো ছাত্রকর্মী, অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা জেলার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক। দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি মুসলিম ছাত্র লিগের প্রগতিশীল ও সমমনস্ক ছাত্রদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন তৈরির উদ্যোগ নেন কিন্তু তার প্রয়াস সফল হয়নি। সেই সময়ের পার্টিতে তিনি ছিলেন ছাত্র ও যুব সংগঠনের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি ছিলেন সুলেখক এবং দুটি উপন্যাসেরও রচয়িতা। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পার্টির নির্দেশে অসম সাহসিকতার সঙ্গে ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন এবং আলবদর বাহিনির হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তার মৃত্যুতে অপূরনীয় ক্ষতি হয় দলের।

বারীন দত্ত লিখেছেন, 'তখনকার সেই উত্তাল দিনে কায়সারের দরকার ছিল। কিন্তু তার নামে ঝুলছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। সে তখন ডেনেই (কমলাপুর) থাকত। গোপনে ছাত্রাবাসে ঢুকে বাইরে হর্ন লাগিয়ে মাইকের মাউথপিস ঘরের মধ্যে নিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করত সে। বাইরে বেরোলেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার অনিবার্য। সন্ধ্যের পর বকশি বাজারের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি আর খোকা রায় সংশ্লিষ্ট পার্টি কমরেডদের সঙ্গে দেখা করতাম। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও ভাবের আদান-প্রদান চলত সংক্ষেপে। শহীদুল্লাহ জানাতো আন্দোলনের নতুন সমস্যাসমূহ এবং আমরা জানাতাম পার্টির সিদ্ধান্ত...।'২২

উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাপ্তি এই যে এতদিন পরে তাদের সামনে মুসলিম মধ্যবিত্তের রুদ্ধ দরজাটি খুলে গেলো। বহু মুসলিম ছাত্র ও যুবক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে লাগলেন অথবা সমর্থক হলেন। অন্যদিকে মুসলিম মধ্যবিত্তেরাও এইবার উপলব্ধি করলেন আওয়ামি মুসলিম লিগ বা মুসলিম ছাত্রলিগের পরিবর্তে প্রদেশে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দল থাকাটাই হবে যুক্তিযুক্ত। এই পর্যায়ে '৫২ সালের এপ্রিল মাসে তৈরি হয় ছাত্র ইউনিয়ন। কমিউনিস্ট ও অসাম্প্রদায়িক মুসলিম ছাত্ররাই হলেন এই দলের সদস্য। এরপর '৫৩ সালে তৈরি হয় কমিউনিস্ট প্রভাবিত গণতন্ত্রী দল। আবার ওই '৫৩ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয়

সরকারের চাপে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন '৫৪ সালে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। এটা ছিল '৪৬ সালের পর বৃটিশ-মুক্ত পূর্ববাংলায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই গোটা প্রদেশে তৈরি হয়েছিল প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণপণ চেষ্টায় তৈরি হয় গোটা প্রদেশে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট। ফ্রন্টের শরিক দলগুলি ছিল আওয়ামি মুসলিম লিগ, ফজলুল হকের সদ্যগঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামি ও তপশিলি ফেডারেশন। এদের নেতা হন প্রবীণ ও পক্ককেশ ফজলুল হক। প্রসঙ্গত, ফ্রন্ট গঠন নিয়ে নানাবিধ জটিলতার কারণে কমিউনিস্টরা ফ্রন্টের বাইরে থেকেও তাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এছাড়া মণি সিংহের প্রস্তাব মত এই নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে খোলা হয় কমিউনিস্টদের দুটি আলাদা প্রকাশ্য ও গোপন ফ্রন্ট। প্রকাশ্য ফ্রন্টে ছিলেন প্রাদেশিক কমিটির সদস্য সিলেটের আবদুস সামাদের নেতৃত্বে আলি আকসাদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক কে. জি. মোস্তফা, '৫০ সালে খাপড়া ওয়ার্ডের গুলিতে পা হারানো নুরুন্নবী চৌধুরী প্রমুখ। ঢাকার নারিন্দায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে চালু হয় পার্টি অফিস। নুরুন্নবী দুই বগলে ক্র্যাচ নিয়ে সকলের আগে গিয়ে পার্টি অফিস খুলে বসে পড়তেন। অফিস হয় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলাতেও। শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, তখন ঢাকার রাজপথে মিছিলে মিছিলে আওয়াজ উঠত– এক, পূর্ববাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন চাই; দুই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; তিন, গণতান্ত্রিক সংবিধান চাই; নুরুল আমিন সরকার মুর্দাবাদ– ইত্যাদি। এইসব দাবি শহরের রাজপথ থেকে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে-গঞ্জে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মৌলানা ভাসানী ও মুজিবর রহমান। ছাত্র লিগ ও ছাত্র ইউনিয়ন প্রবহমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়। আর কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে ওঠে নেপথ্যচারী এক চালিকাশক্তি।২৩

উল্লেখ্য, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেখা যায় ক্ষমতাসীন লিগ সরকারের অপ্রত্যাশিত ভরাডুবি হয়েছে। প্রদেশের মোট ৩১৮টি আসনের মধ্যে তারা জয়ী হয়েছে মাত্র ৯টি আসনে, ২২৮টি আসন পেয়েছে যুক্তফ্রন্ট। তাছাড়া ৪টি হিন্দু আসন দখল করেছে কমিউনিস্টরা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চট্টগ্রামের দুই কমিউনিস্ট প্রার্থীই ছিলেন নিজেদের ভোট প্রচারে অনুপস্থিত। পুর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন জেলে এবং সুধাংশুবিমল দত্ত পলাতক। তবু দেখা যায় এদের বিরুদ্ধে দুই কংগ্রেস প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লক্ষ্য করার মত, বৃটিশ আমলে পুর্ণেন্দু দস্তিদার এবং তার বিরোধী প্রার্থী কংগ্রেসের বিনোদবিহারী চৌধুরী দু-জনেই ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের অনুগামী। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে যান।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি, বরিশালের কমিউনিস্ট নেতা আবদুশ শহিদ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমাদের জেলের কোণায় ছিল একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ের পর একদিন দেখি গাছটি ভরে গেছে নতুন পাতায়। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে সবুজ পাতা। সে কী সবুজের সমারোহ...।'২৪

চার

মৌলানা ভাসানীর প্রথম ও শেষ পরিচয় তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জের এক অখ্যাত গ্রাম ধাংরায় তার জন্ম। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাবশিষ্য। '১৯ সালে কিছুদিনের সংক্ষিপ্ত বন্দিজীবন কাটিয়ে তিনি খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। '৩০ থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আসামে মুসলিম লিগের নেতা এবং '৪৯ সালে ছিলেন ঢাকায় আওয়ামি মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। রাজনীতির মাঠে ময়দানেই তার কমিউনিস্টদের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল গভীর সখ্যতা এবং সেই কারণে রাজনৈতিক মহলের অনেকের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন 'লাল মৌলানা' নামে।

সম্ভবত তিরিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আসামের ধুবড়ি অঞ্চলে ভাসানী বসবাস শুরু করেন। ওই এলাকায় তখন উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ থেকে বহু ভূমিহীন মুসলিম কৃষকের সমাগম হয়েছিল, তাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় নওগাঁ, ধুবড়ি ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতি উর্বর ও ফসল সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হয়। স্থানীয় কৃষকের সঙ্গে ছিল তাদের বিরোধ, তারা সরকারি মদতে ওই অভিবাসীদের উচ্ছেদেরও চেষ্টা চালাচ্ছিল– বলা বাহুল্য, ভাসানী এই কৃষকদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। অর্থাৎ মেহনতী মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ের প্রবণতা তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই দেখা গিয়েছিল।

শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, জনৈক ন্যাপ নেতার ইস্কাটনের বাসায় মৌলানা সাহেবকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'আপনি শুধু পাকিস্তানের নেতা নন, দক্ষিণ-এশীয় উপমহাদেশের জাতীয় নেতাদের মধ্যে আপনার রয়েছে শীর্ষস্থান। আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও রাজনৈতিক নেতারা। তবু আপনি শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেই বেশিরভাগ সময় থাকেন কেন?'

তিনি হাসিমুখে বলেন, পূর্ববাংলা হল গ্রাম প্রধান। গ্রামবাংলার শতকরা নব্বই জন লোক হল দরিদ্র, নিরন্ন কৃষক। এদের নেই খাওয়া-দাওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থা। অসুখ হলে নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। বছরের বেশিরভাগ সময় এরা থাকেন অনশনে, অর্ধাহারে। এরাই তো বাংলার প্রাণ। এই প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে এদেশের প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে না।

শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, মৌলানা আমার পারিবারিক পরিচয় জানলেও আমার কাজের ধরন তার জানা ছিল না। উত্তেজিত স্বরে একসময় তিনি বলেই ফেললেন, এদেশের শতকরা আশিভাগ কৃষকের কাছে নিয়মিত যাও না কেন? তাদের সংগঠিত করো না কেন? তাছাড়া বিপ্লব করবে কীভাবে?২৫

একথা ঠিক যে আওয়ামি মুসলিম লিগে কমিউনিস্টদের উপস্থিতি এবং পরে লিগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় ভাসানীর ভূমিকাই ছিল প্রধান। বস্তুত, কমিউনিস্টদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল সমগ্র প্রদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তা যে সম্ভব

হয়েছিল তার জন্যে তারা ছিলেন ভাসানীর কাছে ঋণী। উল্লেখযোগ্য যে আওয়ামি মুসলিম লিগের অনেক নেতাই এমনকি মুজিবর রহমান পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোন গাঁটছড়া বাঁধতে ছিলেন অনিচ্ছুক। কিন্তু ভাসানীর জনসমর্থন ও তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির বিষয়টিকে মনে রেখে তারা তার প্রস্তাব নীরবে মেনে নেন। আবার যুক্তফ্রন্টে নেজামে ইসলামির মত সাম্প্রদায়িক দলকে ঠাঁই দেওয়া নিয়ে ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর হয়। ভাসানী ছিলেন এই দলটিকে ফ্রন্টে সামিল করার প্রবল বিরোধী– তিনি ছিলেন চিরকালের আবেগপ্রবণ– মাঝে মাঝে রাগ করে বৈঠক থেকে বেরিয়ে নৌকাযোগে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দিতেন। কমিউনিস্ট নেতারাই তাঁকে ধরে এনে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতেন বৈঠকে। তিনি ছিলেন ধর্মচর্চায় নিষ্ঠাবান কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী এবং প্রবলভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। বস্তুত, তার এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই তাকে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে বহু জনসভায় উপস্থিত থেকেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন কিন্তু কোথাও কদাপি সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি, বিপ্লবের কথাও না। তবু কমিউনিস্টদের তাতে কোন অসুবিধা ছিল না।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং ৩০ মে তারা উচ্ছেদ হন। একটি নির্বাচিত সরকারের এহেন স্বল্পায়ু জীবন এক বিরল ঘটনা। আসলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তারা অবগত ছিলেন যে ওই প্রদেশে কমিউনিস্টরা শুধু যে ৪টি আসনে সরাসরি জয়ী হয়েছেন তাই নয়, গণতন্ত্রী দল এবং আওয়ামি লিগের নামেও নির্বাচিত হয়েছেন তাদের আরও ১৮ জন প্রার্থী। তাছাড়া ভাষার দাবিতে ওই প্রদেশের আপামর জনগণের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা যে মূলত তাদের স্বায়ত্বশাসনের আশা-আখাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন তা অনুধাবন করতেও কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের কোন অসুবিধা হয়নি। ১৯ এপ্রিল বাংলাকে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর কলকাতা সফররত মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের দেশভাগ বিষয়ক একটি আবেগতাড়িত ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মন্তব্যকে দেশদ্রোহিতার সামিল বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। পূর্ববাংলায় সংবিধানের ৯২(ক) ধারা অনুযায়ী প্রদেশে জারি হয় রাষ্ট্রপতির শাসন এবং রাজ্যপাল (গভর্নর) পদে দায়িত্ব নিতে আসেন কুখ্যাত সামরিক অফিসার ও মুর্শিদাবাদের নবাব বংশীয় ইস্কান্দার মির্জা। রাজ্যপালের নির্দেশে নিজগৃহে অন্তরীণ করা হয় ফজলুল হককে। তাছাড়া মুজিবর রহমানসহ বহু আওয়ামি মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হন।

বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুক্তফ্রন্টকে ভিত্তি করে পূর্ববাংলায় যে লিগ-বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছে তা নষ্ট করা। কমিউনিস্ট নেতাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় এই ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে দুর্বল চরিত্র ও সুযোগসন্ধানী নেতার অভাব ছিল না। কিছুদিন পরে কেন্দ্রের নির্দেশে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহৃত হয় এবং প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকার। আবার প্রবীণ ফজলুল হক অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রের আইনমন্ত্রী হয়ে

যান। প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের পরেই জোরদার হয়ে ওঠে বন্দিমুক্তির দাবি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিনা বিচারে আটক রাজবন্দিদের একে একে মুক্তি দিতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তিনি এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'যেহেতু আমি এখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সুতরাং কমিউনিস্টদের আর গোপনে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের যাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে সেসব উঠিয়ে নেওয়ার দির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই যারা গোপনে আছেন তারা শীঘ্রই প্রকাশ্যে চলে আসুন।' এরপর পরিস্থিতির সুযোগ নিতে মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ প্রমুখ পার্টির শীর্ষ নেতারা তাদের এতদিনের ডেন-জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাইরে। কিছুদিন পরে তাদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক জনাকীর্ণ সমাবেশে দলের নীতি ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করেন মণি সিংহ। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই সরকারের মুখোশ খুলে যায় এবং শহরের পুলিশ বিদ্রোহে কমিউনিস্টদের উস্কানির মিথ্যে অভিযোগ তুলে আবার শুরু হয় ধরপাকড়। জেলাগুলিতে বিশেষ প্রস্তুতি না থাকলেও ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতারা তড়িঘড়ি আত্মগোপনে ফিরে যেতে সমর্থ হন।

এদিকে '৫৫ সালেই ঢাকায় আওয়ামি মুসলিম লিগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এরপর '৫৬ সালে কলকাতায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে আওয়ামি লিগে কমিউনিস্টদের যোগদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে।

প্রসঙ্গত, ওই সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যরা একযোগে অনুযোগ করেন '৪৮ সালে গঠিত সমগ্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির কোন বৈঠক গত ৮ বছরে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এমন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি টিকিয়ে রাখার অর্থ কী? তখন সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং ওই কমিটি কাজ করবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সম্মেলনে গোপন ব্যালটে ভোটাভুটির মাধ্যমে গঠিত হয় ১৩ সদস্যের এক কেন্দ্রীয় কমিটি। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, অনিল মুখার্জী, শহীদুল্লাহ কায়সার, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ। এছাড়া মণি সিংহ, নেপাল নাগ, খোকা রায়, বারীন দত্ত ও অনিল মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলী এবং মণি সিংহ হন দলের সম্পাদক।

কিছুদিন পরে প্রদেশের উদ্ভুত খাদ্যসংকটের কারণে আবু হোসেন সরকার বরখাস্ত হয় এবং ক্ষমতায় আসে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ সরকার। তারপর আবার আর এক প্রস্থ কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের মুক্তিদানের পর্ব চলে। এবারের অভিনবত্ব ছিল এই যে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান নিজে এবং মুজিবর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে সভা করে রাজবন্দিদের একে একে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। অজয় রায় লিখেছেন, 'স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন– ভাবা যায়।'২৬ এর কিছুদিনের মধ্যেই করাচিতে সমগ্র রাষ্ট্রের আইনমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী হন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। অর্থাৎ কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলা দুই স্তরেই ক্ষমতায় আসে আওয়ামি লিগ।

প্রসঙ্গত, দেশভাগের আগে অথবা পরে রাজনীতির জগতে সুরাবর্দির উত্থান সর্বদাই ছায়াচ্ছন্ন। সেই সময় তিনি আচমকাই করাচির পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন পূর্ব সম্পাদিত পাক-মার্কিন চুক্তির জোরালো সমর্থক এবং একইভাবে আওয়ামি লিগকে ক্ষমতায় বসিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে জোটচুক্তির পক্ষে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়াই ছিল নেপথ্যচারি ওই শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি গোটা দেশের জন্য একই সংবিধান প্রণয়ন করে পাকিস্তানকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন এবং চালু করেন যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে গৃহীত হয় এক ইউনিট প্রথা ও সংখ্যাসাম্য নীতি। উল্লেখ্য, এই নীতি কার্যকর হওয়ায় ক্ষতি হয় পূর্ববাংলার, কারণ এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ। বলা বাহুল্য, একদিকে যখন একে একে কেন্দ্রের এই জনবিরোধী নীতিগুলি প্রকাশিত হচ্ছে তখন মাত্র কিছুদিন আগেই কমিউনিস্টদের আওয়ামি লিগে যোগদানের সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করে দলীয় নেতৃত্ব পড়ে যান প্রবল অস্বস্তিতে।

এমন এক পরিস্থিতিতে '৫৭ সালে হয় আওয়ামি লিগের কাগমারি সম্মেলন। টাঙ্গাইল শহরের কাছে কাগমারিতে ছিল সন্তোষের জমিদার বাড়ি। রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আগে ভাসানী সেখানে ছিলেন এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাই ওই অঞ্চলটির তার কাছে একটি প্রতীকী গুরুত্বও ছিল। জমিদার বাড়ির বাইরের উঠোনে শামিয়ানা টাঙিয়ে ও মঞ্চ তৈরি করে হয় সম্মেলন। বহিরাগত আওয়ামি লিগ কর্মীদের রাত্রে থাকার জন্যে দরদালানের একটি ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন– তাই তড়িঘড়ি কিছু সংস্কার হয় পথঘাটের, তাছাড়া সম্মেলন স্থানে প্রবেশের আগে তৈরি হয় নেহরু, নেতাজী, গান্ধিজী, মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের নামে কতগুলি সুউচ্চ তোরণ। অজয় রায় লিখেছেন, 'দেখেশুনে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, সারাদেশ কি আমাদের অজান্তেই এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে?'২৭

প্রসঙ্গত, সম্মেলনের দিনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির তিন শীর্ষনেতা মণি সিংহ, খোকা রায় ও নেপাল নাগ টাঙ্গাইল শহরে জেলা কমিটির সদস্য শামসুদ্দিন সাহেবের বাসায় এসে ওঠেন। তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা করতে আসতেন আওয়ামি লিগের দুই কমিউনিস্ট সদস্য মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ। তাছাড়া ভাসানীর সঙ্গেও তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।২৮

উল্লেখ্য, প্রবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাসানী ছিলেন সুরাবর্দির মার্কিন-প্রীতিতে ক্ষুব্ধ। তাছাড়া সুরাবর্দি দলের ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তার ক্ষোভ। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা নীতিগতভাবে ভাসানীকে সমর্থন করলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে তারা আওয়ামি লিগে বিভাজনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কাগমারিতে ওই দুই নেতা এক চূড়ান্ত হেস্তনেস্তর জন্য তৈরি থাকলেও কমিউনিস্টদের কৌশলে সাময়িকভাবে বিভাজন ঠেকানো সম্ভব হয় কিন্তু ঢাকায় ফিরেই সুরাবর্দি তড়িঘড়ি আওয়ামি লিগের পরিষদীয় বৈঠক ডেকে

সংখ্যাধিক্যের সমর্থনের ভিত্তিতে পাক-মার্কিন মৈত্রীর সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করিয়ে নেন। ক্ষুব্ধ ভাসানীও কিছুদিন পরে শহরের রূপমহল সিনেমা হলে এক গণতান্ত্রিক কর্মী-সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সেখানে তার প্রস্তাব মত ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি বা 'ন্যাপ' তৈরি হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা দলে দলে যোগ দিতে থাকেন সদ্যগঠিত ন্যাপে। এর ফলে অচিরেই এই দলটি হয়ে ওঠে প্রাদেশিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

এরপর কিছুদিন কেন্দ্র ও প্রাদেশিক রাজনীতি চলতে থাকে নানাবিধ ভাঙাগড়া। এক পর্যায়ে সুরাবর্দি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত ও গ্রেপ্তার হন। আবার প্রদেশেও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন এবং দু-দিন পরেই ফিরে আসেন ক্ষমতায়। গোটা পূর্ববাংলা সরকারি অপশাসন, বিশৃঙ্খলা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কেন্দ্রে জারি হয় আয়ুব খানের সামরিক শাসন।

মণি সিংহ লিখেছেন, 'ফৌজি শাসন জারির পাঁচ/ছ দিন আগে আমরা কয়েকজন মিলে মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অনেক কথার পর আমরা তার সামনে সারাদেশে আসন্ন নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, নির্বাচন হবে না। হবে না। হবে না। আমি ইন্দোনেশিয়ায় চলে যাচ্ছি। নির্বাচন যে হবে না এ ব্যাপারে তার দৃঢ়তা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। জানি না, তিনি আগে থেকে কোন আভাস পেয়েছিলেন কিনা। তবে তার সম্ভাবনা যে যথেষ্ট সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।'২৯

অজয় রায় লিখেছেন–

'৫৮ সালের ৯ অক্টোবর ভোরে ময়মনসিংহ শহরের সি. কে. ঘোষ রোডে রাস্তার সাথে রেললাইনের সংযোগস্থলে এক চায়ের দোকানে আমি ও মন্মথ বাবু বসে চা খাচ্ছিলাম। সকালের খবরের সময় দোকানের ছেলেটি রেডিও চালিয়ে দিল। শুরুতেই শোনা গেলো পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আয়ুব খানের কণ্ঠস্বর– তিনি বললেন, দেশের রাজনীতিকরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সংকীর্ণ দলবাজি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে গোটা দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল ও বিপন্ন করে তুলেছে। এভাবে রাজনীতিকদের অপরাজনীতির কারণে গোটা দেশ আজ গভীর সংকটের মুখে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। তাই প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমেই দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি, সংবিধান স্থগিত ও সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হল। একই সঙ্গে এ জারিকৃত আদেশসমূহ অমান্য করার শাস্তিও ঘোষিত হল। ...আরও জানানো হয় যে আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অধীনে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।

দোকানে আমরা দু-জন ছাড়াও চা খাচ্ছিলেন আরও জনা কয়েক। লক্ষ্য করলাম, ঘোষণা প্রচারের সময়ই দোকানের প্রায় সবাই ফিরে তাকালো আমাদের দিকে। আমরাও দৃষ্টিপাত করলাম। পরে চায়ের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে

পড়লাম দ্রুততার সাথে। ...দু-জনে পাশাপাশি হাঁটছি। রেললাইনের পাশ দিয়ে, পচা পুকুরপাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে। গন্তব্য জেলা কমিটির সদস্য জ্যোতিষ বাবুর বাসা। ...সামরিক শাসন জারি হবে আর বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হবে না– এটা অচিন্ত্যনীয়। জ্যোতিষ বাবুর বাসায় দিনটা কাটিয়ে রাতে মন্মথ বাবুসহ তিনজনই চলে এলাম গোপন আস্তানায়। আস্তানাটি ছিল স্নেহাংশু আচার্য চৌধুরীদের শহরের অনেক বাড়ির মধ্যে একটি। স্নেহাংশু বাবু যেমন নিজে কমিউনিস্ট ছিলেন, তেমনি তার বাড়িঘরের ব্যবস্থাপনার জন্যে শহরে যার ওপর দায়িত্ব ছিল তিনিও ছিলেন পার্টির সদস্য। তারই আনুকূল্যে গোপন ডেরাটি পার্টির ব্যবহারে আসে ...।'

অজয় রায় লিখেছেন, *এভাবেই সূচনা হল আর এক অধ্যায়ের– শুধু আমাদের জীবনে নয়। নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল সমগ্র পাকিস্তানের জীবনেও ...।*৩০

পাঁচ

ওপার বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকা কেমন ছিল? অনিল মুখার্জীর স্মৃতিকথাধর্মী একটি প্রায়-বিস্মৃত বই 'শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি'তে তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়। ঢাকার কাছে মুন্সিগঞ্জের বাসিন্দা অনিল মুখার্জী স্বাধীনতালাভের আগে থেকেই নারায়ণগঞ্জের চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রমিক বস্তিতে একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে দিনরাত্রি একত্রে বসবাস করে কার্যত তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অনিল মুখার্জী লিখেছেন, 'মালিকের পোষা গুন্ডাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার ২নং ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক হুরমত আলি গুরুতর আহত হয়েছেন। কোন কঠিন জিনিসের আঘাত লেগেছে তার কপালে। ডাক্তার দেখেশুনে আমাকে বললেন, ওকে এখুনি ঢাকা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। ওপর থেকে কিছু দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু মাথার খুলির অনেকটা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে। বাঁচার আশা নাই বললেই চলে–

হুরমত আলির কাছে বিদায় নিতে গেলে সে বলল, কমরেড, ডাক্তার আপনাকে কী বললেন– আমি মরব না?

আমি বললাম, আপনি এসব কী বলছেন কমরেড। মরার কী হয়েছে? কয়েকদিন চিকিৎসা হলেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এতক্ষণ হুরমতকে বেশ প্রফুল্লই মনে হয়েছে, কিন্তু দেখলাম এইবার তার মুখ কালো হয়ে গেলো। আমি তাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে আবার বললাম, এটা তো মারাত্মক কোন আঘাত নয়, ডাক্তার বলেছেন ভয়ের কিছুই নেই।

হুরমতকে কিন্তু মনে হল কোন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেদনার সুরে সে বলল কমরেড, তাহলে আমাদের এত বড় লড়াইয়ে একজন মুসলিমও মারা গেলো না।'

মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন ও দেশভাগের ঠিক পরে পূর্ববাংলায় মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। এই কারণে মুসলিমদের মধ্যে যারা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন– তারা লিগের সংকীর্ণ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে না পেরে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। বস্তুত, তারা যে একশ ভাগ মার্কসীয় দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা অন্তরে উপলব্ধি করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতেন এমন নয়। বরং দেখা গেছে, অধিকাংশ সময়েই তারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন খানিকটা ভালো কিছু করার সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে এবং দ্বিতীয়ত ওই দলের কর্মীদের উদার মনোভাব ও সর্বদা মানবদরদী অবস্থানে আকৃষ্ট হয়ে। এইভাবে সেই '৪৬-৪৭ সালে একঝাঁক মুসলিম তরুণ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

অন্যদিকে ওপার বাংলার হিন্দু কমিউনিস্টদের অধিকাংশই ছিলেন বৃটিশ যুগে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তারা দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি হয়ে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সদস্য হন এবং মার্কসবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে উঠেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক জয়লাভ তাদের অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গত, এই সত্যটি কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে ওপার বাংলায় সংগঠন তৈরি ও বিস্তারের জন্যে সেযুগের হিন্দু কমিউনিস্টরা যে অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন– সারা বিশ্বে তার নজির খুব বেশি নেই। শেরপুরের রবি নিয়োগী, পাবনার অমূল্য লাহিড়ী, প্রসাদ রায়, বিক্রমপুরের জিতেন ঘোষ প্রমুখ অসংখ্য কমিউনিস্ট জীবনের পঁচিশ-তিরিশ বছর কাটিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে এবং আরও দশ-পনেরো বছর আত্মগোপনে। উল্লেখ্য, প্রাদেশিক কমিটির নেতা নেপাল নাগ ছিলেন দলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে। নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী কটন মিলের দুটি ইউনিট ছিল শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে। যেহেতু মিল কর্তৃপক্ষ কারখানার মধ্যে নেপাল নাগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই তিনি মাঝনদীতে একটি বাঁশের লগি পুঁতে তাতে ভর দিয়ে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করতেন এবং শ্রমিকরা সদলবলে দু-দিকের কারখানা থেকে বেরিয়ে নৌকাযোগে এসে তার ভাষণ শুনত। এভাবে চলে বেশ কয়েক বছর। নিবেদিতা নাগ লিখেছেন, 'আমার আর কমরেড নাগের খাওয়ার মেনু ছিল সকালে ভাত আর টমেটো সিদ্ধ, রাত্রে শুধু ভাতের ফ্যান। এতে প্রথম দিকে বেশ অসুবিধা হতো কিন্তু কিছুদিন পরে দিব্যি সয়ে গেলো'। সিলেটের বনেদি পরিবারের সন্তান বারীন দত্ত আসামের শ্রীমঙ্গল চা-বাগানে সংগঠন করতে গিয়ে দরিদ্র শ্রমিক বস্তিগুলিতে আশ্রয়ের অভাবে নিকটের একটি ছোট রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বালিশ, শতরঞ্চি বিছিয়ে রাত কাটাতেন। সেখানে রাত্রিবাস করে আবার পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়তেন সংগঠনের কাজে। অথচ দেশভাগের পরে এই নেতাদের পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। উল্লেখ্য, নেপাল নাগ ও খোকা রায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, 'কলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে শিয়ালদার মোড়ে প্রাদেশিক কমিটির এক নেতার সঙ্গে আমার দেখা হয়। কিছুক্ষণ কথাবর্তার পর তিনি আমাকে বললেন, আপনি

কেন চট্টগ্রামে পড়ে আছেন, ওই দেশে বিপ্লব বহু দূরে। আমরা ওখানে পার্টি গড়ার কাজে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি– এই মত দেখলাম আরও অনেকেরই। আবার পূর্ব বাংলা থেকে সদ্য আগত কমরেডদের অনেকে আমাকে উৎসাহিতও করলেন। এর ফলে আমি একদিকে যেমন হয়ে পড়লাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অন্যদিকে তেমনি আশাবাদী ...।'৩১

উল্লেখ্য, দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য মুসলিমদের অনেকের মধ্যে যে প্রবণতাটি প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং যা এখনও বিদ্যমান– তা হল ধর্মীয় উন্মাদনা। কার্যত এই একটি বৈশিষ্ট্যই কমিউনিস্টদের সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই উন্মাদনার অনিবার্য অনুসঙ্গ ছিল দুটি। প্রথমত, কমিউনিস্টরা নাস্তিক। এদের সংস্রবে এলে ধর্মনাশ নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টি হল হিন্দু প্রধান সংগঠন। অতএব, হিন্দুদের মত এরাও দেশের শত্রু।

বস্তুত, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মানে হিন্দুরাও যে আজন্ম বসবাসের কারণে, সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে নিঃস্বার্থভাবে পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে এই বিশ্বাস অধিকাংশ মুসলিমেরই ছিল না। একটি গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের পরেও তা আছে কিনা সন্দেহ। যেহেতু হিন্দুরা তখন দলে দলে ভারতে পাড়ি দিচ্ছিলেন তাই এমন একটি ধারণা দ্রুত নির্মিত হয়ে যায় যে হিন্দু মানেই ভারতীয় এবং সেই সঙ্গে হিন্দু-বিরোধিতা ও ভারত-বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায় সমার্থক। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ওপার বাংলার কমিউনিস্টরা সঠিকভাবেই অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদকে প্রধান অভীষ্ট হিসেবে স্থির করেছিলেন এবং সেই কারণে তারা পার্টি কর্মীদের আওয়ামি লিগ ও ন্যাপে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি কারণ, আওয়ামি লিগের তথাকথিক অসাম্প্রদায়িকতায় অনেক ফাঁকফোকর ছিল। যেমন, কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামি লিগের দীর্ঘদিনের দাবি মত সুরাবর্দি প্রদেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করে বলেন, এর ফলে সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগীদার হওয়ার আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন ছিল না, ছিল সংখ্যালঘুদের সংসদীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

প্রসঙ্গত, আতউর রহমান খানের আমলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি এমন চরম আকার নিয়েছিল যে আয়ুব খানের সামরিক শাসনকে পূর্ব পাকিস্তানবাসী নির্দ্বিধায় সমর্থন জানায়। মণি সিংহের ভাষায়, 'এদেশের মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ তা আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করে।' স্বাভাবিকভাবেই আয়ুব খান ঢাকা সফরে এলে তার সভায় তুমুল লোকসমাগম হয়। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস ছিল নিতান্তই সাময়িক। উল্লেখ্য, ক্ষমতায় এসে আয়ুব জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা পঞ্চাশ সালের আইনে নির্ধারিত ৩৩ একর থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ একর করেন। সেই সঙ্গে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পপতিকে সরকারি সাহায্য দিয়ে লগ্নিতে উৎসাহিত করা হয়। স্পষ্টত, আয়ুবের উদ্দেশ্য ছিল দেশে তার অনুগত একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরি

করা কিন্তু একই সঙ্গে এর ফলে গ্রামের জোতদার শ্রেণি যেমন ফুলে ফেঁপে ওঠে, তেমনি শহরের শিল্পপতিদের শোষণ ও মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বেড়ে চলে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হয়ে দাঁড়ায় আকাশচুম্বী, তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে এতদিনের স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয় সরকার। এই তৃতীয় সিদ্ধান্তটিতে ছাত্র সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

প্রসঙ্গত, কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল, আয়ুব জমানা অবসানের উদ্দেশ্যে দেশের সব রাজনৈতিক দল এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা কিন্তু তাদের শক্তি ছিল সীমিত এবং দ্বিতীয়ত, এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের কারণে আক্রান্ত দলগুলি ছিল পরস্পরের সঙ্গে যোগশূন্য– তাই পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হয়ে দাঁড়ায় খুবই কঠিন। অবশেষে '৬১ সালে মুজিবর রহমান কারামুক্ত হওয়ার পর 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক মানিক মিঞা গোপনে যোগাযোগ করেন মণি সিংহের সঙ্গে। বস্তুত, মানিক মিঞার উদ্যোগেই তার ও মুজিবরের সঙ্গে মণি সিংহ ও খোকা রায়ের কয়েক দফা বৈঠক হয়। সেখানে মণি সিংহ আয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে জোর দেন।৩২ বৈঠকে ঠিক হয় কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এবং আওয়ামি লিগের ছাত্র লিগ সামরিক শাসনের অবসান, রাজবন্দিদের মুক্তি, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করবে। প্রসঙ্গত, আন্দোলন শুরু হলে তাতে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। শহরের অনেক সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরাও মিছিল ও জনসমাগমগুলিতে যোগ দিতে থাকেন। এই আন্দোলনের সূত্রে ছাত্রদের এক বিরাট অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে পার্টির কলেবরও বৃদ্ধি পায়। মণি সিংহ লিখেছেন, '৬২-র এই আন্দোলন অনেক উদ্যোগী, সাহসী ও বিচক্ষণ ছাত্রনেতার জন্ম দেয় - যারা অনতিবিলম্বে পার্টির দৈনন্দিন কাজেও যোগ দিতে থাকেন। ষাটের দশক ও পরবর্তীকালে '৭০-৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই ছাত্রনেতারা পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।'

মর্মান্তিক হল, এই উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের অন্তরালে পার্টি অভ্যন্তরে তৈরি হতে থাকে পার্টি বিভক্তির বীজ। '৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধ উপলক্ষে তা আরও জোরদার হয়। প্রসঙ্গত, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধে ভারতের প্রতি তার নৈতিক সমর্থন ঘোষণা করে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আগেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিল তাই অবস্থানের সাদৃশ্যের কারণে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েতপন্থী। যদিও পার্টির দুই সদস্য সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার অবস্থান ছিল চিনের পক্ষে।

প্রসঙ্গত, '৫৬ সাল থেকেই পার্টি নেতৃত্বের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অভ্যন্তরে গুঞ্জরিত হচ্ছিল অসন্তোষ। চট্টগ্রামের জনপ্রিয় নেতা ও পরে চিনপন্থী সুধাংশু বিমল দত্ত লিখেছেন, 'কমিউনিস্ট কর্মীরা আওয়ামি লিগ বা ন্যাপে যোগ দিয়ে শুধু ওই দলগুলিরই শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির তাতে লাভ কিছু হয়নি।'৩৩

অনুরূপ অভিমত ছিল বরিশালের নেতা নলিনী দাস এবং কুমার মৈত্রেরও। বস্তুত, চিনপন্থী নেতাদের অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় নেতারা আপসপন্থী ও সংস্কারবাদী। পরিবর্তে তারা ছিলেন ভাসানী ও ন্যাপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় আন্দোলনে বামধারা প্রতিষ্ঠার সমর্থক। আবার একথাও ঠিক যে শহরভিত্তিক গণ আন্দোলনকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে গিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি আন্দোলন ও শ্রেণি সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি উপেক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে '৬৮ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এই প্রবণতাটিকে চিহ্নিত করা হয় দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ বলে।৩৪ এর ফলে কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের পার্টির সংগঠন হয়ে পড়েছিল কার্যত অস্তিত্বহীন।

শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, 'জেল থেকে বেরনোর পর আমাকে আলোচনার জন্য ডাকল কেন্দ্রীয় কমিটি। গিয়ে দেখলাম ন্যাপকে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি ক্ষুদ্র উপদল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরে জানতে পারলাম ওরা সবাই পিকিংপন্থী। আরও জানলাম, এসবের পিছনে আছে কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা। তাদের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় সংগঠক আব্দুল হক। তাদের কাছে জানতে পারলাম ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলায় স্বতন্ত্র গ্রুপ গঠিত হয়ে গেছে। আমি পড়লাম মহা বিপদে। আমার ২৭ বছরের পার্টি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় আমাকে পড়তে হয়নি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তখন মনে হচ্ছিল পার্টি অভ্যন্তরীণ দুই লাইনের সংগ্রাম যখন চরম পর্যায়ে ওঠে তখন পার্টির ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন প্রচলিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার রীতিনীতি আর মান্য করা হয় না। বিভিন্ন যুক্তিতে গ্রুপ মানসিকতা ও সংকীর্ণতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। সেই ছিল ওই সময়ের পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থা।'৩৫

মণি সিংহ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের লিখিত দলিল ও কেন্দ্রীয় কমিটির অবশিষ্ট সদস্যের লিখিত দলিল পার্টির অভ্যন্তরে প্রচার করা হয়। ... পার্টি ভাগাভাগির আগে আমরা চিনাপন্থী দুই সহকর্মী কমরেডকে বলেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন ও মস্কোর মধ্যে নীতি ও কৌশলগত নানা মতবিরোধ থাকতেই পারে। বৃহৎ দুই পার্টির সমঝোতা না হলে আমরা এইসব মতবিরোধ দূর করতে পারবো না। বরং আসুন, আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাই। ... জবাবে কমরেড তোয়াহা ও কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেহেতু মতবিরোধ চলছে সেহেতু জাতীয় ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কাজেই এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।'

মণি সিংহ লিখেছেন, 'এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী '৬৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় পার্টির একটি প্লেনারি বৈঠক ডাকে। প্রায় ৩০/৩২ জন নেতৃস্থানীয় কর্মী যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই ওই বৈঠকে উপস্থিত হন। ... বৈঠকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতার্দশগত বিরোধ নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেখা গেলো যে সে এক সীমাহীন বিতর্কের বিষয়। তা সহজে শেষ হওয়ার নয়। তাই জোর দেওয়া হল কী করে পার্টির অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দ্রুত দূর করা যায়। ... কিন্তু

সব চেষ্টা ব্যর্থ হল কেননা চিনপন্থীরা কেন্দ্রিকতার নীতি সংক্রান্ত ওই প্রস্তাব উপেক্ষা করলেন।'৩৬

শরবিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় প্লেনাম হওয়ার আগে পিকিংপন্থীরা প্রায় প্রতিটি জেলায় গোপন জেলা কমিটি, সেল, গ্রুপ গঠন সম্পন্ন করেছিল। এভাবে পার্টির অভ্যন্তরে আর একটি পার্টি কাঠামো গড়ে ওঠে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। প্রকাশ্য ও গোপনে দুই পার্টি কাঠামোর নিয়মিত চলতে থাকে বৈঠকও।৩৭

শেষ পর্যন্ত দুটি প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হয় এবং তাতে চিনপন্থীদের প্রস্তাব পরাজিত হয়। তখন তারা বলেন, নীতিগত প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রাহ্য হতে পারে না। এরপরেই পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। কিন্তু সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের পরিণামে চিনপন্থীরা খুব শীঘ্রই অসংখ্য ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভাজিত হতে শুরু করে।

অজয় রায় লিখেছেন, 'আমাদের দেশে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিশেষত তরুণ কর্মীদের মধ্যে চিনপন্থার প্রভাব ছিল বেশি। অন্যদিকে যারা পার্টির সাথে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে বেশিদিন জড়িত তাদের বেশিরভাগ ছিলেন সোভিয়েতপন্থার অনুসারী। এটা প্রকৃতই সত্য যে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিনই গণভিত্তি পায়নি। নানা কারণে তা সম্ভবও ছিল না। তবে দেশে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভাবধারার তুলনামূলক শ্লথ বিকাশ প্রভৃতির পটভূমিতে বামধারা যতটুকু প্রসারতা লাভ করেছিল তা ব্যাহত হয় পার্টি বিভাজনে।৩৮

শরদিন্দু দস্তিদার আরও লিখেছেন, 'আমি যখন '৩৮ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই তখন পার্টি ছিল ঐক্যবদ্ধ। ধ্যান ধারণার ভিন্নতা থাকলেও পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনীতি নির্ধারিত হতো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে। এই নীতি পূর্ব পাকিস্তানে চলেছিল '৬৫ সাল পর্যন্ত। ২৭ বছর পর বুঝতে পারলাম পার্টি ভাঙনের সূত্রপাত হয় ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের মধ্য হতে। ... পেটি বুর্জোয়া কমরেড গণপার্টির উপরের স্তরে নেতা হয়ে পার্টির মধ্যে পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা বিস্তার করে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ আমাদের সমাজে যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন এদের মধ্যে একে একে জন্ম নিতে থাকে বুর্জোয়া ভাবধারা ও চিন্তাভাবনা। তারই প্রতিফলন ঘটে পার্টির সর্বস্তরে ...।'৩৯

প্রসঙ্গত, পার্টি বিভাজনে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন দলের সম্পাদক ও কার্যত পূর্ব বাংলার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মণি সিংহ। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক রাজনীতিতে একটি কিংবদন্তি চরিত্র। তার সম্পর্কে নানারকম কাহিনী প্রচলিত ছিল। শোনা যেত, তিনি নাকি সন্ধ্যেবেলা সাদা ঘোড়ায় চেপে গারো পাহাড়ের নীচে হাজং এলাকায় ঘুরে বেড়ান, তার সামনে থাকে দশ হাজার হাজং কৃষক পিছনে দশ হাজার। আরও শোনা যেত তিনি অতিমানব। তিনি এক বিরাটদেহী, নৃশংস ও

নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তার উপরের পাটির দাঁতগুলো রাক্ষসের মত।৪০ পাকিস্তানের আয়ুব সরকারের আমলে তার মাথার উপরে ১০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়। শেষ পর্যন্ত '৬৭ সালের নভেম্বরে দিনের বেলা ঢাকার আসাদ গেটের কাছে হাতে একটি হোল্ডঅল সমেত এক চলন্ত রিকশা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।৪১ এর আগে '৪৭ থেকে '৬৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি ছিলেন আত্মগোপনে। মণি সিংহ গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন পরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তার মুক্তি দাবি করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। দ্বিতীয় বিবৃতিটি দেন ওপার বাংলার বিশিষ্ট কবি জসীমউদ্দিন।৪২ এর পরেই সমাজের বিভিন্ন ধারার ব্যক্তিদের বিবৃতি ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। অজয় রায় লিখেছেন, 'বস্তুত এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টির নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু মণিদার গ্রেপ্তার ও তারপর তার মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আলোড়ন এই অবস্থা বহুল পরিমাণে বদলে দিল।৪৩

প্রসঙ্গত, রণদিভের হঠকারী লাইন পরিত্যাগের পর পার্টি পুনর্গঠন হলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হন মণি সিংহ। তিনি ওই পদে ছিলেন '৬৮ সাল পর্যন্ত। ওই বছর সম্মেলনের সময় তিনি কারাবন্দি থাকার কারণে তার জায়গায় পার্টি সম্পাদক হন বারীন দত্ত। এরপর '৭৩ ও '৮০ সালে পার্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি হন দলের সভাপতি। তার এই মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত কারণ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার নিরীখে তিনি ছিলেন দলের অবিসম্বাদী নেতা ও সকলের অভিভাবকের মতো। দলের নেতা ও কর্মীরা সকলেই তাকে সম্বোধন করত 'বড়ভাই' বলে।

পার্টি বিভাজনে ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত হলেও কিন্তু কোন কৌশল বা কারচুপির আশ্রয় নেননি মণি সিংহ। আহসানউল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন, '৬০ সালে পার্টির আসন্ন ভাঙনের সময় মণি সিংহ, খোকা রায় ও বারীন দত্ত চট্টগ্রামে আসেন। সেখানে পার্টির দুই মতের দলিল পেশের সময় প্রথমে তিনি সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার প্রস্তাবিত দলিলটি এমনভাবে উপস্থিত সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন যেন তিনিও তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অথচ তিনি ছিলেন উল্টোমতের। কোন বিকৃতি দ্বারা ভিন্নমত পোষণকারী কোন কমরেডের মতের যেন প্রকৃতরূপ ম্লান না হয়ে যায় এবং কমরেডরা যাতে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতায় ও তত্ত্বের নিরীখে সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারেন সেটাই ছিল তার প্রকৃত লক্ষ্য। এহেন বিরল উদারতা ও নিরপেক্ষতা ছিল তার চরিত্রে।৪৪

শরবিন্দু দস্তিদার লিখেছেন, 'মণিদার সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্লেনামের পর মুহূর্তে আমার দেখা হয়। তখন প্লেনামের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কান্নাভেজা সুরে মণিদা আমাকে বললেন, পার্টি আজ দুটো হয়ে গেলো, এর ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। ধীরে ধীরে অন্ধকারের কালো ছায়া এদেশের কমিউনিস্টদের গ্রাস করতে পারে, এ আশঙ্কায় আমার ঘুম হয় না। শেষ মুহূর্তে আমার হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, হয়ত আপনার সঙ্গে এবং আপনার দাদা সুখেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কিন্তু আপনাদের কথা আমি ভুলব না।৪৫

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে মণি সিংহের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে থাকেন। '৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর তার সমসাময়িক তিন কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়, রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেন কলকাতায় চলে যান। দেশে তখন আবার যে জটিল এবং অশ্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা শারীরিক বা মানসিকভাবে এদের ছিল না। এদের মধ্যে খোকা রায় ছিলেন সেই '৫০ সাল থেকে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। দু-জনকে মাঝে মাঝেই ঢাকার অলিতে গলিতে সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। '৮০ সালের জুলাই মাসে এক পথ দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী অণিমা সিংহের মৃত্যু হলে তিনি আরও ভেঙে পড়েন। চার বছর পর '৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে হারিয়ে ফেলেন বাক্‌শক্তি। কার্যত তার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ভ. ই. লেনিনের মতো।

মণি সিংহের শেষ বয়সের সঙ্গী অসিতবরণ রায় লিখেছেন, '৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সকালে তাকে প্রতিদিনের মত ব্রাশ করে দিয়েছি, দাড়ি কামিয়ে দিয়েছি, শুয়ে থাকা অবস্থাতেই খাইয়ে দিয়েছি দুধ। বেলা ১০টা নাগাদ তিনি একবার কালো বমি করলেন, আমি মুখ মুছিয়ে দিলাম। পৌনে ১০টায় মণি সিংহকে দেখতে এলেন মোনায়েম সরকার, রহিমা বেগন ও হেলেন করিম। রহিমা বেগম বার বার বলছিলেন, মণি সিংহকে আজ ভাল দেখাচ্ছে না। তিনি তার কানের কাছে মুখ এনে নীচু গলায় ডাকলেন 'বড়ভাই'। কোন সাড়া না দিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার কালো বমি করলেন এবং আমি আবার তার মুখ মুছিয়ে দিলাম। এটাই যে আমার শেষ মুখ মোছানো তা আমি বুঝিনি। বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের জন্য। ... আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোনে তার পুত্র ও মুনিরভাইকে খবর দিলাম ...।'৪৬

এইভাবে সেদিন পূর্ববঙ্গের প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি নিভে গেলো। শুধু পড়ে রইল তার অঢেল সঞ্চিত স্মৃতি– ধরে নেওয়া যায় যা ছিল একই সঙ্গে ভালোবাসা ও বেদনার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত জ্যোতি বসু লিখেছেন, '৪২ সালে নেত্রকোণা শহরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন হয়। যতদূর মনে আছে, ওই রকম সময়েই মণি সিংহের সঙ্গে আমার আলাপ। ... সুসং যখন মুক্ত এলাকা ঘোষিত হল তখন মণি সিংহ সেই মুক্ত এলাকায় আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। স্নেহাংশু আমাকে নিয়ে ক্ষেত-মাঠ ছাড়িয়ে জিপ চালিয়ে সেখানে গেলো। যথার্থই মুক্ত এলাকা। চারিদিকে লাল পতাকা উড়ছে। সেখানে এক সভায় আমরা বক্তৃতা করলাম। ... তারপরে তার সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন প্রসারিত করার কাজে তার প্রয়াস ও আত্মত্যাগ কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়।'৪৭

টীকা

মণি সিংহ (আজাদ ভাই)

মণি সিংহের নানী (দিদিমা) ছিলেন সুসং-দুর্গাপুরের রাজপরিবারের মেয়ে। বাবা ছিলেন পূর্বধলার জমিদার পরিবারের ছেলে। সেই সূত্রে জমিদারের রক্ত তার গায়ে ছিল। ১৯১৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন দলের সদস্য হন। তার বয়স যখন ২৫, তখন তিনি মস্কো ফেরৎ কমিউনিস্ট গোপেন চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন এবং দীক্ষিত হন মার্কসবাদী মতাদর্শে। পরবর্তীকালে হাজং এলাকায় টংক আন্দোলনে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হন, তারপর শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলায় পার্টির কর্ণধার। একসময় তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পাকিস্তান সরকার ১০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে। তার জীবিতকালে কমিউনিস্টদের তো বটেই, এমনকি অকমিউনিস্ট রাজনীতিবিদদের কাছেও তিনি ছিলেন সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন।

খোকা রায় (আজিজ ভাই)

খোকা রায়ের জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়। কৈশোরেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন যুগান্তর দলের সংগে। '৩০ সালে জামালপুর ফেরিঘাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানে অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। ঐ জেলেই তার মার্কসবাদ চর্চার শুরু এবং দীক্ষালাভ। ১৯৪৮ সালে দেশভাগের মতো কমিউনিস্ট পার্টিও বিভাজিত হলে তিনি হন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্পাদক। তিনি ছিলেন সুলেখক। গোপন পার্টির মুখপাত্র 'শিখা'র অধিকাংশ লেখা, পার্টির লিফলেট, কর্মীদের প্রতি নির্দেশ ইত্যাদি ছিল তার রচিত। ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর তিনি কলকাতায় চলে যান। তার শরীরও ভেঙে পড়েছিল।

নেপাল নাগ (রহমান ভাই)

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই নেপাল নাগ ছিলেন ঢাকার সন্ত্রাসবাদী শ্রীসঙ্ঘ গোষ্ঠীর সদস্য। ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি রাজস্থানের দেউলি জেলে প্রেরিত হন এবং সেখানে কনসলিডেশনের সদস্য হিসেবে মার্কসবাদ শিক্ষা শুরু করেন। জেল থেকে ফিরে তিনি নারায়ণগঞ্জে সুতাকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঢাকায় পাকিস্তান দিবেসের সভায় তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একমাত্র বক্তা। ১৯৬০ সালে মস্কোতে ৮১ পার্টির সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। পরের বছর রুশ প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের বিশেষ আমন্ত্রণে দেশের ২০ তম কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। একসময় ধারাবাহিক খাবার অনিয়ম, শরীরের অযত্ন ইত্যাদি কারণে দুরারোগ্য সুগারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৬২ সালে কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন।

অনিল মুখার্জি (আমিন ভাই)

অনিল মুখার্জি তার স্মৃতিকথায় ছিখেছেন ১৯২০ সালে আসামের চারগোলা চা বাগানের বিতাড়িত শ্রমিকেরা বিধ্বস্ত অবস্থায় চাঁদপুরে জড়ো হলে গোটা বাংলায় যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে তিনি শ্রমিকদের জীবন ও রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন দলের সদস্য, পরবর্তীকালে আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাকালীন তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। স্বাধীনতার আগে থেকেই তিনি নারায়ণগঞ্জ সুতাকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হন। তার লেখা 'সাম্যবাদের ভূমিকা' ও 'শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি' বই দুটি প্রকাশের পরেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।

জ্ঞান চক্রবর্তী (করিম ভাই)

জ্ঞান চক্রবর্তীও যুগান্তর নামে একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে দেউলি বন্দি নিবাসে যান এবং ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। দেশভাগের আগে থেকেই তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং বিভাজরে পরেও তার ওই দায়িত্ব অটুট ছিল। তিনি ছিলেন অনেক তরুণ কমিউনিস্টয়েরই শিক্ষাগুরু। তার সান্নিধ্য যারা পেয়েছেন তাদের কাছে জ্ঞানদার সঙ্গে দিনগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে।

সুখেন্দু দস্তিদার (বশির ভাই)

সূর্য সেনের ভাবশিষ্য সুখেন্দু দস্তিদার মাত্র ১৪ বছর বয়সে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তার বয়স ১৬ বছর পূর্ণ না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেনি, পরবর্তীতে তাকে পাঠানো হয় আন্দামান সেলুলার জেলে। সেখানে কনসলিডেশনের সদস্য হিসাবে মার্কবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তার সারা জীবনই অতিবাহিত হয়েছে শহরের কোনো গোপন ডেনে কিংবা গ্রামে গঞ্জে কৃষকের মাটির বাড়িতে। তার দলের (চীনপন্থী) এক গোপন বৈঠক চলাকালীন অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।

সুধাংশু বিমল দত্ত (কবীর ভাই)

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সুধাংশু বিমল দত্ত চট্টগ্রাম থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। অথচ নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন পলাতক। তার রাজনৈতিক জীবনের বহু বছর কারাবাসে কাটে। ১৯৬০-এর দশকে পার্টি বিভাজনের পর তিনি চীনপন্থী হয়ে যান।

অজয় রায় (শরীফ ভাই)

অজয় রায়ের জন্ম কিশোরগঞ্জে। তার বাবা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সেখানেই তার বাল্যকাল কাটে। পরে স্বগৃহে ফিরেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। প্রায় ১৫ বছর তিনি কারাবাসে কাটিয়েছেন এবং

৭/৮ বছর আত্মগোপনে। জাতীয় রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু বইয়েরও তিনি রচয়িতা। তার রচনা শৈলীর গুণে তার লিখিত প্রতিটি বই-ই সুখপাঠ্য।

শরদিন্দু দস্তিদার (শহিদ ভাই)

চট্টগ্রামে শরদিন্দু দস্তিদারের গোটা পরিবারটিই মাস্টারদা সূর্যসেনের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। তার এক ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদার ঐতিহাসিক জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে শহিদ হন। যুব বিদ্রোহের চিরস্মরণীয় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও ছিলেন তাঁর আত্মীয়। তিনি বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বময় নেতা মুজফ্ফর আহমেদ বা কাকাবাবুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বস্তুত তার মতো দক্ষ সংগঠক ও একনিষ্ঠ কমরেড যেকোনো দলের কাছেই অমূল্য।

সত্যেন সেন (শাজাহান ভাই)

সত্যেন সেন ছিলেন একই সঙ্গে কমিউনিস্ট বিপ্লবী, জনপ্রিয় সাহিত্যিক এবং বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা। সারাজীবনে তিনি বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে বসেই তিনি রচনা করেছেন তার বহু বিখ্যাত উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার বিখ্যাত বাম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা।

বারীণ দত্ত (সালাম ভাই)

বারীণ দত্ত ছিলেন সিলেটের নানকার আন্দোলনের এক কিংবদন্তী নেতা। তার বাবা ওই শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের বিশাল গৃহটি হয়ে দাঁড়ায় কমিউস্টি যুবক ও নেতাদের একটি বহু ব্যবহৃত ঘাঁটি। বারীণ দত্তের ভাই ও বোনেরা সকলেই বিভিন্ন সময় কমিউস্টি পার্টিতে যোগ দেন। ভাষা আন্দোলনে তার ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

হেনা দাস (আমিনা বিবি)

বারীণ দত্তের ছোট বোন হেনা দাসও নানকার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সিলেটের চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার সময় তাকে শ্রমিক বস্তিতেও বহুকাল কাটাতে হয়। তার বিবাহ হয় সিলেটের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক রোহিনী দাসের সঙ্গে পরবর্তী কালে তিনি ছিলেন ঢাকা শহরের শিক্ষা আন্দোলনের নেত্রী।

নিবেদিতা নাগ (রিজিয়া বেগম)

দেশভাগের পর কালো বোরখায় মাথা ঢেকে সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা নাগ কমলাপুর ডেন থেকে বেরিয়ে পড়তেন সংগঠনের কাজে। ১৯৪৯ সালে ঢাকার করনেশন পার্কের এক জনসভা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। স্বামী নেপাল নাগের সঙ্গে তিনি নারায়ণগঞ্জে সুতাকল শ্রমিকদের বস্তিতে শুধু সাদা ভাত ও ভাতের ফেন খেয়ে বহুদিন কাটিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে তার পুত্রের রিউম্যাটিক হার্ট হওয়ায় তিনি তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন।

মুহম্মদ এয়াকুব মিঞা (বড় মিঞা)

কৃষক নেতা এয়াকুব মিঞা ১৮৯৪ সালে (আনুমানিক) কুমিল্লার জেলার বরুরা থানার গালিমপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লায় কৃষক সমিতি গড়ে তুলেছিলেন, তার উদ্যোগে ১৯৩৮ সালের মে মাসে ভারত কৃষক সভার তৃতীয় সম্মেলন কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখে দেয়াতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্তফন্টের প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান আমলে জুলুম ও নির্যাতনের স্বীকার হন এবং দীর্ঘ সময় কারাবাসে থাকেন। ১৯৬১ সালে সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গুরুদাস তালকুদার

কমরেড গুরুদাস তালুকদার ১৮৯৭ সালে রংপুর জেলার পীরগাছা থানার এক প্রভাবশালী জমিদার পরিবাবের জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতার কলেজে লেখাপড়ার সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আহ্বানে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এসময় তার বাবা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক তেভাগা কৃষক আন্দোলনের নেতা ও ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী। পাকিস্তান আমলে তাকে জেল, জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আজীবন সংগ্রামী এই নেতা মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ১৯৮০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে দিনাজপুর শহরে তার মৃত্যু হয়।

মণিকৃষ্ণ সেন

১৯০৩ সালের ১ নভেম্বর বর্তমান রাজবাড়ি জেলার বেরাদী গ্রামে মণিকৃষ্ণ সেনের জন্ম। তার বাবা বেণীমাধব সেন পীরগঞ্জের কাবিলপুরের জমিদারি সেরেস্তায় কর্মরত ছিলেন কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি প্রয়াত হন। কবিরাজী ছিল এই সেন পরিবারের পুরুষানুক্রমিক পেশা। দাদা শিবকৃষ্ণ সেন বাবার মৃত্যুর পর গোটা পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং মণিকৃষ্ণ ছিলেন তার বিশেষ স্নেহভাজন। ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনের সূত্রে মণিকৃষ্ণ সেন রাজনীতিতে আসেন। ওই আন্দোলন রংপুরে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৭ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন কিন্তু গোপনে তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের সদস্য। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ. ও আইন পাশ করেন। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে তাকে সুদূর রাজস্থানের দেউলি জেলে পাঠানো হয়। ওই জেলেই তিনি মার্কসবাদী রাজনীতির সান্নিধ্যে আসেন। ত্রিশ-এর দশকের মধ্যভাগে রংপুরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলায় এবং ওই জেলায় পরে তেভাগা আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। অকৃতদার মণিকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ববঙ্গের পার্টির সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং ছিলেন নবীন প্রজন্মের একনিষ্ঠ শিক্ষক।

আলতাব আলি

আলতাব আলির জন্ম ময়নমনসিংহ জেলায় ১৯০৯ সালে। তার বাবার নাম ডেঙ্গু ব্যাপারী। তার এক খুড়তুতো ভাই উমেদ আলির সূত্রে তিনি ছাত্রজীবনেই অনুশীলন

দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালের এমন একটি সংঘর্ষে তিনি আহত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন মুক্তাগাছার জমিদার-পুত্র স্নেহাংশু আচার্য। প্রসঙ্গত, অনুশীলন দল ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে তখন মতাদর্শগত তফাৎ থাকলেও পরস্পরের যথেষ্ট হৃদ্যতা ও নৈকট্য ছিল এবং ছিল সহযোগিতার সম্পর্ক। যদিও ওই জেলায় মণি সিংহ যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন তখনও খোকা রায়, আলতাব আলি প্রমুখ ছিলেন অনুশীলন দলে। শেষ পর্যন্ত টংক আন্দোলনের সময় তিনি পার্টিতে যোগ দেন। জীবনে বহু বছর তিনি কারাবাসে কাটিয়েছেন। ৪৮ সালের কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে তিনি ময়মনসিংহের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরে পূর্ব বাংলার পার্টিতে তিনি ছিলেন প্রাদেশিক কমিটির সদস্য।

সন্তোষ ব্যানার্জী

আজীবন বিপ্লবী সন্তোষ ব্যানার্জী ১৯১৩ সালে মাদারিপুরের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে তিনি বিট্রিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি চল্লিশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সন্তোষ ব্যানার্জী প্রায় ২৫ বছর বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। তিনি ২০০৩ সালে নব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

জুঁইফুল রায়

জুঁইফুল রায়ের জন্ম বরিশালে ১৯১৮ সালে। ত্রিশ সাল থেকেই ওই জেলার প্রবাদপ্রতিম মনোরমা বসু মাসিমার হাত ধরে কংগ্রেস অফিসে যেতেন এবং নেতা-নেত্রীদের আলোচনা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। কমিউনিস্ট নেতা অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ) ছিলেন তার প্রতিবেশী, যদিও তখন তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালে জুঁইফুল রায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন। কিছুদিন বরিশাল সদর গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতাও করেন তিনি। ১৯৪৩ সালের পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে স্বামী খোকা রায়ের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে যান। দেশভাগের পর আবার ফিরে আসেন পূর্ববঙ্গে। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় সারা বাংলায় যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠেছিল তিনি ছিলেন তার বরিশাল জেলার সম্পাদিকা এবং গোটা প্রদেশের সহ-সম্পাদিকা। পুরান ঢাকায় অর্থাভাব ও প্রবল কৃচ্ছসাধনের মধ্যে তাকে দিনযাপন করতে হতো। কালো বোরখায় মুখ ঢেকে আয়েশা আপা ছদ্মনামে তিনি দরিদ্র মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাজনীতি প্রচার করতেন। ১৯৬০ সালে তিনি মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেও পূর্ববঙ্গের বাম রাজনীতির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল অক্ষুণ্ন।

মন্মথ দে

বিপ্লবী মন্মথ দে ১৯২০ সালে শেরপুরের নকলা উপজেলায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সাথে জড়িত ও সক্রিয় হন। রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায় আই এ চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি টঙ্ক ও তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ ও

পাকিস্তান আমলে তাঁকে বিভিন্ন পুলিশী নির্যাতন ও দীর্ঘ কারাবরণ করে নিতে হয়। ১৯৭১ এ তিনি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি জামালপুর ও শেরপুর জেলায় পার্টি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৮০) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৮৮ সালের ১৯ মার্চ ৬৮ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

জ্যোতিষ বসু (সেন্টু বসু)

এক উদার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বৃহত্তর পারিবারিক পরিসরে ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ শহরে নওমহলস্থ পৈত্রিক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষ বসু ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে পরবর্তীতে সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সাণে নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৃষক সভায় তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নেন। ১৯৬০ সালে আত্মগোপন অবস্থায় কিশোরগঞ্জে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত জেলে কাটান। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বারেঙ্গাঁপাড়া, চান্দুভুঁই ও সিশিংপাড়ায় ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন-এর বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ৩টি ক্যাম্পের পরিচালক ছিলেন তিনি। তিনি আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টি ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালের ১৮ জুন ৬১ বছর বয়েসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শান্তি দত্ত

শান্তি দত্ত (ভট্টাচার্য) ১৯২৬ সালে হবিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার বড় দুই ভাই চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সামিল হন ও নারী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, ১৯৫০ সালে কমরেড বারিণ দত্তের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, আত্মগোপন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের সাথে তিনি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কার্যালয় গুছিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ও বস্তি এলাকায় মহিলাদের সংগঠন গড়ে তোলেন। ২০০১ সালে ২২ ডিসেম্বর ৭৫ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

অনিমা সিংহ

অনিমা সিংহ ১৯২৮ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সিলেট মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন ও পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। তিনি মেডিক্যাল

পড়া ছেড়ে দিয়ে টঙ্ক আন্দোলনে যোগ দেন। আত্মগোপন অবস্থায় পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ পাশ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে কমরেড মণি সিংহের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কৃষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ও কৃষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮০ সালের ২ জুলাই এক সড়ক দুর্ঘটনায় ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাজী আব্দুল বারী

প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, ভাষা সৈনিক কাজী আব্দুল বারী কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১৯৩৩ সালে এক প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজে দু-বার সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ন্যাপের (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ ন্যাপের সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৩ সালে ২১ ডিসেম্বর ৫০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ললিত সরকার (ললিত হাজং)

দূর্গাপুর, সুসং এলাকার প্রভাবশালী ধনী কৃষক ও হাজং উপজাতির একজন অন্যতম প্রধান নেতা। নেত্রকোণার উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ১২ বছর টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী ও জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে ওঠে তার প্রধান নেতা কমরেড মণি সিংহ-এর প্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন ললিত সরকার। টঙ্ক প্রথা ছিল কৃষকদের উপর এক প্রকার জঘন্য ও বর্বরতম সামন্তবাদী শোষণ। টঙ্ক প্রথার জমিতে কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। জমিতে ধান হোক বা না হোক ধান প্রদানের মাধ্যমেই জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করতে হতো। গারো পাহাড়ের দক্ষিণে ৫০ মাইল লম্বা ও ১০ মাইল চওড়া একটি বিশেষ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এই আন্দোলন ছিল সুসংয়ের জমিদার ও অন্য ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে ললিত সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে কমরেড মণি সিংহ বলেন "ললিত সরকার ছিলেন ধনী কৃষক। কিন্তু তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি হাজং উপজাতির একজন প্রধান নেতাও ছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ান।"

দেশ বিভাগের পর আবার হাজংদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু হয় এবং এতে প্রায় ৬০ জন কৃষক নিহত হন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু হাজং পরিবার ললিত সরকারের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে সদস্যগঠিত মেঘালয় রাজ্যে চলে যান। বাংলাদেশের টঙ্ক আন্দোলনের ইতিহাসে ললিত সরকারের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

টীকা তথ্যসূত্র

১. রায় খোকা, সংগ্রামের তিন দশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০, পুরোনো পল্টন, ঢাকা, প্রকাশক– মফিদুল হক, প্রকাশকাল– ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
২. সুফী মোতাহার হোসেন, কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জীবন ও সংগ্রাম, প্রকাশক– জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল– অক্টোবর ১৯৯৭
৩. দস্তিদার শরদিন্দু, জীবনস্মৃতি প্রথম খণ্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১, পুরোনো পল্টন, ঢাকা, প্রকাশকাল– ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
৪. রায় খোকা, তদেব
৫. রায় খোকা, তদেব
৬. দত্ত বারীণ, সংগ্রাম মুখর দিনগুলি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১, পুরোনো পল্টন, ঢাকা, প্রকাশকাল– ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
৭. লেনিন, নূহ-উল-আলম, কমিউস্টি পার্টির ইতিহাস, প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭, পুরোনো পল্টন, ঢাকা প্রকাশকাল– ২০০১
৮. সিংহ মণি, জীবন সংগ্রাম, প্রকাশক– হারুনার রশিদ ভূঁইঞা, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– জুলাই ১৯৮৩
৯. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব
১০. রায় খোকা, তদেব
১১. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব

গ্রন্থসূত্র

০১. রায় খোকা, 'সংগ্রামের তিনদশক'।
০২. বিপ্লবী মণিকৃষ্ণ সেন স্মারক গ্রন্থ।
০৩. দস্তিদার শরদিন্দু, 'জীবনস্মৃতি' ১ম খণ্ড।
০৪. রায় খোকা, তদেব।
০৫. রায় খোকা, তদেব।
০৬. দত্ত বারীণ, 'সংগ্রামমুখর দিনগুলি'।
০৭. লেনিন, নূহ-উল-আলম, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র'।
০৮. সিংহ মণি, 'জীবন সংগ্রাম'।
০৯. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
১০. রায় খোকা, তদেব।
১১. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
১২. রফিক শেখ স., 'বিপ্লবী নেপাল নাগ স্মৃতিকথা'।
১৩. নবী মহম্মদ, 'আমার কিছু কথা'।
১৪. দাস হেনা, 'চারপুরুষের কাহিনী'।

১৫. রহমান শেখ মুজিবর, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'।
১৬. 'মুখ' সাময়িকপত্র, ৭১ সংখ্যা।
১৭. 'স্বোপার্জিত', অজয় রায় স্মারকসংখ্যা।
১৮. রায় খোকা, তদেব।
১৯. রফিক শেখ স., 'বিপ্লবী নেপাল নাগ স্মৃতিকথা'।
২০. নবী মহম্মদ, তদেব।
২১. রায় অজয়, 'তীরের অন্বেষায়'।
২২. দত্ত বারীন, তদেব।
২৩. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
২৪. শহীদ আবদুশ, 'কারাস্মৃতি'।
২৫. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
২৬. রায় অজয়, তদেব।
২৭. রায় অজয়, তদেব।
২৮. রায় অজয়, তদেব।
২৯. সিংহ মণি, তদেব।
৩০. রায় অজয়, তদেব।
৩১. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
৩২. আকাশ এম. এম. তদেব।
৩৩. সুধাংশুবিমল দত্ত স্মারকগ্রন্থ।
৩৪. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ১ম কংগ্রেসের রিপোর্ট (১৯৬৮)।
৩৫. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
৩৬. সিংহ মণি, তদেব।
৩৭. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
৩৮. রায় অজয়, বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন (১৯৪৭-৭১)।
৩৯. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
৪০. নবী মহম্মদ, তদেব।
৪১. আকাশ এম. এম. তদেব।
৪২. আকাশ এম. এম. তদেব।
৪৩. রায় অজয়, 'তীরের অন্বেষায়'।
৪৪. আকাশ এম. এম. তদেব।
৪৫. দস্তিদার শরদিন্দু, তদেব।
৪৬. আকাশ এম. এম. তদেব।
৪৭. আকাশ এম. এম. তদেব।

(৫২ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান সরকার প্রথম ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু করে। এরপর '৫৩ সালে পূর্ব বাংলার লিগ সরকার প্রতিটি রাজবন্দিকে একটি করে চিঠি দিয়ে সে কোন দেশের নাগরিক তা জানাতে বলে। যাতে কোন মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না পায় এই জন্যে প্রথমে সব রাজবন্দিই

নিজেকে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু পরে বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ দোদুল্যমানতার সৃষ্টি হওয়ায় কলকাতায় মুজফফর আহমেদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়। কাকাবাবু জানিয়ে দেন, যাদের পরিবার ভারতে আছেন এবং যারা মুক্তি পেয়ে ভারতে চলে আসবেন অথবা যাদের পরিবার এখনও পূর্ব পাকিস্তানে আছেন কিন্তু মুক্তিলাভের পর ভারতে চলে যেতে ইচ্ছুক– তারা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করুন। এই নির্দেশ পাওয়ার পরে কৃষ্ণবিনোদ রায়, মনসুর হবিবুল্লা, মহম্মদ আমিনসহ ৩০ জন কমিউনিস্ট নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে ঘোষণা করেন। এদের মুক্তি দিয়ে পুলিশ পাহারায় দর্শনা সীমান্তে নিয়ে এসে ভারতীয় এলাকায়, ভারতীয় পুলিশের জিম্মায় তুলে দেওয়া হয়। এরা কেউই আর পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে ফিরে যাননি। দ্রষ্টব্য, মহম্মদ আমিন– 'জীবনের ধূপছাঁও'।)

কৃতজ্ঞতা: ফুলটুসি শিরীন, কমলাপুর ডেনের গৃহকর্তা আদিলুদ্দিনের কন্যা, অসিতবরণ রায়, মণি সিংহের শেষ জীবনের সঙ্গী, আইনজীবী তোবারক হোসেন এবং আরও অনেকের কাছে।

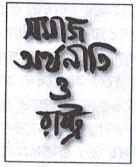

প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়ন এবং শিক্ষার হেরফের

হায়দার আলী খান*

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে এখানে প্রতিবেশ-বান্ধব ধারণাটিকে আমি ইংরেজি Eco-friendly (Ecologically-friendly) ধারণাটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করছি। পরিবেশ-বান্ধব বা Environment-friendly কথাটি বাংলায় ইতোমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। ইংরেজিতে যে অর্থে Ecology একটি ব্যাপক ধারণা– যার ব্যাপ্তি মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং প্রকৃতি এই সমগ্রের পরস্পর নির্ভরশীলতাকে ঘিরে– 'প্রতিবেশ' শব্দটিকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করছি। তাহলে যা প্রতিবেশ-বান্ধব তা পরিবেশ-বান্ধবও বটে।১

বন্দনা শিব এবং অন্যান্য অনেকেই Earth Democracy বা পৃথিবীর গণতন্ত্র বলতে আমার মনে হয় এই প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে আমি প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্র গড়ে তোলার এবং এই প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়নের প্রাথমিক শর্তাবলীর প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বিবেচনায় তাই এই প্রবন্ধ বিশ্লেষণকে কিছুটা অগ্রসর করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আশা করা যায় এই আলোচনা ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক আলোচনার ভূমিকা হিসাবে গণ্য হবে। এই প্রবন্ধের সিংহভাগ জুড়ে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতান্ত্রিক শিক্ষার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করব।

(১)

গণতন্ত্র যে একটি জটিল ধারণা এবং সমাজের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিবিধ দ্বান্দ্বিক প্রপঞ্চর দ্বান্দ্বিক সমাহার সেটা আমি আমার পূর্ব-প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধে কিছুটা প্রকাশ করেছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর পদ্ধতিগত এবং বিষয়গত দুটো দিকই আছে। পদ্ধতির দিক দিয়ে আমি দ্বান্দ্বিক চিন্তার মাধ্যমে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অসম দ্বান্দ্বিক বিকাশের দিকে জোর দিয়েছি। এখানে অতীতের মনীষীদের চিন্তার ওপর নির্ভর করার সাথে সাথে সেই চিন্তাকে অগ্রসরমান করার এবং বর্তমান বিশ্বের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে তোলার দিকেই আমি এগোতে চেষ্টা করেছি। বিষয়গত দিক দিয়ে নাগরিকদের

মানবাধিকার, সামাজিক সক্ষমতা এবং পূর্ণ মানবতার বিকাশের প্রাথমিক শর্তাবলীর উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ আমার মতে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এই বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণের জন্য আধুনিক Complex Systems Analysis কে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিক দিয়ে দেখা দরকার। সেজন্যই সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির পারস্পারিক সম্পর্কগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে গণতন্ত্রের ফর্মান বা রূপকারী দিকে এবং Substantive বা বিষয়গত দিক– এই দুদিকের পার্থক্য দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক বিকাশের বিষয়গুলোকে বোঝা প্রয়োজন। খান (১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮) এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্য পঠনীয়। এ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধু এটাই বলা প্রয়োজন যে ফর্মাল গণতন্ত্রের নিয়ম-কানুন যেমন গঠনতন্ত্রের প্রণয়ন ও প্রয়োগ, সংসদীয় রাজনীতির নিয়ম-কানুন, নির্বাচনের বিভিন্ন প্রকরণ এসব কিছুই তুচ্ছ করার বিষয় নয়। বিশেষতঃ সংখ্যা-সূচক (Proportional Representation) সংসদীয় গণতন্ত্র সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক বিতর্ক ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সুবিধা-অসুবিধা, চাহিদা ইত্যাদিকে অনেক গভীরভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম। এই উদাহরণ থেকে আশা করি রূপকারী গণতন্ত্র এবং সার্বিক অর্থে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়নের সম্পর্কে আংশিকভাবে হলেও তা বোঝা যাচ্ছে।

মূলত এ প্রবন্ধে আমি প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের বিষয়গত দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করব।

(২)

বিষয়গত দিক দিয়ে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য আমি নীচের কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেব।

২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা
২.২ সামাজিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্ষমতার সাম্য
২.৩ ব্যাপকার্থে সাংস্কৃতিক বিকাশ যেটা গণতন্ত্রের গভীরায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, যে আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো শুধু উপরের প্রসঙ্গতেই সীমিত নয়। বিশেষ করে শেষ প্রপঞ্চটি প্রতিবেশ-বান্ধবতা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অবশ্য-বিচার্য।

(৩)

এবার আমি সংক্ষেপে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়নের এক গুচ্ছ শর্তাবলীর আলোচনা করব। যেহেতু দ্বান্দ্বিক বিচারে গণতান্ত্রিক গভীরায়ন গভীর সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয়, দ্বান্দ্বিক বিবর্তনমূলক বিবেচনায় বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতি এবং তার সাথে গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিকাশের শর্তাবলীর আলোচনার সূত্রপাত করাও দরকারী। সুতরাং এ প্রজন্মের শেষ অংশটি হবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক শিক্ষা

ব্যবস্থার সম্ভাবনার আলোচনা। আগে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়নের আলোচনা সংক্ষেপে সারছি।

আমি প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের বিবর্তন কীভাবে গভীরতর হতে পারে তার জন্য পাঁচ গুচ্ছ শর্তাবলী নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছি। অতিসংক্ষেপে এই পাঁচ গুচ্ছ শর্তাবলীর রূপরেখা উল্লেখ মাত্র করব।

১. পরিবেশ-বান্ধব হতে হলে সত্যিকার অর্থে টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের পথে যেতে হবে।২ এর জন্য দরকার পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার।

২. অর্থনৈতিক শর্তাবলীর মধ্যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য আন্দোলন এবং উন্নয়নের নতুন স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল অবলম্বন। শুধু পুঁজিবাদের গন্ডীর ভিতরে নয়, পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণের জন্যও সংস্কারমূলক আন্দোলন বা Reform movement কে সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবার আন্দোলনের দিকে ধাবিত করতে হবে। এটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কৌশলগত দিক। অর্থনৈতিকভাবে প্রযুক্তি ও প্রকৌশলকেও গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবার কৌশল দরকার। যৌথতাভিত্তিক সমবায়– যার ভিত্তি হবে জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার– এই কৌশলের একটি বিশেষ অংশ।

৩. রাজনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের আন্দোলন: গণতন্ত্রের ফর্মাল দিকগুলোর গভীরায়নের যৌক্তিকতা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জনগণের ভেতরে নীচ থেকে রাজনৈতিক চিন্তা, বিশ্লেষণ এবং গণতন্ত্রমুখী উদ্যমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা– এই রাজনৈতিক উদ্যমের ভেতর দিয়ে গ্রাম্সী কথিত নতুন ঐতিহাসিক বা হিষ্টোরিক ব্লকের জন্ম হবে। এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা দরকার এবং সেটাই এই প্রবন্ধে একটু দীর্ঘতর পরিসরে শেষের দিকে আলোচিত হবে।

৪. সংকীর্ণ অর্থে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তর-সত্তরের গণ-আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার সাংস্কৃতিক প্রকাশ। তাই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্য, নাটক-সিনেমা, সব সাংস্কৃতিক প্রয়াসই গণতন্ত্রের গভীরায়নের ধারক এবং বাহক হতে পারে যদি প্রগতিশীলতাই এসব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান দিক হয়। যেহেতু বাংলাদেশ মূলত কৃষক-শ্রমিক-নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশ, এইসব শ্রেণির লোক সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি।

৫. ব্যাপক অর্থে সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অংশ। নৃতত্ত্ববিদগণ বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব-সংস্কৃতির

এই বিবর্তনকে গত একশ বছরের প্রচেষ্টায় অনেক পরিষ্কার তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন। গণতন্ত্রের গভীরায়নের জন্য মানব-সংস্কৃতির প্রতিবেশবাদী, সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক দিকগুলোকে শক্তিশালী করার আন্দোলন গড়ে তোলা একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষক শ্রেণির বিপক্ষে দ্বান্দ্বিক এই সংঘর্ষ ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির বিবর্তনের একটি প্রধান অঙ্গ। গ্রামসী কথিত বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্যবাদ বা হেজেমনির বিপক্ষে এক সংগ্রামী বিকল্প সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতিবেশ-বান্ধব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান করণীয়।

উপরের এই অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেও এটা নিশ্চিত যে সময়বিশেষে বিভিন্ন দিক প্রাধান্য লাভ করলেও Brandel কথিত Longue Durce বা দূরপাল্লার ইতিহাসে আমাদের উপরের পঞ্চ-প্রপঞ্চ শ্রেণির সবগুলোই জরুরি। বাজেট tactics হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সত্যি, তার চেয়েও বেশি সত্যি হচ্ছে ইতিহাসের যুগ-বদলের এই সময়ে দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যুক্ত উপরের পাঁচটি দিককে মিলিয়ে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতান্ত্রের গভীরায়নের চিন্তা ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলন। এবং এই আন্দোলনকে অবশ্যই মৌলিক অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। এরজন্য নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা দরকার। এই প্রবন্ধের বাকি অংশটুকু সেই চেষ্টারই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

(৪)

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং শিক্ষা ব্যবস্থা: প্রতিবেশ-বান্ধব গণতান্ত্রের আন্দোলনের জন্য আমাদের কী ধরণের বিশ্লেষণ দরকার? এই প্রশ্নটি খুবই জরুরি। কারণ এ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারলে নতুন শিক্ষা এবং নতুন পৃথিবী গড়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ-রেখা খুঁজে পাওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভবপর হবে।

এজন্যে সমাজ ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই শ্রমব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্যই সমাজ একটি জটিল গাঠনিক প্রক্রিয়া। আধুনিক পুঁজিবাদে তেমনই রাষ্ট্রও একটি জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভূ-সংস্থান। এর সবই শ্রমব্যবস্থার সঙ্গে জটিলভাবে জড়িত। আমাদের দ্বান্দ্বিক জটিল আধুনিক বিশ্লেষণ আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমব্যবস্থা এই দুটি জটিল ও উপগাঠনিক (sub-systemic) প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসসম্মত নৈয়ারিক বিচারের বিশ্লেষণের দিকে সবিশেষ নজর দেব।

খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হলে রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, পরিবার, বৃহত্তর সমাজ বা civil society, শ্রমব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের মূল সূত্রগুলো একটি ডায়াগ্রামের মারফতে বোঝানো যেতে পারে। এ সবকিছুর মূলভিত্তি অবশ্যই উপড়ষড়মরপধষ বা প্রতিবেশ-ভিত্তিক। সুতরাং আমাদের নীচের ডায়াগ্রামটিকে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখতে হবে। পুঁজিবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলোর

ভেতরে প্রতিবেশ-বিরোধিতা শুরু থেকেই বিরাজমান, কেননা প্রকৃতিকে পুঁজিবাদ শ্রমের মতই ব্যবহার ও শোষণ করে বর্ধিত হয়েছে। এখন শেষ পর্যায়ে Global Warming এবং Climate Change নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেজন্য পুঁজিবাদকে ছড়িয়ে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের পথে এগোতে হবে।

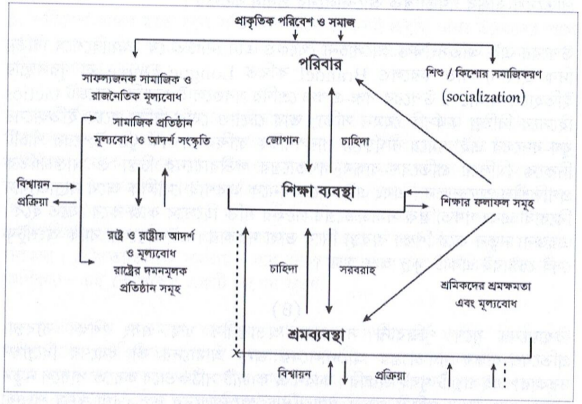

লক্ষণীয় যে ওপরের এই ডায়াগ্রামে প্রতিটি উপগাঠনিক প্রক্রিয়াই জটিল কার্যকরণ সম্পন্ন ও সম্পৃক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী। পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজির গঠন প্রক্রিয়া বৈশ্বিকও বটে। যেহেতু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এইসব জাতীয় পুঁজিবাদী/ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে। এই প্রভাব বলয়ের ভেতরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থান বেশ জটিল। কিছুটা সরলীকৃতভাবে বলা চলে যে, বর্তমানে দুর্বল জাতীয় রাষ্ট্রগুলো– যার ভেতরে বাংলাদেশ একটি; বিশ্বায়নের দ্বারা যে পশ্চিম ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলান্ড ইত্যাদির নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতি, অগভীর বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং পরনির্ভরশীল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের পরামর্শ মূল চাপসৃষ্টিকারী শক্তি। এরই সাথে জড়িত দুর্বল দেশের আন্তর্জাতিকভাবে দুর্বল এলিট গোষ্ঠীর জন্য পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন পরনির্ভরশীল এলিট শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অবদমিত (subordinate) সংখ্যাগরিষ্ঠ উৎপাদনশীল শ্রমিক-কৃষক ও আপামর জনগণের জন্য উচ্ছিষ্ট (residuel) যেন-তেন-প্রকারণে নাম-কা-ওয়াস্তে মামুলি শিক্ষার ব্যবস্থা।৪ এখানে নিষ্পেশিত শ্রেণির মেয়েরা আরও পিছিয়ে পড়ে আরও বেশি নিপীড়ণের শিকার হচ্ছেন। এখানে বিশ্বায়নের আরেক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাংলাদেশের মতো দেশের অবস্থা

দিন দিন আরও সঙ্গীন করে তুলছে। এটি হলে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের তেজারতি করে রাতারাতি ধনী হওয়া প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিশেষ করে সৌদী আরবের মতো দেশগুলো সরাসরিভাবে এবং পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মাধ্যমে পেট্রোডলার মাদ্রাসা শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা, ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলকে সরাসরিভাবে মদত জোগানো ইত্যাদি নানাভাবে পেট্রোডলার বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঙ্কটময় করে তুলেছে ও তুলছে।৫

পুঁজিবাদী সমাজের মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। এই সূত্র থেকে এমন অবরোহী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে শিক্ষার উৎপাদন ব্যবস্থাতেও এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান। বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শিক্ষার যন্ত্রীকরণ– বিশেষত: তথ্য প্রযুক্তির বিপুল প্রয়োগ এবং দীর্ঘ-দূরত্বের শিক্ষা সেক্টরে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হারও বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশের মতো দেশে এই সমস্যা আরও ঘণীভূত হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণি দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সংগ্রাম আরও প্রকট হয়ে উঠবে।
কিন্তু শিক্ষার দ্বন্দ্ব শুধু উৎপাদন সম্পর্ক নিয়েই নয়। যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আলথুসার (Althusser) বর্ণিত মতাদর্শগত রাষ্ট্রিক যন্ত্রসমূহের (Ideological State Apparatuses) অন্তর্গত, মতাদর্শমূলক দ্বন্দ্বসমূহ বর্তমান বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ানক রূপ ধারণ করতে পারে। গ্রাম্‌সি (Gramsci)-র hegemony বা দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষের ব্যাপার। ফুকোর শাসনপ্রণালী বা Governmentality-র তত্ত্বও এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

মূলত শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র না হলে বুর্জোয়া শাসক ও শোষকেরা অবদমিত শ্রেণিগুলোকে কিছু সুযোগ সুবিধা এবং নিষ্পেষণের সীমিত প্রয়োগ এই দুই পদ্ধতির মিশ্রণে নিজেদের তাবে রাখতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আদর্শগত প্রভুত্বের সৃষ্টিকর্মও অনেকাংশে সফল হয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতা এবং বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থা (Mode of Production) এর বিভিন্ন মাইক্রো ও ম্যাক্রো দ্বন্দ্ব থেকে যে সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয় যেটা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। নয়তো বা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের– শিক্ষাখাত এবং শিক্ষাখাতের বাইরেও তীব্রতা বাড়তে বাধ্য। এর ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের দমনমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বাড়বে, অন্যদিকে বিদ্রোহী– এমনকি বিপ্লবী-ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাড়বে। বস্তুত সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র– সব ক্ষেত্রেই এক বিষম সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করবে। বিশ্বায়নের আর একটি দিক হচ্ছে নানানভাবে, বিভিন্ন বেগে এই দ্বন্দ্বগুলোকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই দ্বন্দ্বগুলোর প্রকাশ ও বিকাশ এক রূপে হবে না, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হতে বাধ্য। বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশের সঙ্কটগুলো ইতোমধ্যেই অনেক ঘণীভূত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংকটের আলোচনায় প্রবেশ করাটা খুবই জরুরি। তবে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। আশা করি এ প্রবন্ধের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের গবেষকরা অগ্রসর হওয়ার কিছু রসদ পাবেন। এখানে আমি বিশেষ

করে গণতন্ত্রমুখী শিক্ষার দিকটি নিয়ে আলোচনা করছি এবং পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিগত ও অন্যান্য অসঙ্গতিগুলোর কয়েকটা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণি সংগ্রাম এবং আদর্শগত সংগ্রাম এই তিনটি দিকেই আমি সবিশেষ জোর দিয়েছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তিনটি দিকই গণতন্ত্রের গভীরায়নের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং শিক্ষার সে বিশ্লেষণ মে, ১৯৬৮-র পরবর্তী প্রজন্ম পশ্চিম ইউরোপ এবং উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিপ্লবী প্রজন্মের চিন্তকরা করেছেন সেগুলোও খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, ক্ষমতা-জ্ঞান (power knowledge) সম্পর্কিত ফুকোর রচনাবলী, দেলুজের (Deleuze) নতুন সূক্ষ্ম বস্তুবাদী দর্শন এবং সৃজনশীলতার আহ্বান এবং দেরিদার অনির্মাণ বা deconstruction-এর ডাক এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আমি অন্যত্র এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিধায় এখানে সেসব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। কৌতুহলী পাকি খান (১৯৯৮, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭) এবং Callinicos (1999, 2004), Eagleton ইত্যাদিতে চিন্তার খোরাক খুঁজে পাবেন।

আমাদের পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার এই প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন বেরিয়ে আসে:

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বগুলোর ভেতরের অবদমিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রামের প্রগতিশীল অংশের কাজে লাগানো যায়?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে, এই প্রগতিশীলতার সীমাবদ্ধতা কতটুকু এবং কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর ভেতরে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা যায়?৬

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ কেমন হওয়া দরকার? এ প্রশ্নের উত্তরও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই দিতে হবে। তাই উনবিংশ শতকের প্যারী কমিউন থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে সেগুলোর এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাসির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক ও দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সবিশেষ প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এইসব প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমরা তাই সংক্ষেপে সম্ভাব্য উত্তরের রূপরেখা মাত্র নির্দেশ করব। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যাবে।

প্রথম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো যে অন্তত পক্ষে একটি দ্বিমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব। প্রথমত টেকনিক্যাল গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার যতদূর সম্ভব শিক্ষা দেওয়া। এর সাথে সাথে অবশ্যই বহুস্তর বিশিষ্ট ও সেই অনুযায়ী ক্ষমতাবিভাগ ও শ্রমবিভাগ সমন্বিত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সহজেই অনুমেয় যে উদারনৈতিক বুর্জোয়া

সমাজেও এই ধরনের কার্যকলাপ বেশি প্রসার লাভ করতে পারে না। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা– আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ– সেই সাক্ষ্যই দেয়।

সেজন্যই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের ভেতরেই একটি বিকল্প শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে। প্রায় সব উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে শুরু করে, পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায় পর্যন্ত এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। খোদ মার্কিন মুল্লুকেই প্রাথমিক পর্যায়ে মন্টেসরি ও অন্যান্য বিকল্প প্রগতিশীল শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ে John Dewey এবং তাঁর স্ত্রীর প্রবর্তিত ল্যাবরেটরি স্কুল ইত্যাদির কথা অনেকেই জানেন। ১৯৩০-এর দশকে প্রথমে জার্মানীতে Frankfurt Institute যেটা ১৯২০-এর দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার পরে হিটলারি নির্যাতনের সময়ে নিউইয়র্কে নির্বাসিত জার্মান বামপন্থী পণ্ডিতদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল New School for Social Research। এখন পর্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন বিকল্প চিন্তার ধারা নানা প্রতিকূলতার ভেতরেও সমুন্নত।

প্রতিকূলতার প্রথমেই দ্বিতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরই দেওয়া সম্ভব। New School-এর উদাহরণেই বোঝা যায় যে বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজিবাদী সমাজের বিরাট সমুদ্রের ভেতরে ছোট কতগুলো দ্বীপের মতনই। আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছাড়াও নানারকম প্রাতিষ্ঠানিক বাধাও আগে প্রায় সবসময়ই। তাই শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র না হলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। কেবলমাত্র তীব্র শ্রেণি সংগ্রামের ভেতর দিয়েই এই সীমাবদ্ধতার সীমা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো যে প্যারী কমিউন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার যুগে স্বাক্ষরতা অভিযান থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত শিক্ষা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সফলতা অর্জনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশের দশকে রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করেছিলেন যদিও বলশেভিকদের রাজনীতির সমর্থক তিনি একেবারেই ছিলেন না। কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকেই আদর্শগত ও সাংগঠনিক ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার দুর্বলতা অনেক প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রেণিহীন সমাজের দিকে যাবার বদলে নতুন একটি শ্রেণি তৈরি করার কারখানাও হয়ে যেতে পারে গতানুগতিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কার্যত বর্তমানে রুশ ও চীনে তা হয়েছেও। সুতরাং শ্রেণি সংগ্রামের আলোকে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আলোকিত ও অন্ধকার দুটো দিকেরই সার্বিক আলোচনা করা দরকার। আশা করি অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভবিষ্যতে এগিয়ে আসবেন।

মার্টিন কার্নোয়ের (Martin Carnoy, 1974) 'শিক্ষারূপী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ (Education as Cultural imperialism) গ্রন্থে ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল হচ্ছে এই যে মেট্রোপলিটান পুঁজির প্রসারের সাথে সাথেই

উপনিবেশে প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল সিস্টেমের স্থাপন ও প্রসার ঘটেছিল। আলবার্ট মেমি এবং ফ্রান্তজ্ ফানোঁ এ বিষয়ে আফ্রিকায় ফরাসীদের ভূমিকার অনুপুঙ্খ, বস্তুনিষ্ঠ এবং হৃদয়বিদারী বিশ্লেষণ করে গেছেন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরনির্ভরশীল উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি-প্রকৌশলের প্রসারের ফলে নব-উপনিবেশবাদ এবং আদর্শগত দিক দিয়ে এক নয়া ওরিয়েন্টালিজম বেশ বাজার পেয়েছে। বিশেষত পরনির্ভরশীল পরগাছা পুঁজিপতি এবং তাদের ধামাধরা তথাকথিত সুশীল সমাজের প্রতিভূরা উন্নয়নের নামে অনুন্নত ও অধোন্নত দেশগুলোকে এক পচনশীল সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।৭ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীপক লালের মতো অর্থনীতিবিদরা স্বদেশে ও বিদেশে পাশ্চাত্যের তথাকথিত মুক্ত বাজার ও বাণিজ্যের জয়গানে মুখর। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি অথবা অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভাষায় রচিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমান বিশ্বায়নে সাম্রাজ্যবাদকে মদদ জোগাচ্ছে। ইরানের এক প্রাক্-অখ্যাত, পণ্ডিত-মহলে অজানা এক মহিলার লেখা 'Reading Lolita in Tehran' এই নয়া উপনিবেশবাদের একটি লজ্জাকর উদাহরণ।

উত্তর-ঔপনিবেশিক পঠন (Post-colonial Studies) এবং উত্তর-মার্কসবাদ (Post-Marxism) র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনার উভয় স্কুল থেকেই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা– বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। প্রথমত ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপনিবেশগুলোর ইতিহাসে কোন্ ভূমিকা পালন করেছে? দ্বিতীয়ত বর্তমানের আপাত স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অথবা অধোন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতিমালা অবশ্য প্রয়োজনীয়?

আশার কথা যে বর্তমানে উত্তর-ঔপনিবেশিক পঠন– বিশেষ করে নারীবাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক পঠন– এ দুটি প্রশ্নের এবং এ দুটি প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আর অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা চলে, সেহেতু নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুই হবে পৃথিবীর বর্তমান সার্বিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পূণমূল্যায়নের ভেতর দিয়ে। এজন্য সর্বস্তরের সিলেবাস, কারিকুলাম, শিক্ষকদের ট্রেনিং এ ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরির শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু দেশি ভাষায় শিক্ষা নয়, দেশি ও বিদেশি জ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দরকার পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শোষিত, সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়া, সবচেয়ে অবহেলিত লোকগুলোর সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদের সাথে সত্যিকার কথোপকথনের মারফতে অবহিত হওয়া এবং তাদেরই সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সত্যিকার গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপগুলো নেয়া। যেহেতু বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই এই শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত,

যেহেতু বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো আরো জরুরি।

উপসংহার

আমার এ আলোচনা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ভূমিকা হিসেবে দুটো জিনিসকে আমি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এক. পদ্ধতিগত ভাব বস্তুবাদী ইতিহাসভিত্তিক সামগ্রিক গঠনগত এবং মতাদর্শগত দিকের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বা inner contradiction গুলোকে দেখা প্রতিবেশ-বাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গভীরায়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দুই. সঠিক আন্দোলন গড়তে হলে যে পাঁচটি দিকের কথা আমি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি তার কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলবে না। একই সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী এর একটা বা কয়েকটা দিক সাময়িকভাবে প্রধান হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রয়োজন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দীর্ঘ-নজরী-মূল্যায়ন ও আন্দোলন। এর জন্য বিশ্লেষণ এবং সংগঠন দুটোই জরুরি। আমার আশা যে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা এই আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুদিককেই সমৃদ্ধ করে তুলবেন। প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়নই এই সার্বিক সংকটের যুগে আমাদের সত্যিকার ভরসা।

প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়ন

তথ্যনির্দেশ:

১. এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত আমার ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত Technology, Democracy and Development (Khan, 1998) বইয়ের দ্বিতীয় অংশে– বিশেষত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে। আমার সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (Khan, 1998b) Deepening Evolutionary Ecological Democracy (DEED) অর্থাৎ 'বিবর্তনশীল প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়ন' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এতে বাংলাদেশের সমস্যাবলীর উপরেও কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। DEED-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে DTS বা Diversity Tolerant Society (বিবিধ ভিন্নতা-সহনশীল সমাজ) নিয়েও তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক আলোচনায়ও এতে কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকারা খুঁজে পাবেন।

২. দেখুন Khan (1998; 2004 a,b; 2005 a,b; 2012; 2014 a,b; 2017; 2018 a,b,c).

৩. এই জটিল গাঠনিকতার জন্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অবরোহী প্রয়াস অনেকটাই অনভিপ্রেত এবং অনুচিতও বটে। লেনিনের দার্শনিক নোটবুক পড়লে বোঝা যায় কেন তাঁর মতে "Concrete analysis of concrete conditions"** এত জরুরি। Khan (2002; 2003 a,b; 2008 a,b,c; 2012; 2013; 2018 a,b,c).

৪. এইসব জটিল গাঠনিক প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে "Concrete analysis of concrete conditions" কে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে Khan (2018b) তে আমি সেই উদ্যোগই নিয়েছি।

৫. এই বিষয়ে অন্যান্যদের মধ্যে আবুল বারকাতের "বাংলাদেশে মৌলবাদ" গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থপঞ্জীতে অন্যান্য যেসব বাংলা বই এবং প্রবন্ধের উল্লেখ করা আছে সেগুলোও দ্রষ্টব্য। Riaz (2016)-I তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক।

৬. দ্রষ্টব্য Callinicos এবং Eagleton।

৭. এ প্রসঙ্গে শ্রেণি-বিন্যাসের নতুন রূপগুলো বোঝা দরকার। দেখুন, Dimock and Gilmore (19974), Roediger (2017), Khan (2016) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ও পরবর্তী সময়ের বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ করে বাংলা গ্রন্থপঞ্জির বই ও প্রবন্ধগুলো দ্রষ্টব্য।

** Concrete analysis of concrete conditions – এই বিখ্যাত উক্তির বাংলা অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি। আমি এর অনুবাদ করেছি 'মূর্ত শর্তাবলীর মূর্ত বিশ্লেষণ'। আমার মনে হয় নির্দিষ্ট মূর্ত শর্তাবলীর সুনির্দিষ্ট মূর্ত বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিবেশ-বান্ধব গণতন্ত্রের গভীরায়ন কীভাবে করতে হবে, সেটা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নেতা ও কর্মীদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

বাংলা গ্রন্থপঞ্জী

আবুল বারাকাত (২০১৮), বাংলাদেশে মৌলবাদ: জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ প্রকাশনা।

আনিসুজ্জামান (২০১৭), আমাদের সংবিধানের মূলনীতি। ঢাকা: বাঙলার পাঠশালা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম.এম. আকাশ (২০১৪), 'বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর - বিকাশের গতিপ্রবণতা: কতিপয় অমিমাংসিত প্রশ্ন। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সংখ্যা ৮, জানুয়ারী: ৭-৩২।

---------- (২০০৪), বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। ঢাকা: প্যাপিরাস।

নূহ-উল-আলম লেনিন (২০১৫), বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আবু মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (১৯৭৪), সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৭৫), আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

নজরুল ইসলাম (২০১৪), 'পুঁজিবাদের পর কী? সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সংখ্যা ৮, জানুয়ারী: ৯১-২২৪।

---------- (২০১২), আগামী দিনের বাংলাদেশ। ঢাকা: প্রথমা।

হাসান ফেরদৌস (২০০৯), ১৯৭১: বন্ধুর মুখ, শত্রুর ছায়া। ঢাকা: প্রথমা।

হায়দার আকবর খান রনো (২০১১), পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

---------- (২০০৫), শতাব্দী পেরিয়ে। ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী।

হায়দার আলী খান (২০১৬), মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি: প্রবাসে আলোর গান। ঢাকা: প্রথমা।

---------- (২০১৬), 'একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার'। প্রতিচিন্তা, জুলাই-সেপ্টেম্বর: ১১-৩৮।

---------- (২০১৪), 'গণমুখী, জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে'। প্রতিচিন্তা ৪(২), ঢাকা: এপ্রিল-জুন: ৬৬-৯২।

---------- (২০১৪), 'বিশ্বায়নের বিশ্বরূপ এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ'। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সংখ্যা ৮, জানুয়ারী: ৩৩-৪৬।

বিনায়ক সেন (২০১৪), 'ক্ষমতার অন্য পাঠ: মার্ক্স প্রসঙ্গে ফুকো'। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সংখ্যা ৮, জানুয়ারী: ৯১-২২৪।

*জন এভান্স বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক
ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়
ডেনভার, কলোরোডা, যুক্তরাষ্ট্র (USA)
Email: hkhan@du-edu

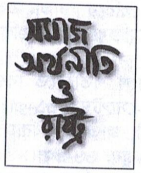

'আমি মার্কসবাদী নই'– কার্ল মার্কস

অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাথ*

১৮৮৩ সালে মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে কার্ল মার্কস ফরাসী মার্কসবাদী আদর্শের ধারক জুল গেড ও পল লাফার্জকে তাদের 'বৈপ্লবিক বাগাড়ম্বর' হেতু অভিযুক্ত করেন। এঙ্গেলস উল্লেখ করেন যে তাদের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস বলেন, "এটা নিশ্চিত যে, আমি নিজে মার্কসবাদী নই" ('What is certain is that, I myself am not a Marxist')1।

উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা ফরাসী মার্কসবাদীদের কর্মকাণ্ডের জন্য হলেও এটি পরিষ্কার যে 'ডগমা'কে অস্বীকার মার্কস এই উক্তিতে সুস্পষ্টভাবে করেছেন। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস কনরাড স্কিমিডকে ১৮৯০ সালে এক চিঠিতে লেখেন যে তাঁদের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গবেষণার পথ নির্দেশক, কিন্তু হেগেলীয় কায়দায় নির্মাণের কোন লিভার নয়।২

তিনি জোসেফ ব্লককে ১৮৯০ সালে একটি চিঠিতে লেখেন যে 'তরুণ লেখকেরা যে অর্থনৈতিক দিকে যা প্রাপ্য তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয় তার জন্য মার্কস ও আমি আংশিকভাবে দায়ী। যারা এই মূলনীতিকে অস্বীকার করেছে সেই বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিরোধে এই মূলনীতিকে জোর দিতে হয়েছে এবং পারস্পরিক সংযোগের অন্যান্য উপাদানকে যথা স্থান দিতে আমরা সময়, সুযোগ ও স্থান পাইনি'।৩

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস যাই বলুন না কেন মার্কসবাদ প্রায় একটি ডগমা হিসাবেই উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

1 Engels, Letter to Conrad Schmidt (1890); Marks and Engels Selected correspondence
2 Ibid
3 Engels, Letter to Joseph Bloch (1890), Marks and Engels Selected correspondence

যাঁরা মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের ভাগ্যে সংশোধনবাদী, বিশ্বাসঘাতক, দলত্যাগী (Renegade) খেতাব জোটে, যেমন বার্নস্টেইন, কাউৎস্কির বেলায়। তুলনামূলকভাবে ভাগ্য ভালো ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের। রুশ বিপ্লবের সাফল্যের কারণে লেনিন মার্কসের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন তা মার্কসবাদে সৃজনশীল বিকাশ নামে যোগ হয়। এ মতবাদের ভিত্তিতে মহান রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে গণচীনসহ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে বসবাস করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চমৎকার অর্থনৈতিক সাফল্য, বিশেষত ত্রিশের দশকে যখন পুঁজিবাদী বিশ্ব মহামন্দায় খাবি খাচ্ছে, সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চ মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষের হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবময় ভূমিকা অবলোকন করে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক যাঁতাকলে পিষ্ট, শোষিত তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশের জনগণ যখন বিশ্বযুদ্ধ শেষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে, তাদের অনেকের চোখ তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, উপনিবেশবাদবিরোধী সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক প্রকৌশলের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যখন বিংশ শতাব্দীর শেষ কোয়ার্টারে এসে চরম অবমাননার মধ্যে পতন ঘটে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বিপুল সংখ্যক লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। না, এ ক্ষেত্রে 'ব্যাখ্যায় করিতে পারি ওলটপালট' নয়, এ পতনের বাস্তবানুগ ব্যাখ্যার অনুসন্ধান এখনও চলছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত বাংলাদেশের প্রবীণ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আজিজুর রহমান খান তাঁর দীর্ঘকাল সঞ্চিত সুপরিপক্ক জ্ঞান, মনন, মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে 'আমার সমাজতন্ত্র: সমাজতন্ত্রের উত্থান, পতন ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। তাঁর লিখিত প্রথম বাংলা ভাষায় বই এটি। ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসে 'প্রথমা প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যমান সমাজতন্ত্র নাম দিয়েছেন তিনি যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বহাল ছিল। এর পতনের কারণ নিয়ে যে বিতর্ক বিভিন্ন মহলে হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নগুলি আলোচনা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন, তার মধ্যে তিনটি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন–

১. বিদ্যমান সমাজতন্ত্র কি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বিধিসম্মত ছিল? যদি তা হয়ে থাকে, তবে তার নিদর্শন কি? যদি বিদ্যমান সমাজতন্ত্র মার্কসবাদসম্মত না হয়ে থাকে, তবে এই দীর্ঘ সময় প্রকৃত মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা হয়নি কেন?
২. বিদ্যমান সমাজতন্ত্র অত্যন্ত স্বল্প সময়ে ভেঙে পড়ার কারণ কি?
৩. পুঁজিবাদের কোন বিকল্প নেই- এই দাবি কতটা সত্যি? বর্তমানে সমতা ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা কী? এই বিকল্প ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সম্পর্ক কি?

প্রফেসর খানের বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় "কার্ল মার্কসের অর্থনীতি তত্ত্ব ও সমাজতন্ত্র ভাবনা"। এ অধ্যায়ে তিনি 'প্রাক-মার্কস-সমাজতন্ত্রভাবনা' অংশে কয়েকজন

ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব ও পুঁজিবাদের অন্তঃস্থিত দ্বন্দ্বের ফলে চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদের পতনের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি অধ্যায়টি শুরু করেছেন মার্কসের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে এঙ্গেলসের বক্তৃতা দিয়ে। আমরা এখানে একটু আলোকপাত করতে চাই। এঙ্গেলস উক্ত বক্তৃতায় মার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন। মার্কস তাঁর "A Contribution to the Critique of Political Economy" (1959)-এর মুখবন্ধে তাঁর সুবিখ্যাত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। একটি সমাজের ভিত্তি তার উৎপাদন সম্পর্ক এবং এই ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য উপরিকাঠামো। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে অধিক গতিশীল উৎপাদন বলের বিকাশের সাথে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন বলের বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয় এবং প্রাগ্রসর উৎপাদন বলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। তাঁর বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্স অনুযায়ী যা নতুন অর্থাৎ যা প্রগতিশীল, উন্নত তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। মার্কসের ব্যাখ্যা একটি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পরবর্তী উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণ ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। অবশ্য এ বিজয়ের পেছনে মানুষের সুচিন্তিত কর্ম, সংগ্রাম নিহিত। ব্যক্তির ইচ্ছা, ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের ধারণা, নৈতিকতার প্রশ্ন এই সামাজিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে মুখ্য নয়। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী যেমন কোঁত, সিম, ফুরিয়ের, ওয়েন প্রমুখ ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী ব্যবস্থার অনেকগুলো পূর্বাভাষ সঠিকভাবে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের একেকজনের পরম সত্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এঙ্গেলসের ভাষায় প্রত্যেকের পরম সত্য, যুক্তি, ন্যায়বিচার তার ব্যক্তিগত ধারণা, তার অস্তিত্বের পরিবেশ, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

মার্কসের অর্থনীতির প্রধান সূত্র স্মিথ ও রিকার্ডোর প্রণীত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র। মার্কস নিজেই বলেছেন যে, আধুনিক সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব আবিষ্কারের তার কোনই অবদান নেই। তাঁর পূর্বেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ বর্ণনা করেছেন ও বুর্জোয় অর্থনীতিবিদরা শ্রেণিসমূহের অর্থনৈতিক এনাটমি বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি তা এই প্রমাণ করা যে ১. উৎপাদন বিকাশের নির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক পর্যায়ের সাথে শ্রেণিসমূহের অস্তিত্ব গ্রথিত, ২. শ্রেণিসংগ্রাম আবশ্যিকভাবে সর্বহারার একনায়কত্বে পৌঁছায়, ৩. এই একনায়কত্বই একমাত্র নিজে সমস্ত শ্রেণির বিলুপ্তি ও একটি শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণ ঘটায়।"৪

4 Marx, K. Letter to Weydemayer (1852), Selected Correspondences.

মার্কস কিন্তু পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক মিশন ও তার প্রগতিশীল ভূমিকাকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মতোই পুঁজিবাদী বিকাশের একটি পর্যায়ে অগ্রসরমান উৎপাদন বলের সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধমূলক দ্বন্দ্বে চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদের ধ্বংস ও তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্মিথ ও রিকার্ডোর অর্থনীতি মার্কসবাদের অন্যতম উপাদান, তাঁরাও পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা ও পরিণামে স্থবিরতার কথা বলেছেন। রিকার্ডোর মতে মুনাফার হারের পতন যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় তা যে পুঁজি সঞ্চয়ণের ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করতে পারেনা, তখন পুঁজিবাদ একটি স্থবির অবস্থায় উপনীত হয়। রিকার্ডোর মুনাফার হারের পতন তাঁর কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি তথা খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও পরিণামে অধিক মজুরি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। রিকার্ডোর বিশ্লেষণে উপাদান বিকল্পনও অনুপস্থিত। মার্কসের বিশ্লেষণ অধিক বাস্তবানুগ। মার্কসের পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের সঙ্কটের অন্যতম কারণ মুনাফা হারের পতনের প্রবণতা। তাঁর মুনাফা হারের পতনের প্রবণতা তাঁর শ্রমের মূল্যতত্ত্ব থেকে এসেছে। মার্কসের বিশ্লেষণে পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে পুঁজির আঙ্গিক গঠন বা স্থির পুঁজি ও জীবন্ত শ্রম বা পরিবর্তনশীল পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি। অর্থাৎ উপাদান বিকল্পন এখানে দৃশ্যমান। পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ও মুনাফা বৃদ্ধির আশায় ক্রমাগত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটায় এবং ফলশ্রুতিতে জীবন্ত শ্রমের বদলে স্থির পুঁজি অধিকমাত্রায় ব্যবহার করে। কিন্তু জীবন্ত শ্রমই উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে, ফলে যতই কম হারে জীবন্ত শ্রম ব্যবহৃত হয় তা মুনাফা হারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসের দ্বান্দিকতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রধান দ্বন্দ্ব উৎপাদনের সামাজিকীকরণ কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় তা দখলের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বের সমাধান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নেই। পুঁজিবাদীরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা ধ্বংসের মানবিক (সাবজেকটিভ) শর্তও সৃষ্টি করে। তা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি। শিল্পবিকাশ শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা দূর করে তাদের সংগঠিত করে। 'সর্বোপরি বুর্জোয়ারা যা তৈরি করে তা নিজেদের গোরখোদক। বুর্জোয়ার পতন এবং সর্বহারার বিজয় অবশ্যম্ভাবী'।৫

কিন্তু মার্কস তার 'A Contribution to the Critique of Political Economy'-এর মুখবন্ধে যে অনুচ্ছেদে তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন, তার একটি অংশের গুরুত্ব কেন জানি সেভাবে নজরে আসেনা। তিনি বলছেন "যে পর্যন্ত একটি সমাজ ব্যবস্থায় সেখানে ধারণক্ষম সমস্ত উৎপাদন বলের বিকাশ না হচ্ছে সে পর্যন্ত সে উৎপাদন ব্যবস্থা কখনও ধ্বংস হয় না। (No social order ever perishes before all the productive forces for which there is room in it have developed).6

5. Marx, K. Enlish, Communist Malifesto.
6. Marx, K., Preface, "A Contribution to the Critique of Political Economy" (1859)

তাহলে অতি সঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কি তাহলে পুঁজিবাদ উন্নত দেশে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যে সেসব সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের আর কোন অবস্থা ছিলনা? মার্কস এঙ্গেলস কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো শুরু করেছিলেন এভাবে "একটি ভূত ইউরোপকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কমিউনিজমের ভূত।" অদ্যাবধি পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের অনেক মার্কসীয় বিশ্লেষণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন পুঁজিবাদী সঙ্কটের আবির্ভাব, বেকারত্ব ইত্যাদি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুঁজিবাদী বিকাশ উন্নত ইউরোপীয় দেশে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, এ বিশ্লেষণ সঠিক প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ১৮৯৫ সালে খোলাখুলিভাবে তাঁদের ভুল স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "ইতিহাস আমাদের ভুল প্রমাণিত করেছে... ইতিহাস স্পষ্ট করেছে যে সে সময়ে কনটিনেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা কোন ক্রমেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা বিলুপ্তির জন্য পরিপক্ক ছিল না"।৭

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে সঙ্গতভাবে। মার্কস অনুযায়ী যে পর্যন্ত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন বলের বিকাশের স্থান রয়েছে সে পর্যন্ত সে সমাজ ধ্বংস হয় না। এঙ্গেলসের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা গেলো ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দীতে কোন প্রকারেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য পরিপক্ক ছিলনা। সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়েও কি, এমনকি একবিংশ শতাব্দীর এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য কি পরিপক্ক? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কি বিকাশের আর কোন স্থান অবশিষ্ট নেই?

ইতিহাস তো তা বলে না। মার্কসীয় বিশ্লেষণও তা বলে না। মার্কসের বিশ্লেষণে উৎপাদন বল উৎপাদন সম্পর্কের চাইতে বেশি গতিশীল। প্রযুক্তিগত তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উৎপাদন বল ক্রমাগত বিকশিত হয়। শিল্প বিপ্লবের প্রথম দিকে বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনই প্রধান। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার কয়লা শিল্পের উন্নতি ঘটায় ও কোক কয়লার ব্যবহার ব্লাস্ট ফারনেস লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিরাট পরিবর্তন আনে। পরবর্তীতে রেলওয়ে নির্মাণ ও মেশিন উৎপাদন পুঁজিবাদী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উনিশ শতকের শেষ ২৫ বছরে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে, মার্কস বর্ণিত পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় তার ফলে পুঁজিবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। শিল্পসমূহে কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে উপনিবেশগুলোর কাঁচামাল অসম ও অল্প মূল্যে প্রাপ্তি ও এসব দেশগুলোকে নিজস্ব বাজার হিসেবে ব্যবহার পুঁজিবাদী বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করে। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে আণবিক শক্তি ও ইলেকট্রোনিক্স আবিষ্কার ও পুঁজিবাদের উৎপাদন বলের বিকাশকে সহায়তা করেছে। মহাকাশ, আইটি ক্ষেত্রে আবিষ্কারও পুঁজিবাদী বিকাশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

7. Engels, F. Class Struggles in France.

এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা যায় যে প্রযুক্তিগত উন্নতি যদি ক্রমাগত উৎপাদন বলের বিকাশে সহায়তা করতে থাকে এবং মার্কসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী যে পর্যন্ত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন বলের বিকাশের স্থান রয়েছে সে পর্যন্ত সে উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস হয় না, সেক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন মার্কসীয় বিশ্লেষণে এমনকি এখনও কতটা যৌক্তিক?

মার্কসীয় বিশ্লেষণে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ধ্বংসের সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর শ্রমিক শ্রেণি। তাদের নেতৃত্বেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হবে। তার সম্ভাবনা কি? শ্রম ও শ্রমিকের চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন মার্কসের সময়কাল থেকে বর্তমান হয়েছে। এমনকি ১৮৮২ সালে এঙ্গেলস এক রচনায় বলেন "শ্রমিকের ইংল্যান্ডের বিশ্ব বাজার ও উপনিবেশের মনোপালির ভোজে সানন্দে অংশগ্রহণ করে।৮ প্রফেসর খান তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'পুঁজিবাদ কি মানবসমাজের ভবিতব্য?' এর এক জায়গায় অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছেন যে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রমবাজার এত সমন্বিত ও শ্রমজীবীদের তথ্য হরণ এত সহজ যে কর্মরত মানুষ চুক্তির বাড়তি আনুগত্য প্রমাণে সদা সচেষ্ট। কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি, নিরাপত্তায় ক্রমাবনতির জন্য এই আনুগত্য আরও দৃঢ় হয়েছে। সুতরাং বিপ্লবের সাবজেকটিভ উপাদানের অস্তিত্বই তো বর্তমানে প্রশ্নের সম্মুখীন।

প্রফেসর খান তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে 'সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে মার্কসের ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা যায়। মার্কসের সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে এঙ্গেলস অভিহিত করেছেন কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রের বিপরীতে। পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ সর্বক্ষেত্রে সঠিক না হলেও বলা যায় অদ্যাবধি তাঁর বিশ্লেষণই সর্বাধিক বাস্তবানুগ ও বৈজ্ঞানিক। বিপরীতে সমাজতন্ত্র বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ মনে হয় বেশ পরিমাণ ইউটোপীয় দোষে দুষ্ট। সে কথা প্রফেসর খানও এ অংশে আলোচনা করেছেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের ভাবনা প্রধানত গোথা গ্রোগ্রামের সমালোচনায় বিধৃত। সাম্যবাদের নীচু স্তর সমাজতন্ত্রের প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী বণ্টন বাস্তবানুগ হলেও বিভিন্ন শ্রমের পরিমাপে যে গুরুতর সমস্যা তা তিনি তেমনভাবে বিবেচনায় আনেননি। পূর্ণ সাম্যবাদে প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন যে প্রাচুর্যের উপস্থিতির কথা বলে তা আর অর্থনীতির বিষয়বস্তুই থাকে না। এমন উৎপাদনের উৎকর্ষতা কল্পনা দুঃসাধ্য। আর একটি বিষয়ে প্রফেসর খান গুরুত্বারোপ করেছেন যে বণ্টন ব্যবস্থায় মার্কস-উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য কোন স্বতন্ত্র বরাদ্দের উল্লেখ করেননি।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমাজের অন্তবর্তী সময়কে মার্কস উত্তরণকাল নামে অভিহিত করেছেন। এ সময়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থা 'সর্বহারার একনায়কত্ব' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে তিনি বলেন। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের যে চেহারা পৃথিবী দেখেছে তাতে যাদের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আছে এমন কোন দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব' ধারণা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তবায়ন যোগ্য।

8 Engels, F. Letter to Kautsky, 1882 Selected Correspondence.

শ্রমবিভাগ, দ্রব্য বিনিময়, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক ও বাজার বিনিময় সভ্যতার ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। মার্কসের সমাজতন্ত্রে পণ্য উৎপাদন, বিনিময়, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক ও বাজার অনুপস্থিত। প্রায় অবাস্তবায়নযোগ্য এই নীতি। বাজার ও পণ্য-অর্থ সম্পর্ক অবহেলাই সম্ভবত বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয়ত ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রফেসর খান 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্র' ও 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন' শীর্ষক আলোচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ব্যবস্থাকে অধ্যাপক খান যে 'বাস্তবে বিদ্যমান মার্কসীয় সমাজতন্ত্র' সংক্ষেপে 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্র' নামে আখ্যায়িত করেছেন, তা যুক্তিযুক্ত। 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্র' অধ্যায়ে তিনি রুশ বিপ্লবে লেনিনের অবদান ও কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। পরের অধ্যায়ে তিনি 'বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন' আলোচনা করেছেন। রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন বহাল থাকা পর্যন্ত যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও প্রতিক্রিয়া বহাল ছিল, তা কিন্তু লেনিনের রচনায় পূর্বেই পাই। লেনিন ১৯০৫ সালে আসন্ন বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে এর বুর্জোয়া চরিত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে বুর্জোয়া গণতন্ত্র পর্যায়ের ভিতর যাওয়ার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। তিনি বলেন:

যিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে অন্য পথে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে চান, নিশ্চিতভাবে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও প্রতিক্রিয়ায় উপনীত হতে বাধ্য।... আমাদের মার্কসবাদীদের জানা উচিত যে সর্বহারা ও কৃষকশ্রেণির জন্য বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও বুর্জোয়া প্রগতির পথ ব্যতিরেকে সত্যিকার মুক্তির কোন পথ নেই। থাকতেও পারে না।৯

কিন্তু যেহেতু রুশ বুর্জোয়াশ্রেণি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্ষম, সুতরাং সর্বহারা শ্রেণিকে এই ঐতিহাসিক কার্যটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে লেনিন এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ঘটানোর দুটি শর্ত উল্লেখ করেন। ১৯১৭ সনে নভেম্বর বিপ্লবের পর পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত এবং কদিন পর সোভনারকমের সভাপতি হিসাবে শর্ত দুটি উল্লেখ করেন। শর্ত দুটি হচ্ছে– কৃষকদের আধা সর্বহারা অংশের সমর্থন ও ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থন। এ দুটি শর্ত প্রতিপালিত না হলে রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। বাস্তবে ঠিক তাই ঘটেছে। যুদ্ধ সাম্যবাদ সময়কালে গ্রামাঞ্চলে আধ সর্বহারা দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে যে গ্রামের 'দরিদ্রদের কমিটি' গঠন করা হয়, মধ্য ও ধনী কৃষকদের চাপে বিপ্লবী সরকার যে কমিটি ভেঙে দিতে বাধ্য হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা স্তিমিত হতে হতে অলীক হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে ১৯৮৭ সালের মার্চে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে নভেম্বরে সর্বহারা বিপ্লবে উত্তরণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে গেছে এবং ফলে আবশ্যিকভাবে বিপ্লব পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও প্রতিক্রিয়ায় উপনীত হয়।

9 Lenin, V. I., Quoted in Carr. E. H: The Bolshevik Revolution.

'সর্বহারার একনায়কত্ব' কিভাবে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় উপনীত হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯১৮ সালে সাংবিধানিক পরিষদ ডুমার বিলুপ্তি। কারণ বলশেভিকরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙে দেয়া প্রসঙ্গে জার্মান কম্যুনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গ ১৯১৮ সালে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তা ছিল বস্তুত সমগ্র সোভিয়েত আমলে অনুসৃত রাজনীতির জন্য প্রফেটিক। রোজা লুক্সেমবার্গ বলেন যে:

"এ নিশ্চিত যে প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সীমা ও দুর্বলতা আছে যাতে তা নিঃসন্দেহে অন্যান্য হিউম্যান প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদার। কিন্তু লেনিন ও ট্রটস্কি যে সমাধান পেয়েছেন যেমন গণতন্ত্রের অবলুপ্তি, তা যে রোগকে সারাতে চায় তার চাইতে নিকৃষ্ঠতর।... সাধারণ নির্বাচন, সংবাদপত্র ও সমাবেশের অবাধ স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীন লড়াই ব্যতীত প্রতিটি গণপ্রতিষ্ঠানে জীবন মারা যায়, কেবল জীবনের আভাষটাই থেকে যায় এবং এতে একমাত্র আমলাতন্ত্র কার্যকর উপাদান হিসাবে বর্তমান থাকে। গণজীবন ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ে। অপরিমিত জীবনীশক্তি ও সীমাহীন অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েক ডজন পার্টি নেতা পরিচালনা ও শাসন করে। তাদের মধ্যে বাস্তবে ডজন খানেক অসাধারণ প্রধান নেতা নেতৃত্ব দেয়। মাঝে মাঝে শ্রমিক শ্রেণির এলিট অংশকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তাদের কাজ হচ্ছে নেতাদের বক্তৃতায় হাততালি দেয়া এবং প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা। সে সময়ে তলে তলে একটি ক্লিক-একনায়কত্ব-নিশ্চিতভাবে সর্বহারার একনায়কত্ব নয় বরং কয়েকজন রাজনীতিবিদের একনায়কত্ব কাজ করে।"১০

তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের পেছনে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, প্রধানত অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও নৈপুণ্যহীনতাই দায়ী। পশ্চিম ইউরোপে বা যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নৈপুণ্য অর্জনের সময় সর্বজনীন ভোটাধিকার বা শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সেভাবে ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে যে দেশগুলো উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে বা অর্থনৈতিক নৈপুণ্য অর্জনে তাক লাগিয়েছে, সেখানেও একনায়কত্ব/স্বৈরশাসন/কর্তৃত্বমূলক শাসন ও শ্রমিকের অধিকারহীনতা বিদ্যমান ছিল। তা সে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৭৬ পূর্ব চীন ও পরবর্তী চীন, চার এশীয় বাঘ যাদের কথাই বলা হোক না কেন।

অধ্যাপক খান বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের পদ্ধতিগত মৌলিক কারণ হিসেবে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পদ্ধতির অন্তঃস্থিত অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করেছেন ও তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা চাহিদা ও সরবরাহের সমতা বিধান ও অর্থনৈতিক দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। এ বিশ্লেষণে অনেকটা বাস্তবানুগ। অর্থনৈতিক দক্ষতা/নৈপুণ্য অর্জনে বিকল্প ব্যবস্থা যেমন অস্কার ল্যাঙ্গের Trial and Error পদ্ধতির কথা তিনি আলোচনা করেছেন। স্ট্যালিন সে পথে হাঁটেননি। তার কয়েকটি কারণও অধ্যাপক খান উল্লেখ করেছেন।

10. Quoted in Shub, Lenin: A Biography.

বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে গেলে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও প্রতিক্রিয়ায় উপনীত হওয়ার কথা লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জন্য লেনিন আশু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি ঐতিহাসিক সময়কালের জন্য মিশ্র অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বহাল রাখতে চেয়েছিলেন যাতে অতীতের সাথে যথাসম্ভব কম সম্পর্ক ছিন্ন করে অর্থনীতি পরিচালনা করা যায়। যুদ্ধ, সাম্যবাদের সময় গৃহযুদ্ধ, বিদেশি হস্তক্ষেপ ও জটিল পরিস্থিতিতে যে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় সাম্যবাদের দিকে অগ্রযাত্রা রূপে বলশেভিক নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল গর্হিত ভুল। লেনিনের ভাষায় দিবাস্বপ্ন। কিন্তু নেপ (NEP) বা নয়া অর্থনৈতিক নীতির সময়ে আবার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় সর্বহারা বিপ্লবের সম্ভাবনা একবারে ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় লেনিন নেপ পুনর্মূল্যায়ন করেন এবং ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদক ও কৃষকদের ভূমিকা বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। নেপের স্থায়িত্বকাল নিয়ে লেনিন কখনও ঐতিহাসিক সময়কাল বা কখনও কম সময়কাল রূপে চিহ্নিত করেছেন।

লেনিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পায়ন বিতর্ক ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নিয়ে যে বিতর্ক হয় তার সাথে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন বেশ সম্পর্কিত। নেপ প্রবর্তনের কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি কৃষি ও রাষ্ট্রীয় শিল্প পণ্যের দামের মধ্যে আপেক্ষিক দাম শিল্পের প্রতিকূলে গেলে রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলো ট্রাস্ট গঠন করে আপেক্ষিক দাম প্রবলভাবে তাদের অনুকূলে আনে। এতে কৃষককূল দারুন অসন্তুষ্ট হয় এবং এতে নেপের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কায় সরকার শিল্প পণ্যের দাম কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা নেয়। এই দাম 'সিজার্স' ও শিল্পায়ন বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে। প্রফেসর খান প্রিওব্রাঝেন্সকি ও বুখারিনের এতদসংক্রান্ত অবস্থান আলোচনা করেছেন। প্রিওব্রাঝেন্সকি মার্কসের 'আদিম পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন' থেকে 'সমাজতান্ত্রিক আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন' তত্ত্ব হাজির করেন। ঔপনিবেশিক দেশগুলো কলোনী থেকে বিভিন্ন উপায়ে 'আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন' করেছিল। সেটি পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজির অংশ হিসেবে কাজ করে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন কোন কলোনী নেই বা সমাজতান্ত্রিক ধারণায় থাকতেও পারে না, সোভিয়েত ইউনিয়নকে শিল্পায়নের জন্য প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করতে কৃষি খাতকে কলোনী হিসাবে ও শিল্প খাতকে মেট্রোপলিস হিসাবে ধরে কৃষি খাত থেকে শোষণের মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে। যেহেতু কৃষিতে প্রত্যক্ষ করারোপের মাধ্যমে এমন পুঁজি আহরণের তীব্র রাজনৈতিক জটিলতা বিদ্যমান, সেহেতু রাষ্ট্রীয় শিল্প একচেটিয়া দাম নীতির মাধ্যমে অসম বিনিময় দ্বারা কৃষি থেকে প্রয়োজনীয় সমাজতান্ত্রিক পুঁজি সঞ্চয়ন করবে। প্রিওব্রাঝেন্সকির এ তত্ত্বের বিপরীতে বুখারিন নেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য উন্নয়নের ওপর জোর দেন ও কৃষক বাজারকে সন্তুষ্ট করার যুক্তি উপস্থাপন করেন।

স্টালিন এ বিতর্কে প্রথমে বুখারিনের পক্ষে ছিলেন ও প্রিওব্রাঝেন্সকির সুপার শিল্পায়নকে উপহাস করেন। এ সময়ে ১৯২৪ সালে Foundation of Leninsm পুস্তিকায় স্টালিন বলেন যে একটি দেশে সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতা দখল করতে

পারলেও একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বিশেষত: রাশিয়ার মতো কৃষক প্রধান দেশে কয়েকটি উন্নত দেশের সর্বহারাদের সাহায্য সমাজতন্ত্র নির্মাণে প্রয়োজন। কিন্তু ট্রটস্কির 'নিরন্তর বিপ্লব' ধারণাকে প্রতিহত করতে গিয়ে একই বছর তিনি 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' ধারণা হাজির করেন। Foundation of Leninsm-এর প্রথম সংস্করণ বাজার থেকে অপ্রামাণিক বলে প্রত্যাহার করে নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি সর্বহারা বিপ্লব ইউরোপে সংঘটিত হতে বিলম্ব হয় "যদি আদৌ কখনও তা না ঘটে, আমরা এই দেশে একটি পূর্ণ, শ্রেণিহীন সমাজ বিকশিত করতে সমর্থ। সুতরাং আসুন, আমাদের মহান গঠনমূলক কর্তব্যে মনোসংযোগ করি। যাঁরা আপনাদের বলেন যে, এ ইউটোপীয়, হয় তারা এডভেঞ্চারার, নয় তারা ভীরু সোস্যাল ডেমোক্রাট।১১ তাঁর 'একদেশে সমাজতন্ত্র' ধারণা বাস্তবায়নের জন্য তিনি বুখারিনের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকে এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে প্রিওব্রাঝেন্সকিসহ বামপন্থী বলশেভিকদের আদিম সমাজতান্ত্রিক পুঁজি সঞ্চয়ন তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে। যে প্রক্রিয়ায় প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই অঘোষিত আদিম সমাজতান্ত্রিক পুঁজি সঞ্চয়ন বাস্তবায়িত হয় তা এমন: মিলিয়ন মিলিয়ন কৃষককে যৌথ খামারের আওতায় এনে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী সরকার নির্দিষ্ট নির্ধারিত দামে কৃষিপণ্য সরবরাহে মাধ্যমে সম্পদ কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তর। কিন্তু এই কৃষির গণযৌথিকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয় এবং পরিণামে কয়েক মিলিয়ন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়, তা কোন মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় সমর্থনযোগ্য কিনা প্রশ্ন সঙ্গতভাবে উঠতে পারে। সেই থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি কখনও মাথা তুলতে পারেনি। অবহেলিত ছিল চিরকাল। কিন্তু কৃষি যৌথিকরণে যে নিষ্ঠুরতা, দানবতা প্রদর্শিত হলো তাকে একমাত্র "End justifies the means" এই যুক্তি ছাড়া সমর্থন করা যায়না। সোভিয়েত জনগণের মুক্তির পথ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাও সেখান থেকে প্রাপ্তব্য সাহায্যের আশা তিরোহিত হয়। মিশ্র ব্যবস্থা 'নেপ' প্রবর্তনে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী ধনী কৃষকদের আধিপত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় এক দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গেলে পন্থাটি যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, তা বৃহত্তর জনগণের স্বার্থেই। কিন্তু মার্কসীয় ধারণায় "End justifies the means" ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচিত হতে পারে।

লেনিন সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে পণ্য অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছিলেন। কখনও তিনি এর ব্যবহারকে কৌশলগত পশ্চাৎপসারণ ও কখনও দীর্ঘকালীন সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর পথ হিসেবে উল্লেখ করেন। নেপ সময়ে তিনি লাভ ক্ষতির হিসাব (Cost Accounting)-এর উপর জোর দেন। উৎপাদন খরচ উঠিয়ে লাভ ক্ষতির হিসাব প্রবর্তনেও তিনি জোর দেন। বুখারিন ও সুস্পষ্টভাবে পণ্য অর্থ সম্পর্ক ব্যবহারের কথা বলেন।

11. Quoted in Deutscher, Stalin: A political Biography.

'আমরা বিশ্বাস করতাম যে একটি খোঁচায় বাজার সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করা সম্ভব। দেখা গেলো যে আমরা বাজার সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোন কিছুর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে পারব না'।১২

কিন্তু প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা থেকেই নেপের মিশ্র অর্থনীতি ও বাজার নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়। প্রফেসর খান ফেল্ডম্যান মডেলের কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু স্টালিন আমলে সময় গাণিতিক মডেল, জাতীয় অর্থনীতির ব্যালেন্স সহ বহু অর্থনৈতিক গবেষণা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ভৌত পরিকল্পনা সার্বিক গুরুত্ব লাভ করে। পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য Material Balance পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মূলধন দ্রব্যের সরবরাহ কেন্দ্রীয়ভাবে Material and Technical Supply ব্যবস্থায় এনে বাজারকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে যে সীমিত বাজার রাখা হয় দাম সেখানে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা হয়। 'বেগমাত্রাই সবকিছু নির্ধারণ করবে' এই স্লোগানে পরিমাপগত দিক উৎপাদনে সঠিক গুরুত্ব পায়, গুণগত মান নিতান্ত অবহেলায় শিকার হয়। বিরাট অপচয় ও মূল্যে বেগমাত্রা অর্জিত হয়। লেনিনীয় পরিকল্পনায় অনুপাত রক্ষার ধারণা পরিত্যক্ত হয়। স্টালিন আমলে প্রবৃদ্ধির সাথে স্টালিন পরবর্তী প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে স্টালিন আমলে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অনুদানে মোট বিনিয়োগের সিংহভাগ বণ্টিত হতো ভারী শিল্পভিত্তিক উপকরণ সংগ্রহে। কিন্তু স্টালিন পরবর্তী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মূলধনী পণ্য উৎপাদনে গুরুত্ব হ্রাস প্রবৃদ্ধি শ্লথের অন্যতম কারণ। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে বিনিয়োগের স্থলে অর্জিত মুনাফা থেকে বিনিয়োগ ব্যবস্থা হলে প্রবৃদ্ধি আরও শ্লথ হয়ে যায়।

স্টালিন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে অর্থনৈতিক আলোচনা শুরু হলেও তা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারেনি। অনেকে বুখারিনের ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির ধারণার প্রশংসা করেন। কান্তারোভিচ, নেমচিনভ, নভোঝিলভ সহ কয়েকজন কাম্য দাম প্রবর্তনের কথা বলেন। তাঁরা শ্রম বহির্ভূত ব্যয় যেমন মূলধন চার্জ ও পার্থক্যজনিত খাজনাসহ সব সামাজিক খরচ দামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেন। প্রফেসর খান সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী মূল্যায়নের ত্রুটির কথা আলোচনা করেছেন। বস্তুত সত্যিকারভাবে যেসব নির্ণায়ক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়, সবগুলোই অকার্যকর প্রমাণিত হয়। মূল্যায়ন উৎপাদিত মূল্যের ওজন ভিত্তিক হলে ভারি ধাতু ও অপ্রয়োজনীয় অধিক পরিমাণ ধাতু দিয়ে সম্পদের যথেচ্ছ অপচয়ের মাধ্যমে উৎপাদন, মূল্য ভিত্তিক হলে দামি উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন নেট মূল্য সংযোজন হলে অধিক পরিমাণ শ্রমিক ব্যবহার করে সম্পদের যথেচ্ছ অপচয় ঘটানো হয়।

12. Bukharin, Put k Sotsialismu (Path to Socialism)

ক্রুশ্চেভের আমলে গৃহীত সংস্কার বেশি দূর এগোয় না। ১৯৬২ সালে প্রফেসর লিবারম্যানের প্রবন্ধ ১৯৬৫ সালে পার্টির প্লেনামে গৃহীত ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সংস্কার কর্মসূচি সেভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক নৈপুণ্য, উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে না। কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ সম্পদ বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। সমাজতন্ত্রের বিঘোচিত উৎকর্ষতা প্রমাণে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও সামাজিক সুরক্ষা খরচ বাড়তে থাকে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমেরিকায় নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে সমান তালে চলতে অর্থনীতি নাভিশ্বাস তোলে। কৃষিক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব চলতে থাকে। শিল্প ক্ষেত্রে সাতের দশকে প্রবৃদ্ধি একেবারে মন্থর হয়ে পড়ে। গর্বাচেভ তাঁর 'পিরিস্ত্রোইকা' রচনায় বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেন। তাঁর মতে চরম কেন্দ্রীভূত নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা ইতিবাচক দিক চারের দশকেই শেষ হয়। কিন্তু এই মডেলটি বিদ্যমান রাখায় তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। গর্বাচেভ তাঁর 'পিরিস্ত্রোইকা' কর্মসূচিতে পূর্ণ কষ্ট একাউন্টিং, দাম সংস্কার বাজার প্রত্যয় ব্যবহার, বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে বিদ্যমান ত্রুটিগুলি দূর করতে চান। কিন্তু তা বিন্দুমাত্র বাস্তবায়নের পূর্বেই তাঁর 'গ্লাসনস্ত' (গণতন্ত্র)-এর সুযোগের নৈতিক রাজ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নেরই পতন ঘটে। বৃহত্তম সামাজিক প্রকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রফেসর খান পঞ্চম অধ্যায়ে 'পুঁজিবাদ কি মানবসমাজের ভবিতব্য?' মার্কস পরবর্তী নানা পুঁজিবাদের উদ্ভব প্রসঙ্গে পুঁজিবাদ ও বৈষম্য, পুঁজিবাদ ও সঙ্কট বিশেষত: সঙ্কটের কেইনসীয় ব্যাখ্যা ও তার সমাধান সূত্র: পুঁজিবাদী নৈপুণ্যের আত্মস্বীকৃত সীমাবদ্ধতা, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ও বিভিন্ন পুঁজিবাদের তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করেছেন। বিদ্যমান সমাজতন্ত্র পতনের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদই তাহলে মানবসমাজের ভবিতব্য কিনা আলোচনায় তিনি ১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার 'ইতিহাসের পরিণতি ও শেষ মানুষ' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য আলোচনা করেছেন। উদার গণতন্ত্র বিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করেছে এবং সর্বশেষ সমাজতন্ত্রকে পরাস্ত করেছে। বাজারই এখন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বদলে প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠবে। বিবর্তন পুঁজিবাদেই সমাপ্ত হলো। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। যে ইতিহাসের তিনি সমাপ্তি টানলেন, সেই ইতিহাসই তাঁকে ব্যঙ্গ করে তার উপর মধুর প্রতিশোধ নিল। ৯/১১ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'Bring Back the State' ধ্বনি তুললেন এবং অস্তিত্বের জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। ২০১৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে ধ্বনি তুললেন 'সমাজতন্ত্রের ফিরে আসা উচিৎ' (Socialism ought to come back)।১৩

আয় ও সম্পদের বিরাট অসমতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র বলতে তিনি পুনর্বণ্টন কর্মসূচি বুঝিয়েছেন। শুধু তাই নয় মার্ক্সে প্রশংসা করে বললেন, মার্ক্স পুঁজিবাদে অতি উৎপাদন ও অপ্রতুল চাহিদা বিষয়ে সঠিক ছিলেন।

13. New Statesman, October 17, 2018

তবে তিনি মডেল হিসাবে বর্তমান চীনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর খান পুঁজিবাদে কীভাবে বৈষম্য বেড়েছে ও তার চরিত্র কী তা পিকেটির রচনার উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী সঙ্কট আলোচনায় তিনি প্রধানত কেইনসের এ বিষয়ে বক্তব্য আলোচনা করেছেন। অবশ্য পুঁজিবাদী সংকটের কেইনসীয় বিশ্লেষণ থেকে মার্কসের বিশ্লেষণ অধিক অর্থবহ। অধ্যাপক খান পুঁজিবাদী নৈপুণ্যের আত্মস্বীকৃত সীমাবদ্ধতা ও গণতন্ত্র পুঁজিবাদে কতটা ব্যক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধক তা আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন পুঁজিবাদের তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তিনি সঙ্গতভাবে স্ক্যান্ডিনেভীয় পুঁজিবাদ (স্ক্যান্ডিনেভীয় সমাজতন্ত্র?) তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

অধ্যাপক আজিজুর রহমান খানের পুস্তকের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপ অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়: 'পথসন্ধান: আমার সমাজতন্ত্র'। আলোচনায় আমি মার্কসের মন্তব্য 'আমি মার্কসবাদী নই' দিয়ে প্রধানত: প্রফেসর খানের 'আমার সমাজতন্ত্র' শিরোনামের বইয়ের নামকরণ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বিদ্যমান সমাজতন্ত্র মার্কসীয় সমাজতন্ত্র যার উত্থান, পতন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধানত: তাঁর আলোচনা, সেই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বাস্তবে না সোভিয়েত ইউনিয়ন, না গণচীন বা কোথাও ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ উভয়েই ইউটোপীয় দোষে দুষ্ট। অন্যদিকে, মার্কসের পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। শ্রমিক শ্রেণির চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সাবজেকটিভ ফ্যাক্টর হিসাবে শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব সম্পন্ন করবে– এ দুটি বিশ্লেষণ সঠিক প্রমাণিত হয়নি। এ ব্যতিরেকে মার্কসের পুঁজিবাদের অপরাপর বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক। এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি না পেলেও তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী আপেক্ষিক দারিদ্র্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যদিকে বিদ্যমান পুঁজিবাদ বা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিশেষত ইঙ্গ-মার্কিন অঞ্চলের পুঁজিবাদ বর্তমানে যে ধন ও সম্পদ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তা কল্পনাতীত। অক্সফামের সর্বশেষ একটি সমীক্ষা অনুযায়ী শীর্ষ ২৬ জন বিলিওনিয়ারের মোট সম্পদ পৃথিবীর দরিদ্রতম ৩৬০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতি দুদিনে একজন বিলিওনিয়ার আবির্ভূত হয়েছে। রিগান ও থ্যাচারের আমল থেকে যে বাজার মৌলবাদের রাজত্ব চলছে, তার দাপটে বৈষম্য দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। ঘোরতর অন্যায্য এ উৎপাদন ব্যবস্থা কোনক্রমেই টেকসই নয়। একটি দিক প্রফেসর খানের রচনায় উল্লেখ দেখিনি। গত কয়েকশ বছরে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও অনিয়ন্ত্রিত ভোগ ব্যবস্থা ও ভোগবাদিতা আমাদের এ গ্রহকে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় যে ভয়াবহতম অস্তিত্বের সম্মুখীন করেছে, তাতে এ উৎপাদন ব্যবস্থায় পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন। সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে পুঁজিবাদী এ উৎপাদন ব্যবস্থা টেকসই নয়। মার্ক্সে বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে।

যেহেতু পুঁজিবাদের প্রধান দ্বন্দ্ব ব্যবস্থার ভেতরে অসমাধানযোগ্য। সাবজেকটিভ উপাদান সেখানে শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু এ ধরণের বিপ্লবের সম্ভাবনা বর্তমান বা নিকট

ভবিষ্যতে শূন্য বলা যায়। ঐতিহাসিক অনিবার্যতার স্থলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক চরম অন্যায্যতা ও পরিবেশগতভাবে টেকসইহীনতার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র-বিভিন্ন দেশে যে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বর্তমান ছিল ও বিদ্যমান পুঁজিবাদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রফেসর খান বিশেষণ বর্জিত 'আমার সমাজতন্ত্র'-এর রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের সূচনায় উপক্রমণিকায় কেইনসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে করেছেন। মানবজাতির রাজনৈতিক সমস্যা তিনটি লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনের সমস্যা: অর্থনৈতিক নৈপুণ্য, সামাজিক ন্যায্যতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা। শেষ 'পথসন্ধান: আমার সমাজতন্ত্র' অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনটি লক্ষ্যকে সমন্বিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় কোন এক ধরণের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। নামে কিবা আসে যায়। তিনি অধ্যায়ের শুরুতেই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৈষম্য কমাতে হলে সামাজিক গণতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'আমার সামাজিক গণতন্ত্র' হতে পারত। উপক্রমণিকাতেও তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রেসির কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপে সামাজিক গণতন্ত্রকে তখন প্রফেসর খানসহ অন্যদের সহানুভূতি থাকলেও সমাজতন্ত্রের জলো সংস্করণের বেশি কিছু মনে করতেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করেছেন নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন সামাজিক গণতন্ত্রী-সোশ্যাল ডেমোক্রাট হিসাবে। এমনকি রুশ বিপ্লব সাধিত হয়েছিল যে দলটির নেতৃত্বে সে দলের নামও রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি ছিল। লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, বর্তমানে পার্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যখন সাম্যবাদী তখন দলের নাম সোশ্যাল ডেমোক্রেসি রাখা ঠিক নয়। এপ্রিল থিসিসেও তিনি দলের নাম কম্যুনিস্ট পার্টি করার প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে জবঊখচ (Russian Social Democratic Labour Party) কে All Russian Communist Party নামকরণ করা হয়। বিষয়টি নেহায়েতই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় হিসাবে কম্যুনিজম যদি ইউটোপীয় হয়, বিশেষত: এর বণ্টন ব্যবস্থা প্রত্যেকে তার চাহিদা অনুযায়ী পাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে সে সীমাহীন প্রাচুর্যের অবাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে এই অবাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি নামটি কতটা যৌক্তিক সে প্রশ্নও উঠতে পারে।

প্রফেসর খান তাঁর সমাজতন্ত্রের রূপরেখায় মালিকানা প্রশ্নে চার ধরণের মালিকানা সম্বলিত ব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন। উৎপাদন নৈপুণ্য বিধানে বাজারের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন তবে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কর্মসংস্থান প্রশ্নে তিনি বেশ কিছু উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থায় সুপারিশ করেছেন। ব্যাপক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর রূপরেখায় সন্নিবেশিত। প্রফেসর খানের মতে তাঁর প্রণীত রূপরেখা বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন ও বিদ্যমান পুঁজিবাদের বৈষম্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত হতে পারে।

এ বিষয়ে অবশ্যই সঙ্গত বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যাকে আমরা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ নামে অভিহিত করি, তা আর বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বিদ্যমান পুঁজিবাদের অমানবিকতা, নিষ্ঠুর বৈষম্য সৃষ্টি, পরিবেশগতভাবে পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়ায় পরিপ্রেক্ষিতে তাও কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। বিকল্প হিসাবে প্রফেসর খান তাঁর অনুপম মেধা, অভিজ্ঞতা, মনন, চিন্তা ও এ পরিণত বয়সেমশ্র দিয়ে যে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা হাজির করেছেন, তার জন্য তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

* ড. দিলীপ কুমার নাথ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

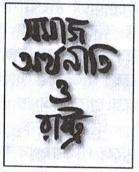

আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাবনা ও সমস্যা

মাহবুবউল্লাহ

(সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে ড. নজরুল ইসলামের 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশে আনুপাতিক নির্বাচনের ভূমিকা'র উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তাদের মধ্যে ড. মাহবুবউল্লাহর আলোচনাটির শ্রুতিলিখন প্রকাশ করা হলো।
– সম্পাদক)

প্রথমেই ইতিহাসের তথ্যগত ভুল বলে নেই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সভাপতি যেটা বললেন, প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত যারা দিয়েছেন তাদের মধ্যে আমিও একজন। আমি বলব, আমি তাদের মধ্যে একজন নই। কারণ সে সময় আমার ওপর হুলিয়া ছিলো এবং আমি আত্মগোপনে ছিলাম। তবে রাতের বেলায় কর্মীদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, কথাবার্তা হতো। আমি প্রকাশ্যে চলে আসি ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে। সেদিন ছাত্র ইউনিয়নের আরেক গ্রুপের নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক তিনিও প্রকাশ্যে চলে আসেন। সেজন্য দেখা যাচ্ছে '৬৯-এর স্মৃতিও আমাদের অনেকের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। এইভাবে অনেক স্মৃতি ফিকে হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা ঠিক ইতিহাসগুলো সামনে তুলে ধরতে পারছি না। সামনে তুলে ধরতে পারছি না বলেই, প্রচণ্ড ধরণের চিন্তার জগতে, ডিসকোর্সের জগতে, রাজনীতির জগতে, সমাজে বিভ্রান্তি বাড়ছে। আমি চেষ্টা করি সততার সঙ্গে সত্যকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। এটা আজকের আলোচনার বিষয় নয়।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন এবং এরপরে বিনায়ক সেন যে উপস্থাপনা করেছেন তার ওপর আলোচনা। আমি দুটোর ওপরই আলোচনা করব। প্রথমে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের ধারণাটিকে আমি বলব যে, যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব এইজন্য দিতে হবে যে, সত্যি সত্যি এটা জরুরি, আমাদের নির্বাচনগুলো যেভাবে হয় সেখানে দুটো বৃহৎদল প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে দেখা যায়, একটি দল যদি ৪০ শতাংশ ভোট পায়, অন্য দলটি যদি ৩৯ শতাংশ ভোট পায় তখন তাদের প্রার্থী সংখ্যায় বিশাল একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এটা গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা আমরা দেই 'রোল অব মেজরিটি বাট দি কনসেন্ট

দি মাইনর'। কাজেই সবকিছু একেবারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে করাটা কখনই গণতন্ত্র হতে পারে না। গণতন্ত্রে অবশ্যই যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাদের মতামতটা বিবেচনায় নিতে হবে। সেটা বিবেচনা না নেয়া হলে সবচেয়ে যে বিপদ হতে পারে তার মধ্যে একটা বড় বিপদ হচ্ছে আজকের বাংলাদেশে যে ভাগের মেরুকরণ হয়েছে, জাতি যেভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, অথচ এ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ ছিলো না। ভাষার দিক থেকে বলি, ধর্মের দিক থেকে বলি এইরকম একটা হোমোজেনিয়াস জাতি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। অথচ আমরা দারুনভাবে বিভক্ত। শুধু বিভক্ত নয়, এই বিভক্তির চেহারাটা হচ্ছে ট্রাইবাল ক্যারেক্টার। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সংঘাত হয়েছে। বাংলাদেশেও সেই ধরণের সংঘাত হতে পারে। সুতরাং আমাদের জন্য একটা বড় ধরণের অশনি সংকেত।

এই ক্রাইবালিজমের কারণে যখন আমরা ক্ষমতায় যাই তখন অন্যদেরকে এমনভাবে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি যেন তারা মৃতপ্রায় হয়ে যায়। অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এটা আর যাই বলা যায় গণতন্ত্র নয়। কাজেই সেইখানে সংখ্যানুপাতিক একটা যৌক্তিকতা সবদিক থেকেই আছে। এই যৌক্তিকতার ব্যাপারটি প্রফেসর নজরুল ইসলাম যথেষ্ট যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে তিনি এর উপকারিতা এবং অপকারিতা দুটো দিক নিয়েই আলোকপাত করেছেন। উপকারিতার পাশাপাশি সমস্যাগুলো কি হতে পারে সেইগুলোও বলেছেন। আমার কাছে মনে হয় যেটা বিপজ্জনক, যে এই সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু হলে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের যে বিপদ তা দেখা দেবে। সুতরাং আপনারা পাকিস্তানেই ষাটের দশকের প্রাক্কালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় যখন এসেছিল তার প্রেক্ষাপটে ছিলো ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন। আমাদের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সরকার ১১-১২ মাসের বেশি টিকতে পারেনি। তারপর আসলো ফিরোজ খান নূনের সরকার। অথচ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ফিরোজ খান নূনের দল পাকিস্তান রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে। পরবর্তীতে ফিরোজ খান নূন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। আমরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা দেখেছি। সেই পরিবর্তনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আবু হোসেন সরকার ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব করছেন, তারপর আসছেন আতাউর রহমান খান। এই ধরণের অস্থিরতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় রকমের অন্তরায়। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, এটার বিপদ থেকে আমরা কোনভাবেই রক্ষা পাব না। হর্স সেইলিং বলে একটা কথা চালু আছে, সংসদ সদস্যদের কেনা বেচা, এমনিতেই বাংলাদেশে হরেক রকম কেনাবেচা, বাণিজ্যে আমরা অস্থির। আমরা মনোনয়ন, কোচিং, পরীক্ষা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাণিজ্যে অস্থির। সেই সঙ্গে যদি নতুন করে আরেকটা বাণিজ্য শুরু হয় অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের কেনাবেচা বাণিজ্য, তাহলে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, সেটা কিভাবে আমরা কাটাতে পারি সেইদিকে জোর দেওয়া উচিত।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে রাজনৈতিক দলগুলো যদি দায়িত্বশীল না হয় সেখানেও কিন্তু মনোনয়ন ঠিক করার ব্যাপারে বড় রকম সমস্যা হতে পারে। মনোনয়নে কার

নাম অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমূহসম্ভাবনা রয়েছে। ৩০০ পার্লামেন্ট সদস্যর নাম ক্রমাধিকারে তৈরি করব এই তৈরি করার দায়িত্বটি কিভাবে হবে, তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি কি হবে সেটা যদি স্থির না হয় তাহলে কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাবনা করা হয়েছে সেটা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনোনয়নের পদ্ধতির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র– এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেখানেও খুব সমস্যা আছে। সমস্যাটা আমরা যখন ছাত্র সংগঠন করতাম, ড. এম এম আকাশ বোধহয় খুব ভালো জানবে– সেটা হচ্ছে একসময় যখন আমাদের মধ্যে আইডোলজিক্যাল পার্থক্য দেখা দিলো তখন আমরা অতটা অগণতান্ত্রিক ছিলাম না। কিন্তু আমরা যেটা চেষ্টা করতাম, সেটা হচ্ছে কাউন্সিলদেরকে প্রভাবিত করা। কাউন্সিলদের প্রভাবিত করা গেলে শেষ পর্যন্ত সম্পাদক, সভাপতির পদটা হাতিয়ে নেওয়া যায়। আমরা যদি এই গণতন্ত্রটা ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করতে চাই, একটা সঠিক জনমত নিতে চাই, সেটা কিভাবে করতে হবে? প্রচলিত ব্যবস্থায় জনমত সঠিক প্রতিফলন ঘটাবে সেটা আমরা কতটুকু বলতে পারি। এমনিতেই জাতি হিসেবে আমরা যথেষ্ট উশৃংখল। আমরা নিয়ম-নীতি মানতে চাই না। আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিতে চাই না।

আমরা যদি ৩০০ সদস্যর তালিকা করতে চাই তাহলে হয়তো ৩০ বছর লেগে যাবে। ৩০ বছর মানে ২০৫০ সাল। ততদিনে যদি আমাদের সুমতি হয়, এবং আমরা যদি বুঝতে পারি, আমরা কোথায় যাচ্ছি তাহলে সেটা আমরা করতে পারব। আর রাজনৈতিক দলগুলোকে মনোনয়ন দিতে হলে সব অঞ্চলভিত্তিক অর্থাৎ তখনও কিন্তু সংসদীয় এলাকা মনোনয়ের একটা ব্যাপার থেকে যাবে। একটা রাজনৈতিক দল, কিছু বিশিষ্ট লোক চিন্তা করলেই সেই রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। রাজনৈতিক দলকে চিন্তা করতে হবে যে, আমি ঠাকুরগাঁওকে কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করাব, অন্য জেলাগুলোকে কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করাব। কাজেই সেইখানে ৩০০ মনোনয়নের ব্যাপারে অঞ্চলভিত্তিক ক্রাইটেরিয়া আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে দলের জন্যও সমস্যা হবে এবং অনেকেই নিজদেরকে দলের নেতা মনে করবে। আরেকটা সমস্যা, এই যে ৩০০ প্রার্থী, এই কমন ব্যাপারটা কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড এটা নির্ধারণ করতে গেলে সাবজেক্টিভ জাজমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা কেউ কিন্তু সুক্ষাতিসুক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে পারবনা। কি করলে আমি বলতে পারব যে, প্রার্থী নম্বর এক হচ্ছেন অমুক, দুই হচ্ছেন অমুক।

নজরুল ইসলাম সাহেব যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ। অধ্যাপনা করেছেন-করছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। প্র্যাকটিক্যালি পাওয়ার পলিটিক্স তিনি বোধহয় করেননি। যদি করতেন তাহলে বুঝতেন যে সমস্যাটা কত কঠিন এবং গভীর। এক নম্বর আমি কি এতো শক্তিশালী যে নতুন একটি সমাজ সৃষ্টি করব? আর দুই নম্বর হচ্ছে, ২৯৯ বা ৩০০ নম্বরে যিনি আছেন তিনি বলবেন, আমি হলাম সবার নীচে, সবার পিছে। কারণ ৩০০ তালিকা করলেও কোন নির্বাচনেই এই পুরো ৩০০ তালিকার, আনুপাতিক ভিত্তিতে হলে কখনোই, সবাই সাংসদ হতে পারবেন না।

একটা অংশ তো বাদ পড়বেই। এই আনুপাতিক নির্বাচন করতে গিয়ে সমস্যা যেটা হবে তাহলো সেখানেও কিন্তু এক নম্বরে থাকা এবং দুই নম্বরে থাকা বা প্রথম দিকে থাকার জন্য একটা বাণিজ্য হতে পারে। আমরা জানি না এর জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে, এটা ঠিক বলতে পারছি না। রাজনীতিতে একজন সুশিক্ষিত ভালো লোক যদি নেন, যে সুন্দর সুন্দর কথা বলে, তার সঙ্গে আর একজন, হয়তো তিনি অল্প শিক্ষিত অথবা শূন্য শিক্ষিত, তিনিও রাজনীতি করেন। তার সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্ক আছে। এই মানুষটির ভ্যালু আর শিক্ষিত মানুষটির ভ্যালুর পার্থক্য কি? ব্যারিস্টার অমুক, ডক্টর অমুক বা অন্য কোন অধ্যাপক অমুক এদের যে হয়ার্কি আমরা ইকোনমিক্সেবলি রিটা কনসেপ্ট। এই হয়ার্কি প্রবলেম বড় একটা প্রবলেম। মোটামুটি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধত্ব সম্পর্কে আমার এই অবজারভেশন-গুলো থাকলো। তার পরেও আমি যে কথাগুলো বলব, আমাদের অনেক সমস্যা আছে, কঠিন হলেও সমস্যাগুলোর সমাধান আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। রাজনীতিতে কেউ সবদিক থেকে শুদ্ধ, সবদিক থেকে সঠিক তা মনে করি না। পশ্চিমা গণতন্ত্র– সে গণতন্ত্রও সবদিক থেকে শুদ্ধ তাও মনে করিনা। এখানে যারা উদ্যোক্তা, তারা সর্বহারা শ্রেণির রাজনীতি করেন। রাজনীতি যদি করেন তাহলে এইসব ইস্যুর চাইতে তাদেরকে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে শ্রেণিগত বিষয়গুলোর দিকে।

একজন আমাকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের জন্য নতুন করে ছয় দফা দরকার'। আগের ছয় দফা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যার প্রশ্ন। আর এই নতুন ছয় দফা হবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের হিস্যার প্রশ্ন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিষয়ে এসব বলার পরে রাজনীতি কোন দিকে যাবে, এটা কি আমাদের সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রশ্নটাই বিচার করা হবে, না জাতীয় প্রশ্নকে বিবেচনা করা হবে? মার্কসবাদের তিনটা প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ– শ্রেণি, স্টেট, ন্যাশনাল। লেনিনের সঙ্গে এম এন রায়ের যে বিতর্ক হয়েছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে, তাতে রায় বলেছিলেন, ভারতের মানুষ স্বাধীনতা নয়, ধনীদের শোষণ থেকে বাঁচতে চায়। তার বিপরীতে লেনিন প্রাচ্যের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে লেনিনের আলাদা একটা লেখাও আছে। তিনি বলেছিলেন, তোমরা কমিউনিটি ইস্যু ন্যাশনাল প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দাও। এই অঞ্চলের বাম রাজনীতির যে ব্যর্থতা তার পেছনে আমি বলব, যারা বামপন্থী রাজনীতি করেছেন, তা থেকে নিজেকেও বাদ দিবনা, আমরা কখনই ন্যাশনাল প্রশ্নের গুরুত্ব দেইনি বলে এই ন্যাশনাল প্রশ্নটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। তার জন্য দেশকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

আরেকটা বিষয়– সেটা ড. বিনায়ক সেনের উপস্থাপনা সম্পর্কে। তিনি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে বলেছেন। বিএনপির ম্যানিফেস্টোর অপূর্ণতার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছি বিএনপির ম্যানিফেস্টোর যে সমস্যা রয়েছে তা মির্জা ফখরুলের সমস্যা। মির্জা ফখরুলরা চায় যেকোন উপস্থাপনা– তা যত সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া যায় ততই ভালো। সে বিচারে এটাই সঠিক। তার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ অস্থির। তারা সব কথা শুনতে চায় না। সুতরাং সবকিছু সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এত সংক্ষিপ্ত যে পড়তে খুব বেশি সময় না

লাগে। সাংবাদিকদের যাতে অসুবিধা না হয়। এবং যে ইশতেহার দিয়েছেন তাও সংক্ষিপ্ত। বলা হলো, ওয়েবসাইটে বিস্তারিত পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে সংক্ষিপ্তটাই আছে। কোন ছাপা নাই। নির্বাচনটাই এমন অস্থিরতার মধ্যে হচ্ছে বিশেষ করে বিরোধীদলের পক্ষে, যার ফলে সবকিছু সুচারুরূপে করা সম্ভব হচ্ছে না। ধনী-গরিবের বৈষম্য প্রশ্ন– এটা বিএনপির ম্যানিফেস্টোর একেবারে উপক্রমনিকার মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ফোকাস করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যেটা বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে গ্রামগুলোকে শহরমুখী সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করার কথা আছে। বিএনপির ম্যানিফেস্টোতে যা বলা হয়নি। মজার ব্যাপার বিএনপির ম্যানিফেস্টোতে বলা আছে ৫০ সালের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশ একটা গ্রামরূপী চেহারা অর্জন করবে। এবং বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ নগর রাষ্ট্র। কারণ আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি আরবান করিডরগুলো তৈরি হয়েছে হাইওয়েগুলোকে কেন্দ্র করে এবং তার আশেপাশে এবং বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটেস্টিকস-এর আরবানের যে ডেফিনিয়েশান, তাতে অনেক এলাকাই আরবান এরিয়ার মধ্যে পড়ে যায়। এবং এটা বিস্তৃত হতে থাকলে যে সমস্যা হবে জনসংখ্যা আরো বাড়বে। কৃষিজ জমি ধ্বংস হবে। প্রতিবছর এক লক্ষ হেক্টর জমি অকৃষিখাতে চলে যাচ্ছে। এখন থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই তাহলে পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে একটা সুন্দর পরিকল্পনা দরকার। যাতে একদিকে জমি হারিয়ে যাবে না, আরেকদিকে সমগ্র দেশেই নৈরাজ্যহীন, সুশৃঙ্খল আরবান উন্নয়ন হতে পারে।

আপনারা গ্রামে গেলে দেখবেন পাঁচ তলা ভবন হয়ে গেছে। আমি গ্রামে বহুবছর আগে দেখলাম এক ভদ্রলোক কৃষক কিছুক্ষণ আগে ক্ষেত থেকে নাড়া সংগ্রহ করে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম জীবনমান উন্নত। ভাতটা চিনিগুড়া চালের। আমাদেরও খাওয়ালেন। চমৎকার ভাত। দেখলাম পাঁচ তলা দালান করছে। পাঁচ ছেলে থাকবে এই চিন্তা থেকে। এটা ৩০ বছর আগের কথা। এত আগে এই কৃষক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা করতে পেরেছিল। এই চিন্তা নিশ্চয়ই যদি আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি, বলতে পারি এখন বাস্তব অবস্থার চাপে তারা সহজেই রাজি হয়ে যাবে। বিদেশি টাকা যেখানে আসছে সেখানে গ্রামে বিল্ডিং হচ্ছে। আবাসনের চেহারা বদলে যাচ্ছে। এই চেহারাটার সামাজিক রূপ দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। বিএনপির ম্যানিফেস্টোতে নিত্যদিনের গণতন্ত্রের কথা বলা আছে। কতটুকু তারা করবেন, কতটুকু করবেন না জানি না। সন্দর সুন্দর কথা বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় গেলে কতটুকু করবেন। যেই যায় লংকায় সেই হয় রাবন। সেই কথাটাই বলতে হয়। আপনি ইলেকশন করেছেন, সরকার গঠন করেছেন। সরকার গঠনের পর মানুষের কথা আপনাকে শুনতে হবে। মানুষের মতামত জানার জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। প্রয়োজনে জরিপ করতে হবে। পত্রিকাগুলো কি বলছে তা জানতে হবে। দলের মধ্যে একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে মানুষ কি ভাবছে, চাচ্ছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। ধারাবাহিক ডায়লগ বিরোধীদলের সাথে করতে হবে। এই মিলিয়ে নিত্যদিনের গণতন্ত্র। বেগম জিয়াকে ক্ষমতা ছাড়ার কথা ৯৬-এ আমি বলেছিলাম। নিত্যদিনের গণতন্ত্র খুব উপযুক্ত। গ্রীন সোস্যাল কনট্রাক্টের কথা বলা

হয়েছে। সব উচ্চমার্গের কথা। এই দেশে সমাজে যত বিদ্বেষ, হানাহানি, দুর্দশা যা হচ্ছে এগুলো দূর করার জন্য নতুন ধরনের সামাজিক চুক্তিতে পৌঁছানো দরকার। এবং এই নতুন সামাজিক চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে ধারাবাহিক ডায়ালগে যেতে হবে। সেখানে যে কাঠামোর মধ্যেই করেন না কেন। রাজনৈতিক বিষয়ে, আপনারা জানেন আমাদের দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলী খান বলেছিলেন, 'রাশিয়ার জার এবং ভারতের মুঘল সম্রাটদের চাইতেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাশালী।' সেখানে পরিবর্তন একটা অবশ্যই দরকার।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টকে আপনি কি কি দায়িত্ব, ক্ষমতা দিবেন তার তালিকা বাড়ানো দরকার। তাহলে ক্ষমতায় একটা ব্যালেন্স আসবে। জবাবদিহীতার ব্যাপারে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে। ম্যানিফেস্টোতে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৫%, স্বাস্থ্যখাতে ৫% এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যাপারে নানান কিছু আছে, স্বাস্থ্যবীমাসহ বিভিন্ন ব্যাপার আছে। শিক্ষাখাতেও অনেক ব্যাপার আছে। বাংলাদেশের লেখাপড়ার মান কমে যাচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। এই কমে যাওয়ার কারণ শিক্ষকের মান কমে যাওয়া। শিক্ষকের মান কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে দিনের পর দিন বিএ, এমএ, এমএসসি পাশ করে যারা বের হচ্ছেন তাদের মানও কমে যাওয়া। চাইলেই ৫ বছরের মধ্যে শিক্ষকদের বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলা অনুযায়ী গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বিদায় দিতে পারবেন না। এত অর্থও আপনার হাতে নাই। প্রাইমারি, হাই স্কুল, কলেজের কথা চিন্তা করে একটি টিভি চ্যানেল করা যেতে পারে। সেখানে সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের আইডিয়েল ক্লাস রুম লেকচার প্রবর্তন করা যায়। সব স্কুলে টিভির ব্যবস্থা করে সকল শিক্ষার্থীর কাছে এটা পৌঁছানো যায়। এ কাজগুলো করাতে হবে সেইসব পণ্ডিতদের দিয়ে যারা সত্যি সত্যি দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বনামধন্য মানুষ হিসেবে পরিচিত। বিএনপির ম্যানিফেস্টোর ফোকাসটা মূলত সুশাসন কেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইন্সটিটিউশন কেন্দ্রিক।

আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো সুনিপুনভাবে অনেকদিন আগে থেকে সময় নিয়ে করে আসছে। তাদের কথায় গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন এই দুয়ের মধ্যে প্রাধিকার পাবে উন্নয়ন। এখন একটু পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে উন্নয়নের গণতন্ত্র। মনের গভীরে ঐ কনসেপ্টটাই কাজ করছে। আবার উন্নয়ন করতে গিয়ে গণতন্ত্রের প্রাধিকার কম দিলেও আমার আপত্তি ছিলো না। কিন্তু সেখানে যাতে অন্তত ভয়েসটাকে সাপ্রেস করা না হয়, সে চিন্তা বাদ দেয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, নো বুর্জোয়া নো ডাইমেন্সি। লুটেরা বুর্জোয়ার পরিবর্তে ভালো বুর্জোয়া কিভাবে হতে পারে। শুধু বক্তৃতায় লুটেরা বুর্জোয়ারা সব শেষ করে দিলো বললে হবে না। আপনাদেরকে লুটেরা বুর্জোয়াদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি নিয়েও চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশ এমন একটি এক্সপেরিমেন্ট-এর জায়গা যেখানে কেউ যদি চিন্তা করে, মনোনিবেশ করে তাহলে এখান থেকেও কেউ টুয়েনটিফার্স্ট সেঞ্চুরির মার্কস হতে পারে। সেই মার্কস এর অপেক্ষায় আছি।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

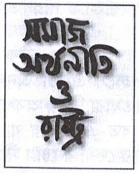

'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ'

মহসিন সিদ্দীক

১৯৯১ সালে ২৬ ডিসেম্বরের সন্ধ্যার অন্ধকারে মস্কোর আকাশে উড়ন্ত কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত লাল পতাকা শেষবারের জন্য নামিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির নাটকের সমাপ্তি হয়। এত দ্রুত সত্তর বৎসরের অকল্পনীয় সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমে গড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া আশ্চর্যজনক ঘটনা। এই বিলুপ্তি প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না; মনে হয় সমাজতন্ত্রে কেউ উপকৃত হয়নি; অর্জিত কিছুই রক্ষা করার ছিল না। গত শতকের পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে 'সোভিয়েত জীবন' সাময়িকীতে যে 'নূতন সমাজবাদী নারী পুরুষ' সৃষ্টির বিবরণ পড়েছিলাম, তারা কোথায় ছিল সেই সন্ধ্যায় কে জানে!

বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়ার জারের নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের শিকার দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক, যাদেরকে শোষক গোষ্ঠী প্রথম মহাযুদ্ধের কামানের খোরাকে পরিণত করেছিল, তাদের মুক্তির পথ খুলে দেয়। সাধারণ রুশ জনগণ 'রুটি, শান্তি ও জমি'র অঙ্গীকারের স্লোগানে সাড়া দিয়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সমাজের উৎপাদন শক্তিকে সমষ্টিগত মালিকানার অধীনে এনে মুনাফার পরিবর্তে জনগণের প্রয়োজন মেটাবার কাজে পরিণত করার অঙ্গীকারকে সমর্থন করে। এই বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় সারা বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য তাদের নিজ নিজ দেশে একই ধরনের বিপ্লবের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে ওঠে। আজ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক জোটের অবক্ষয় সত্ত্বেও খেটে খাওয়া জনগণকে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই যুগান্তকারী বিপ্লব প্রেরণা যোগাবে এবং সমাজতন্ত্রের পুনর্জাগরণে উদ্বুদ্ধ করবে। মহান অক্টোবর বিপ্লবের গুরুত্ব কখনোই হ্রাস পাবে না।

ধনিক শ্রেণির অপপ্রচার সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল বিশ্বব্যাপী। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ মার্কসবাদী সরকার পরিচালিত দেশের নাগরিক ছিল। অর্থনীতি, সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি ও মহাশূন্য বিজ্ঞান ও অন্বেষণ– প্রায় সব

ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব-শক্তিতে পরিণত হয়। তবুও সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না।

সমাজতন্ত্রের পতন মানব ইতিহাসে একটা অনন্য ঘটনা; এর কারণ আবিষ্কার, উপলব্ধি ও সমাজ বিবর্তনের গতিধারা নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয়। তবে এ যাবত এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তার বেশিরভাগই 'বাইরে থেকে ভেতরের অন্ধকারে দেখা'র চেষ্টা সীমাবদ্ধতার শিকার বলা যায়; এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বিশেষের আত্মবাদী (subjective) বিশ্লেষণ। এগুলো 'গরবাচভ সি-আই-এ-এর গুপ্তচরের ভূমিকা' থেকে 'ব্রেঝনেভের অত্যন্ত দামি পুরনো (antique) গাড়ির (automobile) বিশাল সংগ্রহের মালিকানা' পর্যন্ত বিস্তৃত। বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সমাজ বিজ্ঞানে সমাজ পরিবর্তনে ব্যক্তি বিশেষের ওপর অতিরঞ্জিত নির্ভরশীলতা ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে সমাজতন্ত্রের পতনের বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার সম্ভব নয়। একমাত্র ভেতর থেকে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় বাস্তব ও সঠিক তথ্য নির্ভর প্রমাণ সাপেক্ষেই তা সম্ভব।

এটাই ড. নজরুল ইসলামের সদ্য প্রকাশিত 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ' বইয়ের বৈশিষ্ট্য। মার্কসবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত সমাজ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা, এবং সত্তর বছর প্রচেষ্টার পরেও এই প্রকল্পকে রক্ষা করা কেন সম্ভব হয়নি, সেটা বোঝার জন্য বস্তুবাদী দর্শন ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা ড. ইসলামের এই বইয়ে সুস্পষ্ট। এর আগে রচিত তাঁর 'পুঁজিবাদের পরে কি?' বইয়ে তিনি সমাহতন্ত্রের পতনের প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই নতুন গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিক ও সমকালীন যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যাত্রা শুরু হয় তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নির্মাণের সমস্যাবলী, বিভিন্ন রাজনৈতিক মত-পথ-আদর্শ বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক, ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। মেনশেভিক, বলশেভিক, নারোদনিক, ইত্যাদি দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও অন্যান্য তাত্ত্বিক (theoretical) ও প্রয়োগিক (applied) প্রসঙ্গ, এবং বিপ্লবের যেসব নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে খুবই কম লেখালেখি হয়েছে– লেনিন এবং অন্যদের সঙ্গে যাঁদের মতবিরোধ ছিল তাঁদের কথাও এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তবে যে মৌলিক সমস্যা রুশ বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সংঘটিত পরবর্তী বিপ্লবসমূহে ঘটেছিল এবং সমাহতন্ত্রের নামে যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস সৃষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গতির অভাব সুস্পষ্ট ছিল। মার্কসবাদের সমাজতন্ত্রকে তার পূর্বে সৃষ্ট নানা ধরনের সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব থেকে পৃথক করে ' বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নাম দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের শর্তগুলো অনুসরণ না করে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, তাহলে তার ফলাফল যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে সমধর্মী হবে না, এটা কি অবধারিত নয়?

ড. ইসলাম সরাসরি না লিখলেও বিপ্লব ও তারপরের কর্মকাণ্ড যে মূলত উপস্থিত পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবহারিক প্রয়োজনো চাপে (ঢ়ৎধমসধঃরপ ঢ়ৎবংঁৎব) গৃহীত সিদ্ধান্তের ফল এটা তার বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট। লেনিন যখন প্রয়োজন মনে করেছেন, তখন তত্ত্ব সংশোধন করতে দ্বিধা করেন নি। লেনিনের 'আমাদের বিপ্লব' প্রবন্ধ থেকে নেয়া নিম্নোক্ত উক্তিতে এর উদাহরণ পাওয়া যায়:

'...ধরে নিলাম, সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত রাশিয়ার পূরিত নেই। কিন্তু মহাযুদ্ধ রাশিয়াকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় রাশিয়ার জনগণ কি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে না? রাশিয়া কি পশ্চিম ইউরোপ থেকে ভিন্ন পথে উচ্চতর সভ্যতায় পৌছতে পারে না? মেনে নিলাম যে, সমাজতন্ত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রয়োজন। এই মাত্রাটি ঠিক কী, তা পরিষ্কার নয়, কেননা পশ্চিম সংস্কৃতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় (রাজনৈতিক) পূর্বশর্তসমূহ বিপ্লবী ধারায় পূরণ করে– শ্রমিক-কৃষকের সরকার দেশসমূহকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না? কোথায়, কোন বইতে লেখা আছে যে, ইতিহাসের প্রচলিত ক্রমধারা (সিকোয়েন্স) থেকে এ ধরনের ভিন্নতা হতে পারবে না?' (পৃষ্ঠা ৩১)।

মার্কস তাঁর 'A Contribution to a Critique of Political Economy' বইতে সমাজ বিপ্লব, তথা সমাজ বিবর্তনের মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি, বস্তুবাদী ইতিহাসের দর্শন পরিবেশন করেন। এই দর্শনের তাৎপর্য না বুঝে মার্কসবাদের নামে objective reality অবজ্ঞা করলে ইঁনলবপঃরারঃু-র ফাঁদে ধরা দিতে হয়। ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তাবনা করতে যেয়ে লেনিন এরূপ ফাঁদে ধরা পড়েছিলেন কিনা, সত্তর বছর বাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সে প্রশ্ন তোলা অসংগত নয়। ভবিষ্যতের জন্য এবং সমাজ বিবর্তনের সূত্র বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকাশের জন্য তা প্রয়োজনও বটে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ বোঝার জন্য সমাজ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলসের পর্যবেক্ষণের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। মার্কস-এঙ্গেলস সমাজ বিবর্তন, তার কারণ ও কিভাবে তা অগ্রসর হয়, এসব বিষয়ে গবেষণা করেন, এবং সমাজ বিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করেন। আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র– এরূপ স্তর পরিক্রমার মাধ্যমে সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটা স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদন শক্তি ও তার মালিকানার উপর। মার্কস লিখেছিলেন, 'মানুষই তাদের ইতিহাসের স্রষ্টা, কিন্তু সেটা তার নিজের খুশিমতো করে না, নিজেদের পছন্দসই পরিস্থিতিতে করে না। বরং তারা সেটা করে অতীত-সৃষ্ট ও প্রদত্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে'।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই ধারাবাহিকতা মার্কসবাদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। A Contribution to the Critique of Political Economy গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস লিখেছেন, 'একটা সমাজ ব্যবস্থার পরিধির মধ্যে সম্ভাব্য সব

উৎপাদন শক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেই সমাজ ব্যবস্থার অবসান সম্ভব হয় না। পুরাতন সমাজের কাঠামোতেই নূতন ও উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত অবস্থার সৃষ্টি না হওয়ার আগে পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন সম্ভব নয়'। পুঁজিবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে মার্কসের এই পর্যবেক্ষণের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে সম্ভাব্য সব উৎপাদন শক্তির বিকাশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার অবসান হবে না; পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিধির মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ভিত্তি প্রস্তুত না হওয়ার আগে পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন সম্ভব হবে না। মার্কস সমাজ বিবর্তনের যে ধারা আবিষ্কার করেছেন তার তাৎপর্য হলো এই যে, (১) সমাজ ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হয়; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্য একে অপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। (২) সমাজ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হয় বিবর্তনের মাধ্যমে, কিন্তু এক স্তর থেকে পরবর্তী উন্নততর স্তরে পৌঁছায় সমাজ বিপ্লবের সাহায্যে। (৩) অতীতের সমাজের যেসব ব্যবস্থা, অভ্যাস, ইত্যাদি নতুন সমাজের প্রয়োজনে আসে সেগুলো নতুন সমাজে রূপান্তরিতভাবে স্থান করে নেয়।

সমাজ পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা মার্কস উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণে বর্ণনা করেছেন, তা এযাবৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত যেসব সামাজিক আবর্তন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য ছিল না। ১৯১৭ সালে রুশ সাম্রাজ্য ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল; ফলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিধির মধ্যে সম্ভাব্য সব উৎপাদন শক্তির বিকাশ পূর্ণ হওয়ার পরিণতি থেকে ছিল বহু দূর। শ্রমিক-শ্রেণি কৃষক-মাজের তুলনায় ছিল ক্ষুদ্র। গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। লক্ষ্যণীয়, ধনতন্ত্রে 'সম্ভাব্য সব উৎপাদন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশে'র সঙ্গে প্রয়োজন সমাজের উপর-কাঠামোর (superstructure) সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন, যা পরবর্তী স্তরের জন্য খুবই প্রয়োজন। সমাজ-বিপ্লবের সার্থকতায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণে উপরি-কাঠামোর ভূমিকা নগণ্য নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে উপরি-কাঠামো সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে সমাজতন্ত্রের সাফল্য সহজতর হবে। বিশেষ করে প্রয়োজন একটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির, যেখানে জনগণ সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে অর্পিত, এবং সে দায়িত্ব পালনে উৎসুক।

১৯১৭ সালে জার-শাসিত রাশিয়া ছিল ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলোর একটি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সবেমাত্র প্রচলিত হয়েছে। ফলে উপরে উদ্ধৃত মার্কসের 'বিপ্লবের পূর্বশর্তে'র সঙ্গে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির কোন মিল ছিল না। এই বিপ্লব ঘটে একটা অনুন্নত দেশে। বলশেভিকরা শাসক শ্রেণির অত্যাচারে জর্জরিত দরিদ্র, অশিক্ষিত, ধর্ম ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণের সমর্থন অর্জনে সমর্থ হয়। এই সাফল্যের পেছনে ছিল সমাজ, জনগণ, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে একক উপলব্ধি; প্রেরণা যোগায় যে বিশ্ব-দর্শন তার প্রণেতা ছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস এবং সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধশালী হয়েছিল বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা লেনিনের অবদানে।

রাশিয়ার পশ্চাদপদতার কারণে সেদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়াস নানা সমস্যা সৃষ্টি করে; বিপ্লব-উত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে ও তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় বহু ভুলভ্রান্তি ঘটে। মার্কস লিখেছিলেন, ধর্মের আবির্ভাব সমাজ বিবর্তনের একটা বিশিষ্ট পর্যায়ের সামাজিক সংকটের প্রতিফলন; এবং যে আর্থ-সামাজিক কারণে ধর্মের আবির্ভাব, তার সমাধান না হলে ধর্মের অবসান ঘটবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের পরপরই ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র নীতির প্রবর্তন কি বিপ্লবের জন্য সমর্থন সৃষ্টিতে সাহায্য করার কথা ছিল? আমার মনে হয় বলশেভিকেরা বিপ্লবের পর উন্নয়ন নীতি কি হবে এবং তা কি ভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে নিয়ে আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা করেননি।

ড. ইসলাম তাঁর ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'পুঁজিবাদের পরে কী?' বইয়ে লিখেছিলেন যে, এ বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, 'আমি নেপোলিয়নের উদাহরণ অনুসরণ করি: আগে বিপ্লবের জয় হোক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়'! ফলে, বিপ্লবের পর বিশৃঙ্খল দ্রুত-পরিবর্তনরত পরিস্থিতি সামলানোর জন্য অনেক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে হয়, যার মধ্যে সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা ছিল অন্যতম।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার মানে এগুলোর আমলাদের আয়ত্তাধীন হওয়া, এবং আমলাতন্ত্রের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া। এই ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র প্রবর্তনে চেষ্টারত অন্যান্য দেশে বাস্তবায়িত হয়। আমলারা সাধারণত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের উপর জনগণের, এমনকি ট্রেড ইউনিয়নেরও সরাসরি প্রভাব বিস্তারের কার্যকর উপায় ছিল না। তাদের আচরণ ও কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জনগণের ছিল না।

মার্কসবাদ শ্রেণিহীন সমাজ সৃষ্টির জন্য উৎপাদন রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা বলে না; বরং সামাজিক মালিকানার social ownership of the means of production-এর কথা বলে। কিন্তু সামাজিক মালিকানায় উৎপাদন পরিচালনা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা, এমনকি তাত্ত্বিক ধারণা খুবই বিরল। তবে এটা অনুমান করা সম্ভব যে, সামাজিক মালিকানায় উৎপাদন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান (institution), পদ্ধতি (system/mechanism), নীতি (policy), ইত্যাদির প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন এসব প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি, এবং নীতি সৃষ্টিতে ও প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সমষ্টিগতভাবে সামাজিক মালিকানাধীন উৎপাদন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন যৌথ-সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও সামথ্য (capacity)। এই সামর্থ্য উন্নততর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমাজে অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা মার্কস ভেবেছিলেন।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য অপ্রস্তুতিরই লক্ষণ ছিল। অর্থাৎ, মার্কসীয় পরিভাষায় 'ভিত্তি' ও 'উপরকাঠামো', দুই ক্ষেত্রেই রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। লেনিন

নিজেও এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯২১ সনে তিনি লিখেছিলেন, 'The immediate and most urgent task of the revolution in Russia was a bourgeois-democratic task, namely, to destroy the survivals of medievalism and sweep them away to the end, to purify Russia of this barbarism...'। দুর্ভাগ্যবশত এর কিছু সময় পরেই তিনি মৃত্যবরণ করেন।

তারপর অনেক অবাঞ্ছিত পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রায় ৭০ বছর পর তার পরিণতি আমরা এখন জানি। A Contribution to the Critique of Political Economym গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' মার্কস লিখেছিলেন, '...সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে সমাজের বস্তুগত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে, যে মালিকানা-সম্পর্ক তার ভিত্তি, তার সংঘাতের সৃষ্টি হয়।... উৎপাদন শক্তির উন্নয়নের রূপের পরিবর্তে (উৎপাদন) সম্পর্ক তার শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখন শুরু হয় সমাজ বিপ্লবের যুগ'।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি (forces of production)-র সাথে যে সামাজিক সম্পর্কের (relations of production) (অর্থাৎ যে মালিকানার) অধীনে তা চালিত ছিল, তার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। এই উপসংহার মার্কসের উপর্যুক্ত তত্ত্ব-ভিত্তিক, যদিও এই বিপরীতমুখী পরিবর্তনকে বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লব বলাই ঠিক। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে প্রশ্ন, সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের উপায়সমূহের (means of production) মালিক কে ছিল? যদিও আইনগতভাবে মালিক ছিল সারা দেশের মানুষ, বাস্তবে উৎপাদন সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তের ক্ষমতা যদি যথাযথ শিক্ষা লাভ করি, এবং এর পেছনে যে ভুল-ভ্রান্তি কাজ করেছে তার পুনরাবৃত্তি না করি, তাহলে সমাজতন্ত্রের পরবর্তী বিপ্লবে সার্থক হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

উৎপাদন রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আর একটি অবাঞ্ছিত পরিণাম হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। অথচ, সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার হলো রাষ্ট্রের ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তি (withering away of the state)। বাস্তবে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রেও এসব দেশের বিপ্লব-পূর্ব স্তরে অবিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিপ্লবের আগে গণতন্ত্রের বিকাশ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিপ্লবের পরেও এসব দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ পায়নি। ধনতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। এর মূল কারণ হলো, যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা এক জটিল সমস্যা; ফলে এসব দেশে উৎপাদন ঠিক সমাজের আয়ত্তাধীন ছিল না।

উপর্যুক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে, চীন এবং ভিয়েতনাম সম্প্রতি অর্থনীতি পরিচালন ব্যবস্থায় সংশোধনীর সূচনা করেছে। দীর্ঘকাল এসব দেশও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদন ব্যবস্থার মডেল অনুসরণ করেছে, এবং তার সমস্তাসমূহ

দ্বাতা আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে এসব দেশে বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি মালিকানাকে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। চীনের এই সংস্কার সূচনার নেতা ছিলেন দেং শিয়াওপিং। তিনি 'আগামী একশত বছরের জন্য মতাদর্শ-গত বিতর্ক স্থগিত' করার সুপারিশ করেন (পৃ: ২২৯)। ভিয়েতনামে ১৯৮৭ সালে '...শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারের বাজেট-নির্ভরতা পরিত্যাগ করে স্বার্থে উৎপাদন কার্যে অধিকতর কার্যকারিতা অর্জনে সক্ষম, ধনতন্ত্রের এই মন্ত্র এখন এসব দেশে পরীক্ষিত হচ্ছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ফলাফলের পাশাপাশি এর বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পরিণামও দেখা দিতে শুরু করেছে; এবং বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকলে চীনের জনগণ দেং-এর সুপারিশ অনুযায়ী একশত বছর পরবর্তী 'লং মার্চ'-এর জন্য অপেক্ষা করবে কি না তা দেখার বিষয়।

এই বইয়ের শেষ অংশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির কারণে শিল্প বিপ্লব এবং বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা, সম্ভাবনা, এবং বিশেষ করে ভবিষ্যতের সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করতে পারে তার আলোচনা রয়েছে। এ আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ উৎপাদন শক্তির আরও বিকাশ হলে শ্রমিক, কৃষক ও অন্য সব খেটে খাওয়া জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সহজতর হবে। তার মানে এই নয় যে, উৎপাদন শক্তির এই নতুন স্তরের বিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সাম্যবাদের অভ্যুদয় ঘটাবে। এক্ষেত্রেও বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটবে এবং বহু সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। এসব সমস্যাকে তত্ত্ব বাস্তবায়নের সমস্যা বলা যায়।

আমার মতে ড. ইসলাম তাঁর বইয়ে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহের সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এ নিয়ে আরও অনেক ভাবনা ও আলোচনার প্রয়োজন হবে। যারা সমাজতন্ত্রে মানুষের মুক্তির ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখেন তাদের জন্য এই বই পড়া অপরিহার্য।

(মহসিন সিদ্দীক পেশায় পরিবেশ প্রকৌশলী, ওয়াশিংটন ডি সি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাময়িকী 'নাগরিক' এর সম্পাদক।)

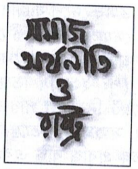

অসাম্যের মাঝে সাম্যবাদের আশাবাদ

শামীমা আক্তার সুমা

সাম্যবাদ হলো একটি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ যা মানবসভ্যতার উচ্চতর স্তর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মার্কসের মতে, সাম্যবাদ হলো সমাজেতন্ত্রের একটি উন্নত এবং অগ্রসরমান রূপ। সাম্যবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য উৎপাদন যন্ত্রের একটি সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। একটি শ্রেণিহীন সাম্যবাদী স্বাধীন সমাজ কায়েম করা। তবে বলশেভিকগণ এক সময় কমিউনিজমের বদলে স্তালিনিজমের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। তারা শাসক শ্রেণির পক্ষে কাজ করতে গিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অধিক মনোযোগ দেননি। ফলে সাম্যবাদ সমালোচনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। "অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ" গ্রন্থটি ড. নজরুল ইসলাম সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থিত করেছেন। সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের উদ্রেক করে, অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা এবং এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কী করণীয় এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে লেখক ভবিষৎমুখী একটি সমাজের ধারণা প্রণয়ন করেছেন। যে সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে যেমন মূল্যহীন, ফেলনা করেননি তেমনি তরুণদের প্রাণশক্তিকে শুধু অগ্রাধিকার না দিয়ে এ দুয়ের সম্মিলন ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মানব ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী মহামানবদের একজন অমর দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্য সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন যা– মানব রচিত অন্য যেকোনো মতবাদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও সঠিক। যদিও সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ নিয়ে সমালোচনার কমতি নেই। তবুও কিছু দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে। কিন্তু সেসব দেশের রাষ্ট্রনায়করা যেসব ভুল করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে অনেকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। বস্তুত ওটা সমাজতন্ত্রের আদর্শগত কোন ভুল না, ভুল ছিলো প্রয়োগকারীদের প্রয়োগ পদ্ধতিতে। ঐসব দেশের সরকারগুলো সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্যকে ত্যাগ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিল।

পুঁজিবাদী দানবদের পৌনঃপুনিক ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টায় রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভিত্তি এমনিতেই দুর্বল ছিলো। তার সাথে লেলিনবাদীদের

ভুলগুলো যোগ হওয়ায় বলশেভিক বিপ্লবীদের ৭৪ বছরের পুরনো সমাজতান্ত্রিক দুর্গ রাশিয়া ১৯৯১-এ ভেঙে পড়ে, বিদায় ঘটে লেলিনবাদী সমাজতন্ত্রের। তবে সাম্যবাদের মহান আদর্শ তাতে ম্লান হয়নি। সব বৈষম্য অবসানের সাম্যবাদী মূল লক্ষ্য আজো সমানভাবে প্রাথমিক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা আরো বেশি জরুরি। অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলামের লেখায় আমরা তার আহ্বান লক্ষ্য করি। শুধু সাম্যবাদের গুণগানেই তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখেননি, বাস্তবভিত্তিক উদহারণ দিয়ে তিনি মানব সমাজের উন্নততর অবস্থার জন্য সমাজতন্ত্রের যে প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করেছেন তা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তিনি বলেন,

> "পুঁজিবাদ দুটি মহাযুদ্ধ ঘটিয়ে প্রমাণ করেছে, প্রলয়ঙ্করী এবং মানব প্রজাতি বিলীনকারী আরেকটি মহাযুদ্ধ তা প্রতিরোধ করতে পারবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। মুনাফার তাড়নায় যুদ্ধ বাধানোর অন্তর্নিহিত প্রবণতা পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদের একটি বড় ইতিবাচক দিক হলো, এই সমাজে সমরাস্ত্র উৎপাদন মুনাফার তাড়না দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা নয়। ফলে এরূপ সমাজ দ্বারা যুদ্ধ বাধানোর বিপদ কম হওয়ার কথা। তবে তার মানে এই নয় যে, সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশ এবং সরকারসমূহের নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতে পারে না"১

লেখক তাঁর লেখাকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় সমাজ বিবর্তনে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নিয়ামক ভূমিকার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সে কারণে চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতি নজর দেন লেখক এবং তুলে ধরেন,

> "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জীব-প্রযুক্তি যাতে মানব প্রজাতির মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করা। শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক সম্ভাবনাসমূহ প্রতিহত করে সাম্যবাদী সমাজের দিকে অভিযাত্রার জন্য এই বিপ্লব যেসব ইতিবাচক সম্ভাবনার অর্জনে সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে এবং মানবজাতিকে আরও সংগ্রন্থি করা। নতুন প্রযুক্তির সুফল যাতে সকল দেশের সকল মানুষ পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভাজন এবং সকল দেশের অভ্যন্তরের সামাজিক বিভাজন দূর করা। পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা। নতুন দ্রোণভিক্তিক পারমাণবিক যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্তি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা।"২

শিল্প বিপ্লব ও মানববিচ্ছিন্নতার সমাধানের উপায় হিসেবে সাম্যবাদের ভূমিকা অতুলনীয়। এ বিষয়টি যেমন অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলামের এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখাতেও। কবি নজরুলের সাম্যবাদ সর্বব্যাপী, সর্বপ্লাবী সব বিন্দুকে হৃদয়ে ধারণ করে, জীবনের সবটুকু আকুতি দিয়ে মানবমুক্তির সনদ রচনার মহামানব তিনি। গোটা পৃথিবীকে সৌন্দর্যময় মহকাব্যে রূপান্তরের মহাকবি তিনি। সে অর্থে তিনি মানবকুলের অন্তরঙ্গ

বন্ধুদের অন্যতম। এ দিক দিয়ে অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলামকেও 'মানবতার বন্ধু' বলতে পারি। কারণ তাঁর সাম্যবাদের মাধ্যমে আমরা যেমন অক্টোবর বিপ্লবের আলোচনা পাই, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ আলোচনাকালে মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের রূপায়ন দেখি তাঁর সমতা, গণতন্ত্র, মানবতাবোধ, শান্তি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায়। কবি নজরুলের সাম্যবাদ মানুষকে নিয়েই পৃথিবী, মানুষের সুখ-শান্তির মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য। মানুষ বলতে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই বুঝতে হবে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই যদি সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, প্রতিটি মানুষই যদি মানবিক লীলাভূমিতে পরিণত হয় তবে পৃথিবী হবে শান্তির লীলাভূমি। আর এমন পৃথিবীই মানব জাতির সকলেই কামনা করে, কেবল অত্যাচারীরা ব্যতীত। অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলাম ও পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা উত্তীর্ণ করে এক সাম্যবাদী, সহযোগিতামূলক, মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার আশাবাদ তুলে ধরেছেন। যা আমাদের মুগ্ধ করে।

লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধীদের এই মর্মে অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বলশেভিকেরা একটি নীচু সংস্কৃতির দেশের উপর সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার অবিবেচক প্রয়াসে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এ কারণে যে, তাদের তত্ত্ব অনুসারে অনগ্রসর বলশেভিকেরা বিপরীত বিন্দু থেকে শুরু করেছে। বলশেভিকেরা রাশিয়াতে সংস্কৃতিক বিপ্লবের আগেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লব সাধন করেছে। কিন্তু সেকারণেই বলশেভিকদের সামনে এখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্তব্য সমুপস্থিত। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবই সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করবে। তবে লেনিন লক্ষ করেন যে, কিন্তু এই (সাংস্কৃতিক) বিপ্লব যথেষ্ট আয়াসসাধ্যও বটে। কেননা এর পথে একদিকে রয়েছে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক বাধা (কারণ আমরা নিরক্ষর) এবং অন্যদিকে রয়েছে বস্তুগত বাধা (কারণ সাংস্কৃতিক হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বস্তুগত ভিত্তি, বস্তুগত উৎপাদন উপায়ের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বিকাশ প্রয়োজন)।৩

লেনিন লক্ষ্য করেন, বলশেভিকদের কাজের গতিমুখের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে। আগের মূল মনোযোগ ছিলো রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লব, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উপর। এখন মনোযোগ দিতে হবে "শান্তিপূর্ণ, সাংগঠনিক এবং সাংস্কৃতিক" কাজের প্রতি।

তিনি এটাকে "শিক্ষাগত কাজ" বলেও উল্লেখ করেন। কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাগত কাজ করতে হবে। এই শিক্ষাগত কাজের উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে সমবায়ে সংগঠিত করা।

সুতরাং "শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী", "হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ", "আমলাতন্ত্র প্রতিহত করন" এবং "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" এগুলোই ছিলো রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেনিনের মূল নির্দেশনা। অত্যন্ত কঠিন শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যে লিখিত স্বল্প সংখ্যক প্রবন্ধে লেনিন তাঁর এসব মৌলিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করে যান। অনেক বিষয় তাতে বিস্তৃত ছিলো না; কিন্তু এসব চিন্তার তাৎপর্য ছিলো সুদূরপ্রসারী। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, লেনিনের দুশ্চিন্তা শুধু সোভিয়েত অর্থনীতি, সমাজ প্রশাসন

নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো না। খোদ বলশেভিক পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়েও লেনিন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তিনি পার্টির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক প্রসার দেখেন। তিনি পার্টির পলিটব্যুরোর সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি (তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক) উপস্থাপিত দলিলসমূহের সত্যতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে, লেনিন পার্টির মধ্যে সংকটের সম্ভাবনা দেখেন, এবং সে কারণে তিনি পার্টি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রেখে যান।

সাম্যবাদ, সাম্যবাদী চিন্তা ও চিন্তকদের যেসব সমালোচনা করা হয়, তারই কিছু অংশ এখন তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রথমত, বলা যায় সাম্যবাদী একটি নীতি হলো, "বড় মাছকে ভালভাবে ধর, ছোট মাছকে ছেড়ে দাও" অর্থাৎ যেসব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখ এবং ভালভাবে পরিচালনা কর; অন্যদিকে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও। এ নীতিটি বৈষম্য উদ্ভাবক হতে পাড়ে। বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতি এক দৃষ্টিভঙ্গি আর ছোট প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রাহ্য হয় না।৪

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মালিকানা অপসারিত কিংবা সংকুচিত করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার একটি ফলশ্রুতি হওয়ার কথা সমতা। কাজেই সমতাও সমাজতন্ত্রের একটি লক্ষ্য। বস্তুত, 'সাম্যবাদ' কথাটাই প্রমাণ করে, সমতা অর্জন এই দর্শনে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের স্লোগান ছিলো, "মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব"। ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্রের কারণে 'সাম্য' রাজনৈতিক গতিতে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থনৈতিক অসাম্য বহাল থাকে, এবং এই অর্থনৈতিক অসাম্য রাজনৈতিক সাম্যকেও বহুলাংশে খর্ব করে। প্রসঙ্গটি লেখকের সতর্কতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র সাম্যবাদ ও সমতা আলোচনায়।৫

তৃতীয়ত, সাম্যবাদ বিরোধীদের মনেরভাব চরমপন্থার দিকে ধাবিত। তাদের মতে, সাম্যবাদীদের মানবিকতা খুব বেশি, আসলে এটা একটা মানবিক দোষ। মানুষ সর্বদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে ভালোবাসে তাই সাম্যবাদীদের চিন্তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

চতুর্থত, একজন সচিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা তৈরির জন্য যতটুকু মানসিক শ্রম ব্যয়িত হয়েছে আর একজন রিকশাচালক যিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন ব্যতিরেকে সমাজ বসবাসরত। এ দুই ভিন্ন স্তরের মানুষের সমান সুযোগ সাম্যবাদে প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু এ ধারণাটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে।

পঞ্চমত, স্তালিনীয় সাম্যবাদে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা না পেয়ে অবিসংবাদী একনায়কত্ব গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে। স্তালিনের অধীনে শুধু একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তা "ব্যক্তি পূজায়" পর্যবসিত হয়। এ ধারণাটি সাম্যবাদী বৈশিষ্ট্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উপর্যুক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও সাম্যবাদ আবেদন যুগান্তব্যাপী। আর অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলাম সেই বিষয়টিই সুস্পষ্ট করেছেন। সাম্যবাদের ইতিবাচক দিকও

রয়েছে যথা–

* সাম্যবাদ হলো স্বাধীন, সামাজিকভাবে সচেতন শ্রমজীবী মানুষের উঁচুমাত্রায় সুসংগঠিত সমাজ, তাতে কায়েম হবে সকলের স্বশাসন।
* সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রম হয়ে উঠবে প্রত্যেকের মুখ্য অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন উপলব্ধি করবে প্রত্যেকেই। প্রত্যেকের সামর্থ নিয়োজিত হবে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য।
* সাম্যবাদ ব্যক্তিকে ব্যাপক সামাজিক স্বাধীনতা দেয়। এতে রয়েছে কমিউন সংস্থাগুলোতে নির্বাচিত হওয়ার, নির্বাচন করার এবং সমাজের প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার; শিক্ষা, বিশ্রাম, বিনোদন ও ছুটির অধিকার, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজের সমান সুযোগ সুবিধা।
* সাম্যবাদ ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিক সকল ফলভোগের সুযোগসহ বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সক্রিয় অবদান যোজনে সাহায্য করে। মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও যুক্তিসংগত।

কাল মার্কস সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থাপন করেন, সাম্যবাদ হলো সমাজতন্ত্রের একটি উন্নত এবং অগ্রসর রূপ। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মূল্য লক্ষ্য হলো ব্যক্তিমালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণির উপর শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবসান ঘটানো। সাম্যবাদে পৌঁছাতে হলে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করতে হবে এবং সেই ক্রান্তিকালে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সমাজে সামগ্রী ও সেবার অতিপ্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। কোনো দেশে সাম্যবাদ থাকলে সেখানে ধনী গরীবের ব্যবধান থাকবে না। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার নেবে। সাম্যবাদ হলো স্বাধীন, সামাজিকভাবে সচেতন শ্রমজীবী মানুষের উঁচুমাত্রায় সুসংগঠিত সমাজ, তাতে কায়েম হবে সকলের সুশাসন। সেই সমাজে কল্যাণের জন্য শ্রম হয়ে উঠবে প্রত্যেকের মুখ্য অপরিহার্য প্রয়োজন এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করবে প্রত্যেকেই। প্রত্যেকের সামর্থ নিয়োজিত হবে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য।

সর্বোপরি, সাম্যবাদ মানেই সমতা সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ। যা নবীন ও প্রবীণ উভয় শ্রেণিকেই সম্পৃক্ত করে। অর্থনীতিবিদ নজরুল ইসলামের গ্রন্থটি যেন প্রবীণদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, তরুণদের প্রাণশক্তির সমন্বয় সাধন করে ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা সম্প্রসারিত হয়েছে। শত সমালোচনা সত্ত্বেও সাম্যবাদী আন্দোলন থেমে থাকেনি। সাম্যবাদ নিজস্ব ধারায় বহমান একটি ব্যক্তিক্রমধর্মী পথ। যুগে যুগে যখনই শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তখনই অনুভূত হয়েছে মহান এই আদর্শের। ড. নজরুল ইসলামে দশ দফার প্রস্তাবের নবম প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য, "অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি একটি স্ট্যাটেজিক গুরুত্বসম্পন্ন ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় খাত বজায় রাখা এবং জনকল্যাণের লক্ষ্যে এই খাতের কার্যাবলী পরিচালনা করা"।

লেখকের এ আহ্বানটি তাঁর মানবিকতা, শান্তি সামাষ্টিক/সামাজিক মালিকানার আলোচনায় দেখতে পাই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আলোচনাকালে যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে পরিবেশ বিরুপতা আলোচনা লেখকের আধুনিক সচেতন নাগরিক মনের পরিচায়ক। পরিশেষে, যে বিষয় মনে দাগ কেটে গেছে ড. ইসলামের গ্রন্থে মার্কসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করব, "সাম্যবাদ হলো আশু ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় রূপ এবং গতিশীল নীতি। কিন্তু সাম্যবাদই মানব বিকাশের লক্ষ্য নয়। মানব সমাজের রূপ।"৬

১. 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ', নজরুল ইসলাম, ইস্টার্ন একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩৪৭, ২০১৯
২. ঐ পৃষ্ঠা ৩৫৫
৩. ঐ পৃষ্ঠা ৮৬
৪. ঐ পৃষ্ঠা ৩২৩
৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩২৫
৬. ঐ পৃষ্ঠা ৫৭

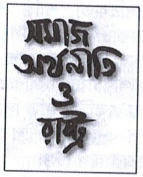

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রেক্ষাপটে আইনী ভাবনা

ড. কাজী জাহেদ ইকবাল

১

এই প্রবন্ধটি লেখার প্রণোদনা তৈরি হয়েছে অর্থনীতিবিদ ড. নজরুল ইসলামের 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের অভিষ্যৎ' গ্রন্থটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া থেকে। অবসম্ভাবীভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও তার প্রতিক্রিয়ায় যদি একটি সাম্যবাদী সামাজিক কাঠামোর পরিস্থিতি উদ্ভব হয়, তবে সেখানে একটি উপযোগী আইনী কাঠামো প্রয়োজন হবে বা আইনী কাঠামো সৃষ্টি হবে। ড. নজরুল ইসলামের গ্রন্থটিতে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষিত হলেও তা অবধারিতভাবে অন্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। এ প্রবন্ধে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কিভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং তার অভিঘাতে সৃষ্টি সম্ভাব্য সাম্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন ধরনের আইনী কাঠামো তৈরির প্রয়োজন পড়তে পারে বা আইনী কাঠামো ইতিবস্তু তৈরি হতে শুরু করেছে।

২

এই প্রবন্ধটি একটি কোয়ালিটেটিভ গবেষণা বলা যেতে পারে এবং এখানে এম্পিরিক্যাল গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রণোদনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ড. নজরুল ইসলামের উল্লিখিত গ্রন্থ১। সুতরাং সেটি নিয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি বর্তমান প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি স্পষ্ট করার জন্যে। গ্রন্থটিতে মোট ২৩টি অধ্যায়ে লেখক ইতিহাস ও অর্থনীতির দিক থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য অভিঘাতে কিভাবে সাম্যবাদ উপস্থিত হতে পারে তা উপস্থাপন করেছেন। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ রাষ্ট্রশাসনে আসীন হবার প্রেক্ষাপটে বইটিতে বিদ্যমান। শিল্প বিপ্লবের ধারাবিহক বর্ণনা স্পষ্টতই লেখকের ইতিহাস সংলগ্নতার পরিচয় দেয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার নানা টানাপোড়েন এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব হয়েছে কোন প্রকার রাখঢাকা ছাড়াই। বলা যেতে পারে অনেকটাই নির্মোহ বিশ্লেষণ। তবে গ্রন্থটিতে গ্রামসির বিশ্লেষণ না থাকা একটু অস্বস্তি রেখে গিয়েছে।

৩

ইতিহাসের কাল বিভাজন সহজ কাজ নয়। কিন্তু প্রযুক্তির আলোকে অনেক সময় কালের বিভাজনকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও বিভক্তির বিষয়টি মোটেও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ এমন একটা কাল বিভাজন ইতিহাসের দিক থেকে আছে, আবার উৎপাদনের দিক বিচারে শিল্প বিপ্লব-পূর্ব সময় এবং শিল্প বিপ্লবোত্তর সময় এমন একটা বিভাজন করা হয়। শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হবার পর প্রযুক্তির উৎকর্ষের উপর ভিত্তি করে আরো একটি কাল বিভাজন করা হয়। বিতর্ক আছে এই বিভাজন নিয়েও তবুও সাধারণভাবে এটি গ্রহণযোগ্য– এ মত অনুসারে শিল্প বিপ্লব চার পর্বে বিভক্ত;

(১) স্টিম বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন আগমণের পর উৎপাদনের ধরণের যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং শ্রমশক্তি ব্যবহারের যে পরিবর্তন আসে তাকে আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করি।

(২) বিদ্যুৎ প্রযুক্তি ব্যবহারের উৎকর্ষতাকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং উৎপাদনের গতি ও সম্পর্ককে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এইটিকে আমরা দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব মনে করি।

(৩) গত শতকের মধ্যভাগে যখন কম্পিউটার এবং এমনি ধরনের সূক্ষ্ম জ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তির আগমণ হলো এবং তার অভিঘাতে উৎপাদন সম্পর্ক আরো নতুনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল তখন এইটি আমরা শিল্প বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করি।

(৪) উৎপাদনের রোবটের ব্যবহার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বা থ্রিডি প্রযুক্তির আগমণের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে অভিঘাতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তা হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব।

আমরা এই চতুর্থ পর্যায়ে আছি এবং এর অভিঘাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কিরকম আইনী কাঠামো দরকার হবে বা হচ্ছে সেইটি আলোচনা করবো। এর সঙ্গে দেখতে হবে যদি এই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে সাম্যবাদের পরিস্থিতি তৈরি হয় তবে আইনী পরিকাঠামো তখন কেমন হতে হবে। সুতরাং বিষয় দুটি হচ্ছে, প্রথমত, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষপটে আইন এবং দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদের প্রেক্ষাপটে আইন। আদতে বিষয় দুটি এক স্থানে এসে মিলে যায় যদি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সাম্যবাদ উপস্থিত হয়। এখানে সংক্ষেপে সাম্যবাদ একটু দেখা যাক। সাম্যবাদ হলো সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম স্তর হলো সমাজতন্ত্র নিজে। এ পর্যায়ে ব্যক্তি মালিকানা এবং শোষণের বিলোপ ঘটানো হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রমজীবীদের শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে। এখানে, শ্রেণি বিলোপ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে সাম্যবাদ হলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নততর স্তর। এ পর্যায়ে শ্রেণি বিলুপ্ত হয় এবং শ্রম অনুসারে বন্টনের বদলে চাহিদা অনুসারে বন্টনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সাম্যবাদ হলো, শ্রেণিহীন কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা। আমরা দেখছি যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পর প্রযুক্তির যে উৎকর্ষতা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তাতে করে শ্রম শক্তির ব্যবহারের বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটবে। খুবই সঙ্গত কারণে তা রাষ্ট্রকাঠামো ও আইনী ব্যবস্থায়ও প্রভাব রাখবে।

৪

আইন কেন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় জরুরি? কারণ, আইন এসকল কিছু পরিচালনার কাঠামো তৈরি করে পরিচালনা সহজ এবং সুষ্ঠু রাখে। আবার সব কিছুর নিয়ন্ত্রক যে রাষ্ট্র সে নিজেও প্রভাব রক্ষা বা শাসনযন্ত্র চালানোর জন্য আইনকেই ব্যবহার করে। কোন সন্দেহ নাই যে, আইন নিজে বৃহত্তর রাজনীতির উপরিকাঠামো। এখন দেখা যাক আইনের সাধারণ ধারণা কেমন। আইন নিয়ে নানা তাত্ত্বিক বিতর্ক প্রচলিত আছে। আবার, বিভিন্ন তত্ত্বও বিদ্যমান। যেমন Natural legal theory, Positive legal theory, Socialist legal theory ইত্যাদি। অস্টিন মনে করেন, "আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ বটে , কিন্তু পাশাপাশি সামাজিক ও গণঐক্যের বিষয়ও বিদ্যমান ।" সমাজতান্ত্রিক ধারণা হলো আইন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শক্তিমানকে সাহয্য করে। ফলে দেখা যাচ্ছে, আইন নিয়ে তাত্ত্বিকদের ভেতর বিস্তর বিতর্ক বিদ্যমান। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা, "আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ; তা যদি আমরা মানি তবে সেটিও শক্তিমান শ্রেণির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যকারি বলে মনে হয়। ইতোমধ্যে বলা হয়েছে যে, আইন বৃহৎ অর্থে রাজনীতির অংশ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োণযোগ্য। বিদ্যমান রাজনীতি বা রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুসারে আইন তৈরি করে। সমাজতান্ত্রিকদের মতে, সাধারণত আইন পুঁজিবাদের জটিল পদ্ধতিগত প্রকাশ। কিন্তু প্রযুক্তির উৎকর্ষতার হাত ধরে যখন সাম্যবাদের আগমণ হবে, তখনও বোধগম্যভাবেই উপযোগী আইনী কাঠামো প্রয়োজন হবে সবকিছুর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে।

৫

এখন, আইন কীভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে– সেটি দেখা যাক। প্রাচীন আমল এবং মধ্য যুগে প্রযুক্তি ছিল না কিংবা খুবই সরল প্রযুক্তি ছিল– তখন আইনও ছিল সাদামাটা। প্রাচীনকালে সরল প্রকৃতির ঐশ্বরিক আইন ছিল যার কোন সমতাভিত্তিক প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। বরং গোষ্ঠীপতি, রাজা বা ক্ষমতাধরদের ইচ্ছাধীন ছিল আইন। মধ্য যুগ সামান্য কিছু উন্নতি হলেও মোটা দাগে আইনগুলো মোটামুটি একই ধারায় চলছিল। তখন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠে যা ছিল মূলত ভূমি নির্ভর। সুতরাং তখনকার আইনও তার সাপেক্ষেই তৈরি হয়েছিল। প্রথম শিল্প বিপ্লবের পূর্বে কারখানা, শ্রমিক কিংবা আগুন লেগে যাবার মতো দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কোন আইনের প্রয়োজন ছিল না। লক্ষণীয় যে, শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান আইনসমূহের বদল ঘটতে শুরু করল। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্ব বিষয়ক আইন পরিবর্তনের কথা বলা যায়। প্রযুক্তির আগমণ ও তার উৎকর্ষতার কারণে আইনগত পরিবর্তন ছিল অনিবার্য। মোটরগাড়ির আগমণ ট্রাফিক আইন থেকে শুরু করে নতুন একধরনের সড়ক সংক্রান্ত আইন কানুনের উদ্ভব ঘটালো।

প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা আইনের কাঠামোকে ধাপে ধাপে জটিল করে তুলেছে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব আগমণের পর কম্পিউটার, ই-মেইল বা ভার্চুয়াল জগতের সৃষ্টি হবার পর সারা বিশ্বেই এসব বিষয়ে আইন তৈরি করতে হয়েছে। প্রযুক্তির জন্য

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের নানাবিধ প্রটোকল ও নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রগুলোকে প্রণয়ন করে সেখানে স্বাক্ষারও করতে হয়েছে।৫ এক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন ও ক্ষেত্রমত তাকে পরিবর্তনও করতে হয়েছে।৬ এসবই হয়েছে প্রযুক্তির উৎকর্ষকার অভিঘাতে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজনে।

৬

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে আমরা প্রযুক্তির যেসকল নতুন উৎকার্ষতাকে চিহ্নিত করেছি তা নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। একইসঙ্গে এর অভিঘাতে সাম্যবাদের আগমণের প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। তবে এটা ঠিক যে বিষয়টিকে একটি রূপকল্প হিসাবে নিয়ে এর আইনগত দিক আলোচনা হতেই পারে। আমরা আগেই দেখেছি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন অবসম্ভাবিভাবে আইনগত কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে দেশিক এবং বৈদেশিক উভয় ভাবেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলতে আমরা দেখি সাম্প্রতিক কালের কৃত্রিম বুদ্ধি, রোবট, থ্রি ডি প্রযুক্তির ছাপাখানা ক্লোনিং প্রযুক্তি ইত্যাদি। এরফলে শ্রম এবং উৎপাদনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সে পরিবর্তনে মানবিক শ্রম কমে যান্ত্রিক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের অবসরের সুযোগ বাড়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভোগের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রে একটা সাম্যের অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে তবে প্রতিবন্ধকতাও আছে।৭ প্রবিবন্ধকতার রূপটি বড়ই বলা যায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক মালিকানা কিংবা বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সম্পর্ক নির্ধারণ একটি বড় প্রশ্ন হিসাবে থাকছে। আইনী কাঠামোর বিষয়টি এখানেই। যদি ধরে নেয়া যায় যে, প্রযুক্তির কারণে সাম্যবাদ আসন্ন তবে আইনী কাঠামো পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। বর্তমানেও আমরা দেখছি আইন পরিবর্তন হচ্ছে নতুন প্রযুক্তিকে সুযোগ দেবার স্বার্থে। চিকিৎসাক্ষেত্রে অঙ্গ সংস্থাপন নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে নতুন আইন, বিচারিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। অন্য বিষয়গুলোতেও আইন হচ্ছে।৮

এখন প্রশ্ন হলো যদি সাম্যবাদ উপস্থিত হয় বা সেরকম ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে হয়, তবে আইনের ভূমিকা কি হবে? আমরা আগেই দেখেছি বৃহত্তর অর্থে আইন হলো রাজনীতির অনুসরণ, সে অর্থে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারও অনুসরণ। ফলে যদি সমতার বা সাম্যের রাষ্ট্র কাঠামোর উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইনকে এর অনুকূলে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। উদহারণ হিসাবে বলা যায় রাজস্ব আদায় বা মানুষের জন্য রাষ্ট্রের ভতূর্কির যে সকল বিধান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর এখন মেনে চলে তা আর এভাবে থাকবে না। কেননা তখন শ্রম ও উৎপাদনের সম্পর্ক বদলে যাবার ফলে রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতিও বদলে যেতে বাধ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বা কারখানা বিষয়ক আইনী কাঠামো বদলাতে হবে নতুন প্রযুক্তির সাথে সাথে। এমনটি আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বব্যাপি যে এক ভার্চুয়াল জগতের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণে এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতির ফলে ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত পুরাতন আইন আর নাই। নতুন আইন করতে হয়েছে রাষ্ট্রগুলোকে এবং বিশ্বব্যাপি আন্তর্জাতিক প্রটোকল ও তৈরি করতে হয়েছে। মানুষের স্বাচ্ছন্দ বাড়ছে। কায়িক শ্রমের পরিমাণ কমে আসছে; এখন যদি এইটিকে সম বন্টনের মাধ্যমে

সবার কাছে পৌছানো যায় তবে সমতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, তেমন পরিবেশ তৈরির জন্য রাষ্ট্রসমূহকে একটি উপযোগী আইনী কাঠামো তৈরি করতে হবে।

নতুন পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক আইনও পরিবর্তনের ক্ষেত্র থেকে বাদ যাবে না। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনার মূল আইনই হলো সাংবিধানিক আইন। সুতরাং প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে সাম্যবাদ বা সমতার পরিস্থিতি তৈরির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইনকেও সঙ্গতরূপে আসতে হবে। এমন পরিবর্তন যে আমরা দেখছি না– তাও নয়। পরিবেশের মত ইস্যুগুলো এখন সংবিধানে স্থান পাচ্ছে।৯

৭

বর্তমান প্রবন্ধ প্রকৃতপক্ষে একটি অনুমান নির্ভর উপস্থাপনা। সুতরাং এর উপসংহার দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে একটা শেষ মন্তব্য করা যেতে পারে– তা হলো, প্রযুক্তির পরিবর্তন মানুষের জীবন দিন দিন স্বাচ্ছন্দপূর্ণ করছে এবং একইসঙ্গে মানুষের কায়িক শ্রমজনিত কষ্ঠ কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তা সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। কারণ, বিশ্বব্যাপি বৈষম্য শোষণ এখনো খুবই প্রকটভাবে বিদ্যমান এবং পুঁজিবাদ ও সমস্যা হজম করে স্থিতিস্থাপকতার (Flexible) গুণে এগিয়ে চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষ সমাজতান্ত্রিক ধারণাকেও পুঁজিবাদ তার বিপণনের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারপরও যদি সাম্যবাদের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, বা করতে হয় তবে তা করতে হবে আইনী কাঠামোকে পরিবর্তন করে সাম্যবাদের উপযোগী করার মাধ্যমে। আইনী কাঠামোতে আমরা পরিবর্তন দেখছি কিন্তু তার পরিণতি সাম্যবাদের দিকে কিনা যে কথা এ মূহুর্তেই বলা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. ইসলাম, নজরুল, (২০১৯) 'অক্টোবর বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ', ঢাকা, ইস্টার্ণ, একাডেমিক।

২. Austin, Jhon, (2012), The Province of Jurisprudence Determined, New Delhi, Universal.

৩. Hart, HLA, (2017), The Concept of law, oxford, Oxford University press.

৪. Patterson, Dennis, Eds, A Companion to Philosophy of Law and legal Theory, Black well.

৫. উদহারণ হিসাবে আমরা Minimum Age convention, 1973 (NO.138) এর কথা বলতে পারি।

৬. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর কথা বলা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর কথা বলা হয়।

৭. ইসলাম, নজরুল পৃ.পৃ: ৩১১-৩৫৩।

৮. মানবদেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ আইন-১৯৯১। এ ছাড়া এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রটোকল আছে।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৮ক।

লেখক পরিচিতি

নজরুল ইসলাম

অর্থনীতিবিদ এবং পরিবেশ কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাস্টার্স) এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাস্টার্স এবং পিএইচডি) শিক্ষা লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এমোরী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিয়ুশু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং সংস্কার, অর্থনীতি-পরিবেশ সম্পর্কসহ অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা প্রকামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। চীনের উপর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ Resurgent china: issues for the Future (Palgrave-Macmillan, 2009) গবেষকমহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশের উপর তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের বাংলাদেশ, জাসদের রাজনীতি (২০১৩), আগামী দিনের বাংলাদেশ (২০১২), বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যত (২০১১), বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা (১৯৮৭), বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ (১৯৮৪) এবং জাসদের রাজনীতি: একটি নিকট বিশ্লেষণ (১৯৮১)। বাংলাদেশের পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র সহ-সভাপতি এবং বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-এর বিশ্ব সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এম. এম. আকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর মূল আগ্রহের বিষয়গুলো হচ্ছে: গ্রামীণ আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, দারিদ্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি, এবং একবিংশ শতকের সমাজতন্ত্র। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ ও রচনা বিভিন্ন জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে: ভাষা আন্দোলনের শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ (ইউপিএল, ১৯৯০), বাংলাদেশের অর্থনীতি (উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩), বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত (প্যাপিরাস, ২০০৪) এবং Poverty Reduction Strategies in South Asia: A Comparative Study (CPD, 2007)। সম্প্রতি তিনি 'বিআইডিএস'-এর সিনিয়র ফেলো মনোনীত হয়েছেন এবং 'মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

বিনায়ক সেন

প্রবন্ধিক ও অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর গবেষণা পরিচালক। উন্নয়ন অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ, বিশেষত পারিবারিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অর্ন্তভূক্তিমূলক উন্নয়ন তার অভিনিবেশের বিষয়। গত তিন দশকে এ সংক্রান্ত তার ৫০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একক অথবা সহ-প্রচেষ্টা রচিত গবেষণা পত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রকাশনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা নিয়ে

তার বেশ কিছু গবেষণাপত্র রয়েছে। অর্থনীতির বাইরে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে লেখালিখি করাতেও তার আগ্রহ বরাবর। ইংরেজি ও বাংলায় তার বিভিন্নমুখী লেখা সকরিত হয়েছে binayaksenbd.com ওয়েবসাইটে।

গৌতম রায়
কলকাতার বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক। রাষ্ট্র-সমাজ-ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষের ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়। কলকাতা থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

হায়দার আলী খান
হায়দার আলী খান যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং 'জাতিসংঘ বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সম্মেলন'-এর (UNCTAD) ভূতপূর্ব ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা বিশ এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা একশতের অধিক। তাঁর প্রকাশিত রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে Reducing Poverty: Patterns of Potential Human Progress (2008), Poverty Strategies in Asia: Growth Plus (2006), Global Markets and Financial Crisis (2004)। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে: অক্টাভিও পাজ: কবি ও কবিতা (১৯৯৩), আপলিনের (২০১২), উত্তরের সরু পথ (২০০০)।

অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাথ
বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাহবুবউল্লাহ
ষাটের দশকের বিপ্লবী ছাত্রনেতা। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। বামপন্থী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাটিজ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আর্থ-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।

মহসিন সিদ্দিকী
পরিবেশ প্রকৌশলী, ওয়াশিংটন ডি সি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাময়িকী 'নাগরিক' এর সম্পাদক।

শামীমা আক্তার সুমা
এমফিল শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাহেদ ইকবাল
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বিশ্লেষণ এবং
বিকল্প উন্নয়ন অন্বেষা নিয়ে
'সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র'
প্রকাশিত হচ্ছে

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র

সকল উৎসাহী গবেষককে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে

যোগাযোগ
অধ্যাপক এম এম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, কক্ষ নম্বর ৪০৫৭, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল : ০১৭১১৮৪৭৬৫০, ই-মেইল : akashmokaddem@gmail.com

To Make the World Greener

M/S MAN ENTERPRISE

We Build

We are involved in :

* **Sinking Deep Tube Well**
* **Providing Rig Machine**

We Supply:

* S. S. Strainer
* Stones
* Blind Pipe
* Water Meter
* Housing Pipe
* Gas Cylinder
* Elephant Brand Cement
* Fire Extinguisher
* Gym/ Fitness Equipment
* All Types of Kitchen hood
* Eye Protection Goggles
* Container
* Mechanical Equipment

We Construct:

* Road
* External Water Line
* Building
* Pump-House

House# 657, Road No#26, DOHS Mirpur, Dhaka-1216.
Tel # 02-8080675.
Website: www.man-enterprise.com
E-mail: msmanenterprise@gmail.com

গ্রাহকসেবার নতুন দিগন্তে ঢাকা ওয়াসা

পানি ও পয়ঃ বিল নিয়মিত পরিশোধ করুন

- ঢাকা ওয়াসা এখন রাজধানীর দৈনিক চাহিদার অতিরিক্ত পানি উৎপাদন করছে। পানি সরবরাহে সাময়িক কোন সমস্যা দেখা দিলে ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে জানান।
- পানি অমূল্য সম্পদ। পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। রাজধানীতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। পানির অপচয় রোধ করুন।
- সময়মত পানির বিল পরিশোধ করুন। অনলাইনে এবং মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে এখন পানির বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে।
- পানির দূষণ রোধে বাড়ির জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন এবং সার্ভিস লাইনে ছিদ্র দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করুন।
- বাইপাস বা অবৈধ সংযোগ দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এসব অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকুন।

ওয়াসা

পানি ও পয়ঃ বিল বা পানি সরবরাহ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য জানতে বা অভিযোগ জানাতে 'ওয়াসা লিংক - ১৬১৬২' এ ফোন করুন